অনিঃশেষ অন্বেষ ১

আলতামাশ

অনিঃশেষ আলো

[১]

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনিঃশেষ আলো

[১]

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
দাওরায়ে হাদীস (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭১৭৫৫৪৭২৭
e-mail: boighorbd@gmail.com; web: boighorbd.com

অনিঃশেষ আলো-১

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রকাশক
এস এম আমিনুল ইসলাম
ব ই ঘ র

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬

প্রচ্ছদ
শাকীর এহসানুল্লাহ

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : জে এম প্রিন্টার্স
২২ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২২০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-91933-3-3

ANISSHESH ALO : By Enayetullah Altamash
Published by : S M Aminul Islam, **BhoiGhor :** 43 Islami Tower
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 **First Edition :** February 2016 © by the publisher

Price : 220 Taka only

ইসলামের মশাল হাতে আরব থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন স্বর্ণযুগের মুসলমানরা। কুফরের আঁধার চিরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর বাঁকে-বাঁকে। রোমের কায়সার, ইরানের কেসরা! সেকালের দুই পরাশক্তি। তাদের পানে চোখ তুলে তাকায় এমন সাধ্য নেই কোনো রাজা-বাদশার। আরবের 'বদ্দু'রা তো গণনার বাইরে। কিন্তু 'আরবের বদ্দু' মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন কেসরার দম্ভ। জয় করে নিলেন ইরানের মাটি ও মানুষের মন। মুসলমানদের হাতে পরাজিত হলো রোমের দাম্ভিক রাজা হেরাক্‌ল। জয় হলো ফিলিস্তিন ও শাম।

ইতিহাস বিস্ময়ে হতবাক! আট-দশ হাজার মুজাহিদ। একের পর এক দুর্গ-নগরী জয় করে চলল। পরাজিত হলো মহাপ্রতাপশালী সম্রাট হেরাক্লিয়াসের লক্ষাধিক সৈন্যের সুবিশাল বাহিনী। পরবর্তী যুদ্ধে তাঁরা নিজেদের প্রমাণ করেন আরও সাহসী, শক্তিশালী, দুর্দান্তরূপে। জয় হলো সমগ্র মিশর। ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আলো আর আলো, যেন শেষ নেই এই আলোর। কী করে সম্ভব হলো তা? ইতিহাসে কী উত্তর লেখা আছে এ প্রশ্নের? উপন্যাসের আদলে সেই ইতিহাসেরই সবিস্তার বিবরণ *অনিঃশেষ আলো।*

♦♦♦

এক

মদীনা হিজরতের পরের ঘটনা।

নবীজি (সা.) এখনও দুনিয়াতে বর্তমান।

ঘোড়ায় চড়ে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী বিস্তৃত মরু-অঞ্চল অতিক্রম করে মদীনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এক মুসাফির। লোকটা একা। সফরসঙ্গী বলতে আছে একমাত্র বাহন ঘোড়াটা।

সেকালে কোনো মুসাফির একা সফর করত না। মানুষ কাফেলার আকারে পথ চলত। দস্যু-তস্করের আশঙ্কা থাকত পায়ে-পায়ে। তা ছাড়া দলবদ্ধভাবে পথ চললে সফর অনেক সহজ ও আরামদায়ক হতো। একজন আরেকজন থেকে সাহায্য পেত। কারও অসুখ-বিসুখ হলে অপরের থেকে সেবা-সহযোগিতা পেত।

কিন্তু তারপরও এই মুসাফির নিঃসঙ্গ কেন?

কোথায় যাচ্ছে সে?

এ-প্রশ্নের উত্তর তার ছাড়া আর কারও জানা নেই। তাকে কাফেলাছিন্ন মুসাফির কিংবা দিকহারা পথিক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তার মুখে, তার হাব-ভাবে এমন কোনো লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না! দীর্ঘ সফরের ক্লান্তির ছাপ তার মুখাবয়বে পরিস্ফুট। কিন্তু সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও ভাবলেশহীন। কখনও গুনগুন করে গান গাইছে। কখনওবা মনে হচ্ছে, সে তার ঘোড়ার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে, যেন ঘোড়া তার কথা বুঝছে।

পথিক তার বাহনটাকে ক্লান্ত হতে দিচ্ছে না। ইতিমধ্যে দুবার যাত্রাবিরতি দিয়েছে। সঙ্গে যেসব খাদ্য-খাবার আছে, পরিধানে যে-বস্ত্র আছে, তাতে অনুমিত হচ্ছে, এ জীবিকার সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো কোনো বদ্দু নয় এবং কোনো গরিব লোকও নয়। তার চেহারার জৌলুস ও গাম্ভীর্যপূর্ণ দেহাবয়ব প্রমাণ দিচ্ছে, লোকটি তার গোত্রের মান্যবর কোনো ব্যক্তিত্বই হবে।

তার সফরের আরও একটা সূর্য অস্তমিতপ্রায়। এই মুহূর্তে সে বালু-মাটির তৈরী উঁচু-নিচু টিলা-ঢিপির পাকডন্ডি অতিক্রম করছে। তার বোধহয় জানা আছে, কাছেই একস্থানে ছোট একটা খেজুরবাগান আছে। এমন প্রশান্ত মনে পথ চলছে, যেন নিজের উপর পুরোপুরি আস্থা আছে তার।

লোকটি খেজুর বাগানের কাছাকাছি চলে এসেছে। সে ঘোড়াটাকে থামাতে চাইল। কিন্তু ঘোড়া লাগামের সংকেত প্রত্যাখ্যান করে সোজা পানির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পশুটা সারা দিনের পিপাসায় কাতর। সে গলগল করে পানি পান করতে লাগল।

আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল এবং খাদ্য-পানীয়ভর্তি থলেটা খুলে সামনে নিয়ে বসে পড়ল।

* * *

এখন রাতের শেষ প্রহর। ভোরের আলো এখনও পুরোপুরি পরিস্ফুটিত হয়নি। আলো-আঁধারির পরিবেশ বিরাজ করছে প্রকৃতিতে। পথিক আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। মরুর রাতের স্নিগ্ধতা তাকে ও তার ঘোড়াটাকে সতেজ করে তুলেছে।

সূর্যটা এখন মাথার উপর। এতক্ষণে লোকটি টিলা-ঢিপির এলাকা থেকে বেরিয়ে এসেছে। খানিক সম্মুখে আবারও সেই টিলাময় এলাকা। এটাও মাটি-বালুর তৈরী। মাঝে-মধ্যে মাথার উপর শুষ্ক ঝোপঝাড়ও দেখা যাচ্ছে।

খানিক পথ চলার পর সে এই অঞ্চলে এসে প্রবেশ করল। এখানকার পথঘাট সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মরুভূমির ভেদ যাদের জানা নেই, তারা পথের কোনো দিশা রাখতে পারে না। এমন এলাকায় ঢুকেই তারা দিক-দিশা হারিয়ে ফেলে এবং হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হাঁটে তারা অনেক পথ; কিন্তু পৌঁছয় না কোথাও।

কিন্তু এই অশ্বারোহী তার ব্যতিক্রম। একে মরুভূমির ভেদী বলে মনে হচ্ছে। যেদিক থেকেই পথ পাচ্ছে, নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে সেদিকেই ঢুকে পড়ছে।

আস্তে-আস্তে টিলা-ঢিপি কমে এসেছে। পথিক ডান-বাম ও বাম-ডান করে-করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এখন তার পথ হারানোর আশঙ্কা একদম দূর হয়ে গেছে। আরও কিছু পথ অতিক্রম করার পর এখন আর টিলা-ঢিপি তেমন একটা চোখে পড়ছে না।

পথিক সর্বশেষ ঢিপিটা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এবার তার সম্মুখে বালুর বিশাল এক সমুদ্র। দিগন্ত পর্যন্ত যতদূর চোখ যায়, শুধু বালু আর বালু।

মাথার উপরের সূর্যটা প্রখর রোদ ছড়াচ্ছে। তার উত্তাপে পায়ের তলে পুড়ছে বালুর কণাগুলো। আগুনঝরা বালুগুলো কূপের পানির মতো স্বচ্ছ দেখাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন কাচের মতো ঝলমল-ঝলমল করছে বালুগুলো।

অশ্বারোহী পথিক ডান দিক থেকে কীসের যেন হাল্‌কা একটা শব্দ শুনতে পেল! শব্দটা যেদিক থেকে আসছে, পথিক সেদিকে তাকাল। দেখতে পেল, বাহনে চড়ে কে যেন এদিকে আসছে। কিন্তু বাহনটা উট, না ঘোড়া বোঝা গেল না। কারণ, বাহনসহ আরোহী মরুর রোদের আলোয় ঝলমল করছে। পদশব্দের কারণে ধারণা

করা যেতে পারে, বাহনটা উট নয়। কারণ, চলার সময় উটের পায়ের কোনো শব্দ হয় না। উট চলে নিঃশব্দে। তথাপি এখনও এটুকুই বলা যায়, কেউ একজন বাহনে চড়ে আসছে।

পথিক তার ঘোড়াটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার একটা হাত তরবারির হাতলে চলে গেল। আগন্তুক দস্যু-তস্কর হতে পারে। তার জানা আছে, সাধারণ মানুষ দীর্ঘ সফরে কাফেলা ছাড়া ভ্রমণ করে না। কাজেই ওই লোকটাকে সাধারণ পথিক বলে মনে করার কোনোই কারণ নেই। তাই আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।

অশ্বারোহী পথিকের কাছে কোনো মাল-সম্পদ, হিরা-জহরত নেই যে, সেসব লুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু তার বাহন ঘোড়াটা এমনই একটা সম্পদ যে, এটি হাতছাড়া করবার কোনোই সুযোগ নেই। গন্তব্য তার না-জানি এখনও কত দূরে!

* * *

আগন্তুক আরোহীর চেহারা যতখানি স্পষ্ট হতে লাগল, এই অশ্বারোহীর তরবারিও ততখানি খাপের বাইরে আসতে থাকল। আগন্তুককে এই সুযোগ দিতে সে রাজি নয় যে, পেছন থেকে এসে হঠাৎ তার উপর হামলা করে বসবে।

আগন্তুক নিকটে চলে এসেছে। লোকটা অশ্বারোহী। মুখটাকে রোদের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য মাথা ও চেহারার উপর একখণ্ড কাপড় ঝুলিয়ে রেখেছে। চোখদুটোরও সামান্যই দেখা যাচ্ছে। তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা এই পথিকও তার মুখটা একখানা চাদর দ্বারা আবৃত করে রেখেছে।

আগন্তুক অশ্বারোহী পূর্ব থেকে দণ্ডায়মান এই লোকটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং অনেকক্ষণ যাবত একজন অপরজনের প্রতি তাকিয়ে থাকল।

'আমরা কি পরস্পর অপরিচিতই থাকব?' –আগন্তুক অশ্বারোহী মুখ খুলে নীরবতা ভাঙল– 'একাকি সফর করছ কেন?'

'তুমি সঙ্গী ছাড়া বের হয়েছ কেন?' –এই আরোহী পালটা প্রশ্ন করল– 'কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমার গলার স্বরটা পরিচিত-পরিচিত মনে হচ্ছে!' আগন্তুক বলল।

'এমনটা আমিও তোমার কণ্ঠস্বরে অনুভব করছি'– এই পথিক বলল– 'আস; আমরা পরস্পর পরিচিত হই।'

বলেই সে তার মুখের উপর থেকে আবরণটা সরিয়ে ফেলল।

'আল্লাহর কসম ইবনে অলীদ!' –আগন্তুক আরোহী নিজের মুখোশটা খুলে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামতে-নামতে বলল– 'আমি ঠিকই চিনেছি, এই স্বর আমার সুহৃদ খালিদ ইবনে অলীদ ছাড়া আর কারুর নয়।'

'আমর ইবনে আস!'– খালিদ ইবনে অলীদ ঘোড়া থেকে নেমে বিস্ময়ের সাথে বললেন– 'তুমি হাবশার রাজা নাজ্জাশির কাছে চলে গিয়েছিলে না?'

তারা পরস্পর আরও কাছাকাছি এল এবং একজন আরেকজনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। দুজন দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে থাকল।

* * *

এরা হলেন ইসলামের ইতিহাসের দুই মহান ব্যক্তিত্ব। একজন হযরত খালিদ ইবনে অলীদ, আল্লাহর রাসূল যাঁকে 'সাইফুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর তরবারি' উপাধি প্রদান করেছিলেন। অপরজন আমর ইবনে আস (রা.), যিনি মিসর জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এরা দুজনে মিলে রোমসম্রাটকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে তার সামরিক শক্তিকে তছনছ করে দিয়েছিলেন। রোমরাজা কায়সারের সামরিক শক্তির আরেক নাম ছিল 'আতঙ্ক'। এই ভয়ানক শক্তিটাকে পরাজিত করা কারও পক্ষে সম্ভব হতে পারে এমন কল্পনাও কারও মাথায় ছিল না। 'শক্তির দেবতা' বলে খ্যাত পারস্যের রাজা হেরাক্ল ইসলামের এই ইতিহাসনির্মাতা সালারদের সামনে-সামনে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। অবশেষে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি চূড়ান্তরূপে পরাজয়বরণ করলেন। এবার তিনি কোথাও আশ্রয় পাচ্ছিলেন না। অবশেষে একটুখানি পেলেন তো মিসরে পেলেন। কিন্তু আমর ইবনে আস সেখানেও গিয়ে হাজির হলেন।

এই দুই মহান সালারের এ-বিজয়গুলো ঈমানের শক্তি, জিহাদের জযবা ও বীরত্বের ভিন্ন-ভিন্ন উপাখ্যান।

প্রশ্ন হলো, এরা দুজন উক্ত জনমানব ও গাছপালাহীন মরু-অঞ্চলে কেন এসেছিলেন?

এই কেনর উত্তর হলো, ওখানে তারা দুজন ঘটনাচক্রে একত্র হয়েছিলেন। ঘটনাটা অনেক আগের। তখনও তারা একজনও মুসলমান হননি। দুজনই কুরাইশ বংশের লোক। সামাজিকভাবে নেতৃস্থানীয় ও আর্থিকভাবে বিত্তবান।

ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ রাজপুত্রের মতো জীবনযাপন করতেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধবাজ ছিলেন– বিখ্যাত একজন যোদ্ধা ছিলেন। সমরপনা তাঁর শিরায়-শিরায় মিশে ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় স্পেশাল যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল তাঁর।

তিনি ছিলেন জন্মগত সিপাহসালার। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে হত্যা করবেন বলে পণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু কুরাইশ যে-ময়দানে, যে-রণাঙ্গনেই মুসলমানদের মোকাবেলায় এসেছে, পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়েই তাদের বিদায় নিতে হয়েছে। তারা এক-একটা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করছিল আর পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

আপন গোত্রের একের-পর-এক পরাজয় আর মুসলমানদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, সামরিক যোগ্যতা ও শৃঙ্খলা দেখে নিজগোত্র থেকে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ-এর আস্থা উঠে গেল।

এবার তিনি মনমরা-মনমরা ভাব নিয়ে জীবন কাটাতে লাগলেন। হৃদয়ের সেই উচ্ছ্বাস, সেই আবেগ, সেই উদ্দীপনা তার উবে গেল। সামরিক দক্ষতা ছাড়াও তিনি মুসলমানদের স্বভাব-চরিত্র ও চালচলনে এমন আকর্ষণীয় কিছু বিষয়-আশয় দেখতে পেলেন, যা তিনি আপন গোত্রের মাঝে দেখতে পাচ্ছিলেন না। হুদায়বিয়া সন্ধির সময় হযরত খালিদ ইবনে অলীদ আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে বের হয়েছিলেন। বিষয়টা নবীজির অজানা ছিল। তিনি কুরাইশের সঙ্গে তাদেরই শর্ত অনুযায়ী চুক্তি করে নিয়েছিলেন, যা কিনা হযরত খালিদ ইবনে অলীদ-এর জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ আগে থেকেই নবীজির স্বভাব-চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এবার হুদাইবিয়া সন্ধির পর এমন কুপোকাত হলেন যে, একদিন কাউকে কিছু না বলেই মক্কা থেকে মদীনার দিকে ছুটে চললেন। তার সম্মুখে সাড়ে তিনশো মাইল দীর্ঘ অতিশয় দুর্গম পথ। তিনি নবীজি (সা.)-এর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন।

এখানে এসে হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল আর দুজনে দুজনকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হলেন।

* * *

খালিদ ইবনে অলীদ এজন্য বিস্মিত হননি যে, লোকালয় থেকে অনেক দূরে এই বিজন মরুভূমিতে আমর ইবনে আস-এর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল! বরং তার বিস্ময়ের কারণ ছিল, আমর ইবনে আস দু-বছর আগে হাবশা চলে গিয়েছিলেন; কিন্তু এখন তিনি এখানে! যদি এই সাক্ষাতটা মক্কায় হতো, তা হলে তিনি এতটা অবাক্ হতেন না।

'আগে বলো ইবনে আস!'— খালিদ ইবনে অলীদ জিজ্ঞেস করলেন— 'এখানে তুমি কী করছ? তুমি-না হাবশার রাজা নাজ্জাশির কাছে চলে গিয়েছিলে!'

'হ্যাঁ, ইবনে অলীদ!'— আমর ইবনে আস উত্তর দিলেন— 'আমি হাবশা চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে আমি ব্যবসার জন্য যাইনি। গিয়েছিলাম অন্য এক কারণে। হঠাৎ ফিলে এলাম। আর মনে করো, পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি। এখন তোমাকে পেয়ে গেলাম। তুমি আমাকে কোনো একটা পথ দেখিয়ে দাও। আমি ভাবতে-ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

'আসল কথাটা বলো'– খালিদ ইবনে অলীদ বললেন– 'তুমিই যদি ভাবনার জগতে হারিয়ে যাও আর পথ খুঁজে না পাও, তা হলে কুরাইশের অন্য লোকেরা তো ঘোর অমানিশার মাঝে একদম গুম হয়ে যাবে।'

খালিদ ইবনে অলীদের একথার উত্তরে আমর ইবনে আস যে-কথাটি বললেন, সেটি ইসলামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তার সেই উত্তরটি শোনার আগে আমাদের জানা দরকার, আমর ইবনে আস আসলে কে ছিলেন, কী ছিলেন এবং তাঁর বংশমর্যাদা কেমন ছিল।

কুরাইশ ছিল মূর্তিপুজারি জাতি। তারা তাদের প্রতিমাগুলোর এক-একটা নাম রেখে নিয়েছিল। এরা ছিল তাদের দেবতা। এই দেবতাদের জন্য বিশেষ-বিশেষ কিছু ওয়াক্ফ ছিল। বনু সাহ্ম সেই ওয়াক্ফগুলোর দেখাশোনা করত। আমর ইবনে আস-এর পিতা আস ইবনে ওয়ায়েল সাহ্ম গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সেই সুবাদে কুরাইশের মাঝে তার বেশ মর্যাদা ছিল। কুরাইশ তাকে খুব সম্মান ও সমীহ করত। তা ছাড়া খালিদ ইবনে অলীদের পরিবারের মতো আমর ইবনে আস-এর পরিবারও খুব বিত্তবান ছিল। তাদের পেশা ছিল ব্যবসা।

আমর ইবনে আস-এর পিতা অত্যন্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর গোত্র বনু আদীকে বনু আব্দুশ শাম্স আপন ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছিল। তখন এই আমর ইবনে আস-এর পিতা আস ইবনে ওয়ায়েল-এর নেতৃত্বে বনু সাহ্ম তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু পরে যখন হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন এই বনু সাহ্মই তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটল। তখন এই ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও আমর ইবনে আস-এর পিতা আস ইবনে ওয়ায়েল তাঁকে নিজের হেফাজতে রেখেছিলেন।

আস ইবনে ওয়ায়েল এতই সম্পদশালী ছিলেন যে, তিনি রেশমের পোশাক পরিধান করতেন। আমর ইবনে আস-এর উপর এই ধনাঢ্যতা ও বংশগত মর্যাদার বেশ প্রভাব ছিল। একটি প্রভাব এই ছিল যে, তিনি আপন ব্যক্তিত্বের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। আরেকটি প্রভাব ছিল, ক্ষমতায় তিনি কাউকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতে রাজী ছিলেন না।

হযরত খলিদ ইবনে অলীদ ও কুরাইশের অন্যান্য নেতাদের মতো আমর ইবনে আসও আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর জীবনের শত্রু ছিলেন এবং কীভাবে তাঁকে হত্যা করা যায়, অব্যাহতভাবে সেই চেষ্টায় রত ছিলেন। কিন্তু তিনি পাশাপাশি এও প্রত্যক্ষ করলেন যে, কুরাইশ কোনো একটা রণাঙ্গনেও মুসলমানদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি।

আমর ইবনে আস মুসলমানদের বিরুদ্ধে আহ্যাব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খালিদ ইবনে অলীদের মতো তিনিও একজন যুদ্ধবাজ সেনানায়ক ছিলেন।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিনি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। জীবনের বাজি লাগিয়ে লড়াই করেছেন। কিন্তু এই যুদ্ধেরও পরিণতি তা-ই ঘটল, যেমনটা তিনি আগেকার যুদ্ধগুলোতে দেখে আসছিলেন। কুরাইশ সাহস হারিয়ে ফেলল এবং পরাজিত হয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল।

আহযাব যুদ্ধে কুরাইশের পরাজয় দেখে আমর ইবনে আস কুরাইশের কয়েকজন লোককে ডেকে তাদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন।

'শোনো কুরাইশের লোকেরা!' আমর ইবনে আস বললেন— 'আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মুহাম্মাদের ব্যাপারে আমরা আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত আছি। একটা যুদ্ধেও আমরা তাঁর মোকাবেলায় শক্তপায়ে দাঁড়াতে পারিনি। এমতাবস্থায় আমরা কেন মেনে নিচ্ছি না যে, মুহাম্মাদের তারকা মহাতুঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছে এবং সেই সময়টা খুব দ্রুত চলে আসছে, যখন মুসলমানরা আমাদের উপর জয়ী হয়ে যাবে!'

'আমরা আপনাকে বিজ্ঞজন ও দূরদর্শী মনে করি।' একজন বলল— 'আপনি যা বললেন, আমরাও তা-ই প্রত্যক্ষ করছি। আপনিই বলুন, এই পরিস্থিতিতে আমরা কী করব?'

'তোমরা সবাই আমার আপন'— আমর ইবনে আস বললেন— 'আমি যা চিন্তা করেছি, জানি, তোমরা কেউ আমার সেই প্রস্তাবে সম্মত হবে না। কিন্তু সকলের মঙ্গলের জন্যই আমি কথাটি বলছি। আমার সামনে একটিমাত্র পথই খোলা আছে। তোমাদের কারও মন চাইলে আমার সঙ্গে হাবশার উদ্দেশ্যে রওনা হতে পার। আমরা হাবশরা রাজা নাজ্জাশির কাছে গিয়ে আশ্রয় নেব।'

'ওখানে গিয়ে আমরা এভাবে কতদিন পড়ে থাকব?'— একজন জিজ্ঞেস করল— 'ওখানে আমরা করবটা কী?'

'ব্যবসা'— আমর ইবনে আস উত্তর দিলেন— 'ব্যবসার ব্যবস্থা যদি না-ও হয়, সম্রাট নাজ্জাশি আমাদের জীবিকার জন্য কোনো-না-কোনো একটা উপায় বের করে দেবেন। মুসলমানরা যদি কুরাইশের উপর জয়যুক্ত হয়েই যায়, তা হলে মুসলমানদের গোলামির চেয়ে নাজ্জাশির আশ্রয়ে থাকা আমি অধিক ভালো মনে করি। যদি কুরাইশ মুসলমানদের উপর জয়ী হয়, তা হলে মুহাম্মাদের এই নতুন ধর্মটার পতন ঘটবে। তখন আমরা ফিরে আসব।'

* * *

'ইবনে অলীদ!'— আমর ইবনে আস খালিদ ইবনে অলীদকে এসব বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন— 'তুমি চুপচাপ আমার বক্তব্য শুনছ। নিজে কোনো কথাটি বলছ না। তোমার এই নীরবতা থেকে আমি এছাড়া আর কী বুঝতে পারি যে, আমার এই কথাগুলো তোমার ভালো লাগছে না?'

'না'– খালিদ ইবনে অলীদ বললেন– 'আমারও কিছু বলবার আছে। কথা আমিও বলব। আমি তোমাকে এমন কিছু কথা বলব, যা তুমি ছাড়া অন্য কারও কাছে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তুমি তোমার বক্তব্য শেষ করো; তারপর আমার কথা শুরু করব।'

'কয়েকজন লোক আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল'– আমর ইবনে আস আবার বলা শুরু করলেন– 'আমরা ব্যবসাকে বাহানা বানালাম এবং রওনা হলাম। তোমার সম্ভবত হাবশার পথঘাট চেনা থাকবে। আমরা সমুদ্রের কূল ধরে-ধরে এগিয়ে গিয়ে ইয়েমেনে প্রবেশ করলাম এবং পরে আদ্‌ন গিয়ে পৌঁছলাম। আমরা আদ্‌নের সন্নিকটে সেই স্থানটাতে গিয়ে উপনীত হলাম, যেখানে সমুদ্রের ব্যস খুবই কম। বড় একটা পালতোলা নৌকোয় করে আমরা নদীটা পার হলাম।

'এবার আমাদের স্থল পথের সফর শুরু হলো। আমরা তিন জায়গায় যাত্রাবিরতি দিয়ে-দিয়ে হাবশার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় পৌঁছে গেলাম। তুমি নিশ্চয় অনুমান করতে পারছ আমাদের এই সফর কত দীর্ঘ ও কঠিন ছিল। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। আমরা হাবশার বাদশা নাজ্জাশির দরবারে গেলাম এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। একথাও বললাম যে, আমরা ব্যবসায়ী মানুষ; তাই আপনার জন্য আমরা কোনো বোঝা হব না। আমরা আপনার কাছে আশ্রয় ছাড়া আর কিছু চাইব না। নাজ্জাশি আমাদের রাষ্ট্রীয় অতিথির মতো রাখলেন। আমাদের থাকার জন্য তিনি রাজকীয় ব্যবস্থা করে দিলেন।'

'তোমার এই কাহিনী শুনতে আমার মোটেও ভালো লাগছে না'– খালিদ ইবনে অলীদ বললেন– 'আমি শুনতে চাচ্ছি, তুমি ফিরে এসেছ কেন আর এখন কোথায় যাচ্ছ। তুমি যদি হাবশা থেকেই এসে থাক, তা হলে মক্কায় থামলে না কেন? মক্কা তো তুমি অনেক পেছনে ফেলে এসেছ। তুমি বিশেষ কোনো কথা আমার থেকে লুকোচ্ছ না-কি?'

'না ইবনে অলীদ!'– আমর ইবনে আস বললেন– 'তুমি আমার সুহৃদ। কুরাইশের মাঝে তোমার সেই মর্যাদা আছে, যেরূপ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত আমি। মক্কা থেকে রওনা হওয়ার সময় আমি তোমাকে একথা বলিনি, আমি আজীবনের জন্য হাবশা চলে যাচ্ছি। এমন কথা আমি কাউকেই বলিনি। কিন্তু এখন আমার অন্তরে এমন একটা বিষয় উদিত হয়েছে, যার ব্যাপারে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। ভালোই হলো যে, তোমাকে পেয়ে গেছি।'

'তোমার সঙ্গীরা কোথায়?' খালিদ ইবনে অলীদ জিজ্ঞেস করলেন।

'তাদের ওখানেই রেখে এসেছি'– আমর ইবনে আস উত্তর দিলেন– 'আমি যে-ইচ্ছা ও সংকল্প নিয়ে ওখান থেকে এসেছি, আমার সঙ্গীদের সেটি মনঃপুত নয়। আমি ওদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে এসেছি।'

'আমি মনে করেছিলাম, তুমি পথ হারিয়ে ফেলেছ'– খালিদ ইবনে অলীদ বললেন– 'কিন্তু তোমার কথা থেকে সন্দেহ হচ্ছে, তোমার বিবেক সঠিক চিন্তা থেকে সরে গেছে। এত দীর্ঘ কথা বলো না ইবনে আস! আমাকে সোজা করে বলে দাও তোমার পরিকল্পনা কী? কোন গন্তব্যের পথিক তুমি?'

'ইবনে অলীদ!'– আমর ইবনে আস বললেন– 'আমার কাহিনী তোমাকে পুরোপুরি না শুনিয়ে আমার ইচ্ছার কথা তোমাকে বলব না। অন্যথায় তুমি ভুল বুঝবে। তুমি তো জান, আমাদের ব্যবসায়ীরা হাবশা যাওয়া-আসা করে। আমরা ওখানে প্রায় এক বছর ছিলাম। একদিন আরব ব্যবসায়ীদের একটা কাফেলা আদ্দিস আবাবা এসে পৌঁছয়। তাদের মাঝে আমার চেনা-জানা লোকও ছিল। তাদের থেকে জানতে পারলাম, মুহাম্মাদ হুদাইবিয়া নামক স্থানে কুরাইশের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন এবং সেই চুক্তির ভিত্তিতে কুরাইশ ও মুসলমানরা দশ বছর কোনো যুদ্ধ করবে না। তারপর আমি আরও জানতে পারলাম, মুহাম্মাদ কুরাইশের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে, তিনি এক বছর পর ওমরা করতে আসবেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করলাম না এমন কোনো চুক্তি হয়ে থাকবে। কিন্তু অল্প কদিন পরই মক্কা থেকে আসা আরেক ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা হলো। সে বলল, মুসলমানরা তাদের নবীর সঙ্গে এক বছর পর ওমরা করতে এসেছিল এবং তারা পুরোপুরি শান্তভাবে ওমরা করে ফিরে গেছে।

'আমি মক্কা থেকে আসা লোকটার কাছে আরও কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে উত্তর যা পেলাম, তাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, কুরাইশ মুসলমানদের বিজয়কে মেনে নিয়েছে। শোনো ইবনে অলীদ! আমার কথাগুলো তোমার ভালো লাগুক আর না লাগুক, আমি আমার মনের কথা-ই বলছি। এসব শুনে আমি মুহাম্মাদের চরিত্রের অনুরক্ত হয়ে গেলাম এবং চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, মুহাম্মাদের ভাগ্যতারকা তুঙ্গে পৌঁছে গেছে। আমি এই তথ্যও জানতে পারলাম যে, মদীনা যাওয়ার পর ইসলাম দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর জানতে পারলাম, কুরাইশ মক্কা থেকে মদীনা আক্রমণ করতে গিয়েছিল; কিন্তু মুসলমানরা অভিনব এক কৌশল অবলম্বন করে তাদের সেই অভিযানকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। শুনেছি, মুসলমানরা নাকি মদীনার চার পাশে পরিখা খনন করেছিল।'

খালিদ ইবনে অলীদও এই আক্রমণ-অভিযানে শামিল ছিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে এই পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেজন্য এই পরিখাযুদ্ধের পুরো ঘটনা তার জানা ছিল। তিনি আমর ইবনে আসকে এই যুদ্ধের ইতিবৃত্ত শোনালেন। অবশেষে পরিখা খননের মাধ্যমে মুসলমানরা যে-দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

'এবার তুমিই বলো বন্ধু আমার!'– আমর ইবনে আস বললেন– 'মুসলমানদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব আমি কেন মেনে নেব না? আমি এসব বৃত্তান্ত হাবশা বসেই শুনেছি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, এখন আর আমাদের কুরাইশ ভাইদের কাছে কিছু নেই। আমি এই ভাবনা নিয়ে এসেছি, মুহাম্মাদের মাঝে সেই মহত্ত্ব বিদ্যমান আছে, যা আমাদের গোত্রের বড় কোনো ব্যক্তিত্বও এখনও পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি। আমি একজন লড়াকু। তুমিও লড়াকু। কিন্তু আমরা কী করতে পেরেছি! তুমি-আমি মিলে গোত্রের লোকদের নিয়ে কোনো সাফল্য দেখাতে পেরেছি কি? পারিনি। এবার আমি তোমাকে এমন একটি কথা বলব, যা তোমাকে উত্তেজিত করে তুলবে, তোমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেবে। এমনও হতে পারে, আমাকে হত্যা করতে তুমি তরবারিটা কোষমুক্ত করে ফেলবে।'

'তোমার মনের কথাটা আমার কাছ থেকে শুনে নাও দোস্ত!'– খালিদ ইবনে অলীদ বললেন– 'তুমি ইসলাম গ্রহণের মনোবাঞ্ছা নিয়ে এসেছ। কী, আমি কি ভুল বললাম?'

'আল্লাহর কসম ইবনে অলীদ!'– আমর ইবনে আস বললেন– 'তুমি আমার মনের কথা জেনে ফেলেছ। কিন্তু এই ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি খেই হারিয়ে ফেলছি। মনে প্রশ্ন জাগছে, আমার এই সিদ্ধান্ত আবার ভুল হয়ে গেল না তো? আমি আমার গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাচ্ছি না। কিন্তু যখনই আমি আমার আপনজনদের পানে তাকাই, দেখতে পাই, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা কিছুই করতে পারেনি আর আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তারা এরই উপযুক্ত যে, মুসলমানরা তাদের উপর জয়যুক্ত হবে। তুমি আমাকে বলো ইবনে অলীদ! আমি কি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইনি? আমার সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, আমার মাথাটা তুমি দেহ থেকে ছিন্ন করে ফেলো।'

খালিদ ইবনে অলীদ মাথা উঁচু করে আকাশপানে তাকিয়ে অত্যন্ত প্রাণবন্ত একটা অট্টহাসি দিলেন। তারপর মাথা নামিয়ে আমর ইবনে আস-এর প্রতি তাকিয়ে নিজের হাতদুটো তার উভয় কাঁধের উপর রাখলেন। এ-সময় খালিদ ইবনে অলীদ-এর চেহারাটা যেন অপার্থিব এক আনন্দে জ্বলজ্বল করছিল।

'ইবনে আস!'– খালিদ ইবনে অলীদ আমর ইবনে আস-এর কাঁধে আলতো একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন– 'তোমার সিদ্ধান্ত যথার্থ। তুমি ভুল করনি। তুমি পথ হারাওনি। এই সফরে আমি তোমার সহচর। আমাদের দুজনের গন্তব্য এক। আমিও মুসলমান হতে মদীনা যাচ্ছি। মক্কায় কাউকে বলে আসিনি। আসো; আমরা একসঙ্গেই যাই।'

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, আমর ইবনে আস ও খালিদ ইবনে অলীদ একসঙ্গে মদীনা গিয়ে পৌঁছলেন এবং নবীজির দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

একথা বলা মুশকিল যে, এই দুই কুরাইশনেতাকে দেখার পর আল্লাহর রাসূল (সা.) তাৎক্ষণিকভাবে কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। সে-সময় নবীজির দরবারে যদি কিছুলোক উপস্থিত থেকে থাকে, তা হলে তাদের অন্তরে অবশ্যই এই সন্দেহ দানা বেঁধে থাকবে যে, এরা ভালো কোনো নিয়তে আসেনি। সকলেরই জানা ছিল, খালিদ ইবনে অলীদ নবীজিকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে রেখেছিলেন। এতটুকু তো অবশ্যই হয়েছে যে, তখন নবীজির সেই মজলিসটি কিছু সময়ের জন্য সুনসান নীরবতায় ছেয়ে গিয়েছিল। তারা দুজন সাধারণ কোনো মানুষ হলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু তারা তো ছিলেন মক্কার ইসলামবিরোধী শিবিরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ভালোই হলো যে, খালিদ ইবনে অলীদ ঝটপট মুখ খুললেন এবং আসরে যে-গুমোটভাব তৈরি হয়েছিল, সেটা কেটে গেল।

'আমি আপনার হাতে বায়'আত হতে এসেছি'– খালিদ ইবনে অলীদ বললেন– 'আমি অন্তর থেকে স্বীকার করছি, আপনি আল্লাহর রাসূল।'

নবীজি (সা.) খালিদ ইবনে অলীদকে বায়'আত করে নিলেন।

খালিদ ইবনে অলীদ ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

তারপর নবীজি আমর ইবনে আস-এর প্রতি তাকালেন এবং মুখে মুচকি হাসি ফুটিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমর ইবনে আস এগিয়ে নবীজির কাছে এসে বসলেন।

'আমিও আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে মেনে নিচ্ছি'– আমর ইবনে আস বললেন– 'কিন্তু বায়'আত গ্রহণের আগে আমি আপনার কাছে একটি নিবেদন জানাতে চাই। তা হলো, আপনি আমার বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। আগামীতে আমি সতর্কতার সঙ্গে জীবন যাপন করব এবং নিজেকে সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র রাখব।'

মিসরের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ হাসনাইন হাইকেল বিভিন্ন সূত্রে লিখেছেন, রাসূলে আকরাম তখন আমর ইবনে আসকে বলেছিলেন, মানুষের গুনাহ মাফ করার মালিক আল্লাহ। আর যেলোক তাওবা করে ইসলামে প্রবেশ করে, আল্লাহপাক তার বিগত দিনগুলোর সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেন। নবীজি আমর ইবনে আসকে বললেন, তুমি বায়'আত করে নাও; তারপর তোমার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

এভাবে আমর ইবনে আসও ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন।

নবীজি (সা.) খালিদ ইবনে অলীদ ও আমর ইবনে আসকে মক্কা থেকেই জানতেন। তাদের যোগ্যতা ও গুণাবলির ব্যাপারে তিনি বেশ ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। তিনি তাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করে নিলেন। বরং ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন,

নবীজি তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা নবীজি (সা.)-এর সেই আস্থা ও বিশ্বাসের লাজ পুরোপুরি রক্ষা করেছেন।

ইসলাম দুজন সিপাহসালার পেয়ে গেল।

* * *

এই আখ্যান মুসলমানদের মিসর-জয়ের। যে-কজন মুসলিম সেনাপতি এই অভিযানে ফেরাউনদের ভূখণ্ডে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন, প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আমর ইবনে আস (রা.) ছিলেন তাঁদের সিপাহসালার। মিসর-জয়ের ভাবনা ও প্রত্যয় তাঁরই মাথায় এসেছিল এবং তিনি-ই আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)কে এই অভিযান পরিচালনার জন্য সম্মত করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) প্রথম-প্রথম রাজি হননি। তিনি হযরত আমর (রা.)-এর এই প্রস্তাব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে একদিন তিনি সম্মত হয়ে গেলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, হযরত আমর ইবনে আস (রা.) মিসরকে সালতানাতে ইসলামিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার জন্যই দুনিয়াতে এসেছিলেন।

এসব বিবরণ এই উপাখ্যানে আপনারা বিস্তারিত জানতে পাবেন। এই বইয়ে আমি যেসব বিবরণ উল্লেখ করব, তার কিছু আপনাদের মনে আনন্দ দেবে, কিছু ভাবনার খোরাক জোগাবে, কিছু আপনাদের উদ্বেলিত ও অনুপ্রাণিত করবে। কিছু কাহিনী পাঠকদের মনে বেদনা সৃষ্টি করবে। কিন্তু যে-বাস্তবতাটি আমাদের সামনে পরিস্ফুটিত হবে, সেটিই হলো আসল ভাবনার বিষয়। আর তা হলো, আল্লাহপাক যে-কাজ করতে ইচ্ছা করেন, তার জন্য পরিবেশ ও পরিস্থিতি তিনিই তৈরি করে দেন। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ ও আমর ইবনে আস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য নবীজি (সা.)-এর খেদমতে হাজির হওয়া আকস্মিক কোনো ঘটনা ছিল না। আল্লাহপাক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ইসলামকে দুজন ইতিহাসনির্মাতা ও সিপাহসালার দান করবেন, তাঁদের হাতে রোমান শক্তিকে তছনছ করিয়ে দেবেন এবং অবশেষে আমর ইবনে আস (রা.)-এর দ্বারা মিসরকে ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়ে দেবেন।

হযরত আমর ইবনে আস (রা.) ব্যবসা ও ভ্রমণের সুবাদে ইরাক, শাম, ফিলিস্তিন ও মিসর যাওয়া-আসা করতেন। এখানে আমি তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগেকার একটি ঘটনা বলছি।

একবার তিনি কয়েকজন কুরাইশের সঙ্গে বাইতুল মুকাদ্দাস গেলেন। সেখানে তাঁর বেশ কদিন থাকার পরিকল্পনা ছিল। তিনি শহরের বাইরে উন্মুক্ত এক জায়গায় ছাউনি ফেলে অবস্থান গ্রহণ করলেন। তাঁরা পালাক্রমে একজন একদিন উট চরানোর জন্য নিকটস্থ একটা বনে চলে যেতেন।

একদিন উট চরানোর জন্য আমর ইবনে আস (রা.)-এর পালা এল। বেলা দ্বি-প্রহরের পর তিনি উটগুলোকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন এবং পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে ছেড়ে দিলেন। ওখানে অনেক ঘাস ও ঝোপঝাড়ের সমাহার ছিল। সবুজ গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ ছিল। গরমের মৌসুম ছিল। প্রচণ্ড গরম পড়ছিল।

হযরত আমর ইবনে আস (রা.) দেখলেন, একব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নামছে। লোকটার অবতরণের ধরন বলছিল, তার পাদুটো থরথর করে কাঁপছে এবং এই এক্ষুনি পা ফসকে গড়িয়ে-গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবে। হতে পারে, গড়িয়ে নিচে এসে পড়ার আগেই তার প্রাণবায়ু উড়ে যাবে।

আমর ইবনে আস (রা.) একটা গাছের তলে বসে লোকটাকে নিবিষ্ট মনে অবলোকন করছিলেন। ভয়ে তাঁর গা ছমছম করে উঠল।

লোকটা পাহাড় থেকে নিচে নেমে এল বটে; কিন্তু এখন আর হাঁটতে পারছে না। পা তার চলছে না। পড়িমড়ি করে একটু হেঁটে আবার বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে পা টেনে-টেনে কোনোমতো আমর ইবনে আস-এর কাছে পৌঁছে গেল এবং তার সামনে এসে ধপাস্ করে পড়ে গেল।

'পানি'– লোকটার মুখ থেকে ফিসফিস শব্দ বেরুল– 'পানি; আমি মরে যাব।'

আমর ইবনে আস-এর কাছে এক মশক পানি ছিল। মশকটা ভরা ছিল। গরম এত বেশি পড়ছিল যে, একটু পর-পর পিপাসা লাগছিল আর গলায় কাঁটার মতো বিদ্ধ হচ্ছিল। আমর ইবনে আস এক ঢোক করে পানি পান করছিলেন আর পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করছিলেন।

আমর ইবনে আস মশকের মুখটা খুললেন। তারপর লোকটাকে ঠেস দিয়ে বসালেন এবং মশকের মুখ তার মুখের সঙ্গে লাগালেন। লোকটা এত পিপাসার্ত ছিল যে, গলগল করে আধা মশক পানি পান করে ফেলল।

'তুমি আমাকে পানি নয়– নতুন জীবন দান করেছ– লোকটা বলল– 'আমি হযরত ঈসার এই ভূখণ্ড পরিদর্শনের জন্য পাহাড়ে চড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, উপরে উঠে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এই অঞ্চলটা দেখব। কিন্তু কী বোকামিটা করলাম যে, সঙ্গে পানি নিয়ে গেলাম না! কপাল ভালো যে, কোনোমতে জীবনটা নিয়ে তোমার কাছে আসতে পেরেছি।'

লোকটা নিজের নাম জানাল শাম্মাস। খ্রিস্টান। মিসরের বৃহৎ শহর ও বন্দরনগরী ইস্কাকান্দারিয়ার বাসিন্দা।

সে-সময় ইস্কান্দারিয়া মিসরের রাজধানী ছিল আর মিসরে ইরানিদের শাসন ছিল।

* * *

শাম্মাস পানি পেয়ে গেল এবং পেট পুরে পানি পান করল। এখন তার দেহে সঞ্জীবতা ফিরে এসেছে। লোকটা ক্লান্ত ছিল। এবার চোখে ঘুমঘুম ভাব অনুভব করতে শুরু করল। আমর ইবনে আসকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উঠে কাছেই একটা গাছের তলে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শরীরটা মাটিতে এলিয়ে দেওয়ামাত্র তার দুই চোখের পাতা বুজে এল।

শাম্মাস নাক ডাকতে শুরু করল।

আমর ইবনে আস লোকটার ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আপন কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি তাঁর উটগুলোকে দেখতে লাগলেন যে, কোনো উট এদিক-ওদিক চলে গেল নাকি। তিনি মশকটার পানে তাকালেন। মশকে সামান্য একটু পানি আছে শুধু। আমার ইবনে আস মনে-মনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করলেন, আমি একজন পিপাসাকাতর মানুষের জীবন রক্ষা করেছি। অন্যথায় হতভাগা লোকটা এখানেই বেঘোরে প্রাণ হারিয়ে ফেলত।

আমর ইবনে আস ঘুমন্ত শাম্মাসের পানে তাকালেন। সহসা তিনি আঁৎকে উঠলেন। ইয়া লম্বা কালচে বর্ণের একটা সাপ বুক টেনে-টেনে ধীরে-ধীরে ঘুমন্ত মানুষটার দিকে এগিয়ে আসছে!

তীব্র গরমের সময় সাপের বিষ খুবই তেজ হয়ে যায় এবং ছোবল মারামাত্র ক্রিয়া করে ফেলে।

সাপ আর শাম্মাসের মাঝে এখন আর এক কি দুই পা দূরত্ব আছে। আমর ইবনে আস-এর হাতে এতটুকু সময় নেই যে, দ্রুত ছুটে গিয়ে শাম্মাসকে ছোবল মারার আগে-আগে সাপটাকে মেরে ফেলবেন কিংবা তাড়িয়ে দেবেন।

আমর ইবনে আস আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন।

সে-যুগে রাখালরা তির-ধনুক ছাড়া ঘর থেকে বের হতো না। তরবারি-বর্শাও সঙ্গে থাকত কারও-কারও। তির-ধনুক রাখা এজন্য জরুরি মনে করত যে, অনেক সময় ভেড়া-বকরির পাল চরতে-চরতে দূরে চলে যেত। এই সুযোগে যদি কোনো হিংস্র পশু আক্রমণের জন্য ধেয়ে আসত, তা হলে রাখালরা দূর থেকে তির ছুড়ে তাদের তাড়িয়ে দিত।

আমর ইবনে আস উট চরাতে গিয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর সঙ্গে তির-ধনুক ছিল। তিনি সাপটাকে দেখেই ধনুকে তির সংযোজন করলেন এবং জন্তুটার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলেন। দূরত্ব সামান্য ছিল বিধায় তির সাপটার মাথা ভেদ করে মাটিতে গিয়ে গেঁথে গেল। সাপটা জায়গাতেই বারকয়েক ওলট-পালট করে মরে গেল। তিনি শাম্মাসকে জাগানো সঙ্গত মনে করলেন না– লোকটা গভীর নিদ্রায় তলিয়ে আছে; ওভাবেই থাকুক।

কিছুক্ষণ পর শাম্মাসের চোখ খুলল এবং উঠে বসল। সবার আগে সাপটার উপর তার চোখ পড়ল এবং এ্যা! বলে শঙ্কিত হয়ে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে সাপটাকে দেখতে লাগল। সে সাপটার মাথা ভেদ করে মাটিতে গেড়ে থাকা তিরটা দেখে মোড় ঘুরিয়ে আমর ইবনে আস-এর প্রতি তাকাল। মুখে তার অপার বিস্ময়ের ছাপ। আমর ইবনে আস দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

'মরে গেছে'– আমর ইবনে আস বললেন– 'এখন আর ভয় পাওয়ার দরকার নেই। তোমার দিকে যাচ্ছিল এবং একেবারে কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। আমার তির ওকে আর সামনে এগুতে দেয়নি– ওখানেই কাত করে ফেলেছে।

শাম্মাস ধীরে-ধীরে আমর ইবনে আস-এর কাছে এসে বসল। লোকটা আমরের মুখপানে নির্বাক তাকিয়ে রইল, যেন তার জিহ্বা বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আমর ইবনে আসও তাকে দেখতে থাকলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

'তোমাকে আমার মানুষ বলে মনে হচ্ছে না'– শাম্মাস বলল– 'আমার মনে হচ্ছে, খোদা তোমাকে আকাশ থেকে আমার নিরাপত্তার জন্য প্রেরণ করেছেন। সত্য বলো, তুমি কি উর্ধ্বলোকের বাসিন্দা নও?'

'বিষয়টা তুমি যতটা বড় করে দেখছ, ততটা বড় নয়'– আমর ইবনে আস বললেন– 'এখানে এতটা বিস্ময়েরও কিছু নেই। মানুষই তো মানুষের কাজে আসে। আমি আকাশ থেকে অবতরণ করিনি। ব্যবসার জন্য মক্কা থেকে এসেছি এবং কুরাইশ গোত্রের সদস্য।'

'আমি মিসরের সর্ববৃহৎ নগরী ইস্কান্দারিয়ার নাগরিক'– শাম্মাস বলল– 'মনে করো না, মিসরের লোক বলে আমি তোমাদের আরবের রীতি-নীতি কিছু জানি না। আমি জানি, আরবে একটি জীবনের পণ একশো উট। আমার আরও জানা আছে, একশো উটের মূল্য এক হাজার দিনার। কী, আমি কি ভুল বলেছি?'

'না বন্ধু!'– আমর ইবনে আস বললেন– 'তুমি ভুল বলনি। আমাদের দেশ আরবে একজন মানুষের জীবনের মূল্য একশো উটই। আর এই মূল্য এত বেশি যে, কেউ তা পরিশোধ করতে পারে না। আর সেজন্য কেউ কাউকে হত্যাও করে না। কিন্তু হঠাৎ মানবীয় জীবনের এই মূল্যের কথাটা তোমার মনে পড়ল কেন?'

'সেই প্রশ্ন করো না'– শাম্মাস বলল– 'আমি তোমাকে আমাদের দেশ মিসরে নিয়ে যাব। আর খোদার কসম করে বলছি, আমি তোমাকে দুটি জীবনের মূল্য পরিশোধ করব। এ তোমার পাওনা, যা আমাকে পরিশোধ করতেই হবে। অন্যথায় খোদা আমার প্রতি নারাজ হবেন। এটি নবী-রাসূলগণের পবিত্র ভূখণ্ড। আমি তাঁদের পূত আত্মাগুলোকে রুষ্ট করার দুঃসাহস দেখাতে পারি না।'

'কিন্তু একথাটি তো বলবে'– আমর ইবনে আস বললেন– 'সেই লোকদুজন কারা, যাদের তুমি হত্যা করেছ? আর আমি-ইবা কে যে, আমি তাদের পণ বুঝে নেব?'

'আরবের মানুষের বুদ্ধি-সুদ্ধি তো এত কম হয় না, যেমনটা তোমাকে নির্বোধ মনে হচ্ছে'– শাম্মাস বলল– 'তুমি দুবার আমার জীবন রক্ষা করেছ। পিপাসা আমার জীবন হরণ করে নিয়েছিল। তুমি যদি আমাকে পানি না পান করাতে, তা হলে আমি মরেই গিয়েছিলাম। তারপর আবার তুমি আমাকে বিষধর একটা সাপের ছোবল থেকে রক্ষা করেছ। তির ছুড়তে যদি তুমি আর সামান্যও বিলম্ব করতে, তা হলে সাপ আমাকে দংশন করেই ফেলেছিল। আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার আগেই মরে যেতাম। এবার বলো তুমি আমার কাছে দুটি জীবনের মূল্য পাওনা হয়ে গেছ কি-না?'

আমর ইবনে আস অত্যন্ত ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য। তিনি শাম্মাসকে বললেন, এর দ্বারা কোনো পাওনা সাব্যস্ত হয় না। এ তো আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।

'আরব বন্ধু আমার!'– শাম্মাস বলল– 'তুমি জান না, তুমি কার জীবন রক্ষা করেছ। খোদা আমাকে এত সম্পদ ও এত সম্মান দান করেছেন যে, দেশের রাজপরিবার ও শাসকবর্গের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তারা আমাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন। আমার কাছে যদি এখানে দুই হাজার দিনার থাকত, তা হলে তোমার পাওনা আমি এখনই পরিশোধ করে দিতাম। আমি তোমাকে ইস্কান্দারিয়া নিয়ে যাব এবং তুমি তাতে না বলতে পারবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। যেখানে তুমি আমাকে দুটি উপকার করেছ, সেখানে আরও একটি উপকার করো যে, তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

আমর ইবনে আস ধনাঢ্য পিতার সন্তান ছিলেন। নিজেও অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। সেই সুবাদে দেশ-বিদেশ ভ্রমণে খুব সখ ছিল তাঁর। যখন যেখানে খুশি চলে যেতেন। পকেটভরা অর্থ আর মনভরা সখ থাকলে কী-না করা যায়। শাম্মাসের প্রস্তাব গ্রহণে তিনি এজন্য ইতস্তত করছিলেন যে, এই বিনিময় গ্রহণ করতে তিনি রাজী ছিলেন না। অন্যথায় মিসরভ্রমণে যেতে তার কোনেই আপত্তি ছিল না। তিনি ইস্কান্দারিয়ার অনেক সুখ্যাতি শুনেছেন। একাধিকবার ওই শহরে যাওয়ার ইচ্ছাও তাঁর মাথায় এসেছিল।

সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসে তিনি আজকের ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনালেন। অবশেষে জানালেন, লোকটা আমাকে তার উপকারের বিনিময় দিতে চাচ্ছে।

আমর ইবনে আস কাফেলার নেতা ছিলেন। কাজেই তিনি যেতে চাইলে সঙ্গীরা তাঁকে বাধা দিতে পারে না। তারা বলল, আপনি তার প্রস্তাব মেনে নিন এবং তার সঙ্গে চলে যান।

আমর ইবনে আস তাঁর এক সাথীকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন এবং পরদিনই শাম্মাসের কাছে চলে গেলেন। জানালেন, আমি তোমার সঙ্গে ইস্কান্দারিয়া যেতে প্রস্তুত আছি।

দুজনে রওনার দিন-ক্ষণ ঠিক করে নিলেন।

সেযুগে সুয়েজ খালের অস্তিত্ব ছিল না। ফলে আরব থেকে স্থল পথেই মিসর যাওয়া যেত। আবার ইস্কান্দারিয়া যেতে নৌপথও ছিল। কিন্তু এরা কোন পথে গিয়েছিলেন– স্থলপথে, নাকি নৌপথে– বলা সম্ভব নয়। ইতিহাস শুধু এটুকুই লিখেছে যে, আমর ইবনে আস তাঁর এক সঙ্গীকে নিয়ে শাম্মাসের সঙ্গে ইস্কান্দারিয়া পৌঁছে গিয়েছিলেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ইস্কান্দারিয়ার দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার।

ইস্কান্দারিয়া নগরীর জাঁকজমক ও রূপ-সৌন্দর্য দেখে আমর ইবনে আস থ বনে গেলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, নগরীটা দেখে আমর ইবনে আস অলক্ষে বলে উঠেছিলেন, 'শাম্মাস! এমন শহর আর এত বিত্ত তো আমি কখনও স্বপ্নেও দেখিনি! তোমাদের এত সম্পদ! তোমাদের এত সুখ!'

ঐতিহাসিকগণ একটি ঘটনা লিখেছেন। কাহিনীটি যেমন আনন্দদায়ক, তেমনি শিক্ষণীয়। সে-সময় ইস্কান্দারিয়ায় একটি উৎসব পালিত হচ্ছিল। উৎসবটি কীসের ছিল, ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। নগরীর সাধারণ মানুষই নয় শুধু– রাজপরিবারের সদস্যবর্গ এবং উজির-আমিরগণও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অশ্বচালনা, তরবারিচালনা, তিরন্দাজি ও কুস্তি প্রতিযোগিতাও হচ্ছিল। সবাই উন্নতমানের পোশাক পরিধান করে উৎসবে এসে যোগ দিয়েছে।

শাম্মাস আমর ইবনে আসকেও রেশমি পোশাক পরিধান করিয়ে উক্ত মেলায় নিয়ে গেল। আমর ইবনে আস লক্ষ করলেন, রাজপরিবারের সদস্যবর্গ ও উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাঝে শাম্মাসের বেশ পরিচিতি ও মর্যাদা আছে। সেদিন উক্ত মেলার বিশেষ একটি অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছিল।

সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য বৃত্তাকারে দাঁড়ানোর আলাদা জায়গা করা হয়েছে। রাজপরিবারের সদস্যদের বসার জন্য সামনে গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে। জনতার ভিড়ের মধ্যকার ফাঁকা জায়গাটায় একব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে একটা সোনালি বল। সে বারবার সর্বশক্তি ব্যয় করে বলটাকে উপর দিকে ছুড়ে মারছে আর সেটা উপরে উঠে আবার নিচে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে।

শাম্মাস আমর ইবনে আসকে জানাল, এই উৎসব যখনই পালিত হয়, তখন এই অনুষ্ঠানটি অবশ্যই অনুষ্ঠিত হয়। একজন চোখদুটো বন্ধ করে বলটা উপর দিকে ছুড়ে মারে। তাদের বিশ্বাস হলো, এই বল যার কোনো এক বাহুতে গিয়ে পতিত হবে, সে রাজার আসনে অধিষ্ঠিত না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না।

আমর ইবনে আস দেখলেন, বলটা বেশিরভাগই মাটিতে পড়ছে। আবার কারও গায়ে পড়লেও বাহুতে পড়ছে না– মাথায়, কাঁধে কিংবা পিঠে পড়ছে। শাম্মাস যেহেতু সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, তাই সে সামনের ভিআইপি গ্যালারিতে বসার সুযোগ পেয়েছে এবং আমর ইবনে আসকেও সামনে নিয়ে গেছে।

বল নিক্ষেপকারী লোকটি একবার বলটা উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে ফিরে এসে আমর ইবনে আস-এর ডান বাহুতে পতিত হলো এবং আমর বলটাকে সেখানেই ধরে ফেললেন। রাজপরিবারের সদস্যরা উঠে দাঁড়িয়ে গেল। তারা সেই লোকটিকে ভালোভাবে দেখতে চাচ্ছে, যার বাহুতে বলটা পড়েছে।

শাম্মাস উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল, এর নাম আমর ইবনে আস। ইনি মক্কা থেকে এসেছেন।

দর্শনার্থীদের মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি হো-হো করে হেসে উঠল। কয়েকজন শব্দ করেই বলে উঠল, এসবই মিথ্যা। আরবের এই বদ্দু লোকটা আমাদের রাজা হতে পারে না। ভিড়ের মধ্য থেকে সমস্বরে কয়েকটা শোর উঠল, না-না এ হতে পারে না। এমন বেঁটেকায় বদ্দু মানুষ মিসরের রাজা হয় কী করে!

হযরত আমর ইবনে আস (রা.) আরবের সাধারণ মানুষদের মতো দীর্ঘকায় ছিলেন না। উচ্চতায় বেঁটে ছিলেন। মাথাটা বেশ বড়। হাত ও পা অপেক্ষাকৃত অনেক লম্বা। চোখের ভ্রূ খুব ঘন ছিল। মুখ ও বুক ছিল বেশ চওড়া। দাড়ি অনেক লম্বা। এটা কোনো আকর্ষণীয় মানুষের দেহাবয়ব হতে পারে না। কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে একটি ঔজ্জ্বল্য ও প্রাণবন্ততার ছাপ সব সময় পরিস্ফুট থাকত। ক্ষুব্ধ হওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটলেও তিনি ক্ষুব্ধ হতেন না।

তাঁর এহেন বেঢঙ্গা শরীরটা দেখে ইস্কান্দারিয়ার লোকেরা বেশ মশকারা করল এবং বলল, এই লোক আমাদের রাজা হওয়ার যোগ্য নয়।

কিন্তু আল্লাহর ভেদ বুঝবার সাধ্য মানুষের নেই। কেউই বুঝতে পারল না– খোদ আমর ইবনে আস নিজেও আন্দাজ করতে পারলেন না– এটি আল্লাহপাকের একটি ইশারা, অল্প কদিন পরই যেটি বাস্তবতার মুখ দেখতে যাচ্ছে এবং আজ রাজপরিবারের যেসব সদস্য এই আরবি বদ্দুকে নিয়ে ঠাট্টা করল, এই বিপ্লবও তারা প্রত্যক্ষ করবে যে, এই আরবি বদ্দু মিসরের রাজা-বাদশাহদের সিংহাসন উল্টে দিয়েছেন, মিসরবিজেতা অভিধায় ভূষিত হয়েছেন এবং তাঁরই কথামতো তাদের চলতে হচ্ছে।

বলখেলার এই প্রথা পালিত হয়ে গেছে এবং বল তাদের বিশ্বাস অনুসারে সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু দর্শনার্থীদের ভিড়, বিশেষ করে রাজপরিবারের সদস্যবর্গ ও শাসকমণ্ডলি এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী নয়।

কিন্তু এ-প্রথার অর্থ এই ছিল না যে, বলটা যার বাহুতে পতিত হবে, তাকে এখনই রাজা বানানো হবে। বরং তার অর্থ ছিল, এই লোকটি ভবিষ্যতে কোনো একদিন রাজা হবেন। কিন্তু দর্শকরা আজকের ফলাফল মেনে নিতে সম্মত নয়।

শাম্মাস আমর ইবনে আস-এর বাহু ধরে ওখান থেকে বেরিয়ে এল এবং তাকে বাড়িতে নিয়ে এল। তাকে আরও দু-তিনদিন ইস্কান্দারিয়া শহরটা ঘুরিয়ে দেখাল এবং অবশেষে বিদায়ের সময় দুই হাজার দিনারের একটা থলে তার সামনে পেশ করল। আমর ইবনে আস ইতস্তত করে শেষমেষ থলেটা গ্রহণ করে নিলেন।

আমর ইবনে আস ও তাঁর সঙ্গী রওনা হয়ে গেলেন। শাম্মাস একব্যক্তিকে তাদের সঙ্গে দিয়ে বলে দিলেন, এদের বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিয়ে দিয়ে আসো।

ইবনে আব্দুল হাকাম লিখেছেন, আমর ইবনে আস মিসর থেকে ফিরে এসেছেন বটে; কিন্তু মিসর ও ইস্কান্দারিয়া তাঁর মস্তিষ্কে এমনভাবে ঝেঁকে থাকল যে, তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার মন চাচ্ছে, আমি মিসর গিয়ে বাস করি।

আমর ইবনে আস (রা.) কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল তাঁর উপর কীভাবে আস্থা স্থাপন করেছেন, সেই বিবরণ আপনারা পড়েছেন। এবার আসুন, কিছু সময়ের জন্য আমি আপনাদের নিয়ে আলোচ্য উপাখ্যানের সেই যুগটিতে প্রবেশ করি, যেখানে হযরত আবু উবায়দা, খালিদ ইবনে অলীদ, শুরাহবীল ইবনে হাসানা ও আমর ইবনে আস (রা.) শাম থেকে রোমানদের পা উপড়ে দিয়েছিলেন এবং রোমানরা পিছুহটার নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। তাতে আমরা আমর ইবনে আস (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব ও সামরিক দক্ষতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

রোমানদের বিখ্যাত এক সেনানায়ক ছিলেন হেরাক্ল। তাঁর এক অতিশয় চতুর, ধূর্ত ও ধোঁকাবাজ সেনাপতি ছিল আতরাবুন। আতরাবুনের সামরিক দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার কোনো জুড়ি ছিল না। সে হেরাক্লের সমপর্যায়ের ও সমমর্যাদার লোক ছিল। কিন্তু ইতিহাস বিস্ময় প্রকাশ করছে, মুসলমান সেনানায়করা আতরাবুনকে কীভাবে ধরাশায়ী ও পরাজিত করেছিল!

রাসূলে আকরাম (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রা.)ও আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন। মুসলিম জাহানের খলীফা এখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)।

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আমর ইবনে আস (রা.)-এর দক্ষতা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর গুণাবলি সম্পর্কেও ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি বলতেন, খালিদ ইবনে অলীদ জীবনের ঝুঁকি বরণ করে নিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং বীরত্ব দেখিয়ে মানুষকে তাক লাগিয়ে দেয়। কিন্তু আমর ইবনে আস বুঝে-শুনে পা ফেলে এবং আগুনের মাঝেও ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সমর বিশ্লেষকরা লিখেছেন, আমর ইবনে আস দুশমনকে ধোঁকা দেওয়ার পলিসি নিয়ে কাজ করতেন। বীরত্ব তাঁর মাঝে খোদাই করে সাজানো ছিল। হাতাহাতি যুদ্ধে দুশমন তার সামনে দাঁড়াতেই পারত না। নিজেকে তিনি রণাঙ্গনের একটি উজ্জ্বল তারকা বানিয়ে নিয়েছিলেন।

রোমান সৈন্যরা শাম থেকে পিছপা হয়ে গেল এবং ফিলিস্তিনের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। এটা রোমানদের একটা চাল ছিল। সংখ্যায় মুসলমানদের স্বল্পতা দেখে তারা কৌশল অবলম্বন করেছিল, মুসলমানরা কোনো একটা জায়গায় আক্রমণ চালাবে আর তাদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে এসে মুসলমানদের এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকে ঘিরে ফেলবে।

বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করা আমর ইবনে আস (রা.)-এর দায়িত্বে অর্পিত। তাঁর মোকাবেলায় আছে রোমানদের ধূর্ত সেনানায়ক আতরাবুন। সে-সময় আতরাবুন তার বাহিনীকে আজনাদাইন নামক স্থানে নিয়ে যাচ্ছিল। আমর ইবনে আস (রা.) খলীফা ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর কাছে বার্তা পাঠালেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সহযোগী বাহিনী প্রেরণ করুন। কারণ, আমাদের আতরাবুন-এর সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে।

হযরত ওমর (রা.) বার্তা পাওয়ামাত্র বেশ কিছু সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইতিহাসে এসেছে, সে-সময় হযরত ওমর (রা.) চমৎকার একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আরবের আতরাবুনকে রোমের আতরাবুনের সঙ্গে সঙ্ঘাতে জড়িয়ে দিয়েছি। এবার দেখব, কে হারে আর কে জিতে।'

রোমান সেনানায়ক আতরাবুন-এর সামরিক দক্ষতার কথা হযরত ওমর (রা.)-এর জানা ছিল। তিনি জানতেন, আতরাবুন শেয়ালের মতো ধূর্ত ও চালাক। এই যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করায় সে পারঙ্গম। পাশাপাশি এমনই কিছু গুণের অধিকারী মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনে আস (রা.)।

আমীরুল মুমিনীন-এর প্রেরিত সহযোগী বাহিনী ফিলিস্তিনে আমর ইবনে আস (রা.)-এর কাছে পৌঁছে গেল। আমর ইবনে আস পুরো বাহিনীকে নিজের কাছে রাখলেন না। তিনি জানতেন, তাঁর বাহিনী তিন-চার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ফলে হিসাব করে দেখলেন সহযোগী বাহিনী কার বেশি প্রয়োজন। তিনি এই বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য দুটি স্থানে পাঠিয়ে দিলেন এবং কিছু নিজের কাছে রাখলেন। কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন, আতরাবুন তার সৈন্যদের দুর্গে আটকে রেখেছে এবং দুর্গের চারদিকে পরিখা খনন করে রেখেছে। আমর ইবনে আস (রা.) হিসাব করে দেখলেন, দুর্গ অবরোধ করলে অবরোধ অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে এবং দুর্গ জয় করা অসম্ভব না হলেও নিঃসন্দেহে অনেক কঠিন হবে। কাজেই আমাদের

অবলম্বন করার মতো একটা-ই পন্থা আছে। আর তা হলো, আতরাবুনকে প্রতারণার জালে আটকাতে হবে।

আমর ইবনে আস (রা.) আতরাবুন-এর কাছে দুজন দূত পাঠালেন। তাদের বলে দিলেন, তোমরা গিয়ে আতরাবুনকে সন্ধির প্রস্তাব দেবে এবং এ-বিষয়ে কথা বলবে।

আমর ইবনে আস (রা.) নিশ্চিত করেই জানতেন, আতরাবুন তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মত হবে না। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার সুবাদে দূতরা গোয়েন্দাগিরি করে আসবে। তারা তথ্য সংগ্রহ করবে দুর্গটাকে কীভাবে জয় করা যায় এবং রোমানদের সৈন্যসংখ্যা কত ইত্যাদি।

দূতরা গেল এবং কথাবার্তা বলে ফিরে এল। আমর ইবনে আস তাদের সঙ্গে কথা বললেন এবং নানা তথ্য জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, দূতরা তেমন কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি– তারা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে এবং আতরাবুনের ভয়ে ভীত হয়ে ফিরে এসেছে। বিশেষ কোনো গোয়েন্দাগিরি-ই তারা করতে সক্ষম হয়নি।

এবার আমর ইবনে আস তাঁর কমান্ডারদের বললেন, আমি নিজে দূত সেজে আতরাবুন-এর কাছে যাব। তাদের বুঝতেই দেব না, আমি এই মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার এবং আমার নাম আমর ইবনে আস।

এ-বিষয়ে তিনি কমান্ডারদের মতামত নিলেন।

তিনি একথাও বললেন যে, আতরাবুন-এর মনে যদি সামান্যও সন্দেহ তৈরি হয়, তা হলে সে আমাকে হয় হত্যা করে ফেলবে কিংবা কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখবে।

বৈঠক সিদ্ধান্ত দিল, ঠিক আছে; আপনি যান। তিনি সবার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা ছদ্মবেশ ধারণ করলেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে রওনা হয়ে গেলেন। দুর্গের ফটকে গিয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, আমি একজন মুসলিম দূত। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আপনাদের সেনাপতি আতরাবুন-এর সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে।

বিষয়টি আতরাবুনকে জানানো হলো। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে সিদ্ধান্ত দিলেন, ঠিক আছে; আসতে দাও।

আমর ইবনে আস আতরাবুন-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং ভাব দেখালেন, তিনি একজন দূত এবং নিজবাহিনীতে তাঁর বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই। আতরাবুনও তাঁকে ততটুকু মর্যাদা-ই দিলেন, যতটুকু একজন দূতের প্রাপ্য।

সন্ধির আলোচনা শুরু হলো। আমর ইবনে আস শুনেছেন, আতরাবুন খুব চালাক মানুষ। কিন্তু কী পরিমাণ চালাক এবং তার চোখের দৃষ্টি কত তীক্ষ্ম, তা তিনি জানতেন না।

কিন্তু আমর ইবনে আস আসলে তো একজন সেনা-অধিনায়ক। গোত্রে-সমাজেও একজন সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। মানুষ জ্ঞাতসারে অনেক কিছু করতে পারে– নিজের আসল পরিচয় গোপন করে ছদ্মপরিচয়টা ফুটিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু কোন ফাঁকে যে নিজের আসল পরিচয়টা প্রকাশ পেয়ে যায়, অনেক সময় মানুষ তা টেরও পায় না। কথা বলতে-বলতে বোধহয় আমর ইবনে আস (রা.)-এর মুখ থেকে এমন কোনো কথা বের হয়ে থাকবে কিংবা তিনি ভাবভঙ্গিতে এমন কিছু প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে থাকবেন যে, তার ফলে আতরাবুন চকিত হয়ে উঠল।

'আমার চোখ কখনও আমাকে ধোঁকা দেয়নি'– আতরাবুন মিটিমিটি হেসে বলল– 'আমার ধারণা, আমি কোনো দূতের সঙ্গে নয়; বরং আরবের সিপাহসালারের সঙ্গে কথা বলছি। আপনি কি আমর ইবনে আস নন?'

'না'– আমর ইবনে আস উত্তর দিলেন– 'আমি যদি আমর ইবনে আস হতাম, তা হলে আপনার সামনে নিজের পরিচয় গোপন রাখার কোনোই আবশ্যকতা ছিল না। আমাদের সিপাহসালার আমর ইবনে আস এতই নির্ভীক ও দুঃসাহসী যে, তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা বলেননি।'

ইতিহাস লিখেছে, আমর ইবনে আস (রা.)-এর এই উত্তরে আতরাবুন এমনভাবে হেসে উঠেছিল, যেন উত্তরটা সে মেনে নিয়েছে এবং তাঁকে দূতই মনে করছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দিদের থেকে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল, আতরাবুন আমর ইবনে আসকে সঠিকই চিনেছিল। কিন্তু আমর ইবনে আস (রা.)-এর উত্তর শোনার পর ভাব দেখাল, না; আমি ভুল বুঝেছি; তুমি দূতই। এভাবে সে আমর ইবনে আসকে ধোঁকা দিয়েছিলেন।

আমর ইবনে আস তার উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ভাবতে লাগলেন, এখান থেকে কীভাবে পালানো যায়। তাঁর মনে সন্দেহটা এভাবে দানা বেঁধেছিল যে, আলোচনা চলাকালে কোনো এক অজুহাতে আতরাবুন কক্ষের বাইরে গিয়েছিল এবং দ্রুত ফিরে এসে পুনরায় আলোচনা শুরু করেছিল। তার এই আচরণে আমর ইবনে আস (রা.)-এর পুরোপুরি সন্দেহ জন্মে গিয়েছিল, আমার আর রক্ষা নেই। পরে রহস্যটা উন্মোচিত হয়েছিল যে, আতরাবুন ক্ষণিকের জন্য বাইরে গিয়ে এক রক্ষীকে বলে এসেছিল, তুমি অমুক জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করো। যে-আরব লোকটা আমার সঙ্গে কথা বলছে, বের হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় ওখানে তুমি তার উপর এমন এক আঘাত হানবে, যেন তার মাথাটা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

রক্ষী সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

আমর ইবনে আস একটা বুদ্ধি ঠিক করে নিলেন। তিনি আলোচনার রংটা-ই পালটে ফেললেন এবং বোঝাতে শুরু করলেন, তিনি রোমানদের শক্তিতে ভীত হয়ে পড়েছেন এবং তাদের যেকোনো শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধিচুক্তিতে সম্মত হতে রাজী আছেন। তাঁর এই ভাব আতরাবুন-এর উপর খুব প্রভাব ফেলেছিল।

'এবার আমি আপনাকে আমার আসল পরিচয়টা বলে দিচ্ছি'— আমর ইবনে আস বললেন— 'আমি সেনাপতি আমর ইবনে আস-এর দূত নই। আমাকে আমাদের আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আপনার সঙ্গে সন্ধির বিষয়ে আলোচনা করতে পাঠিয়েছেন। আমার আরও নয়জন সঙ্গী আছেন। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে, যেন যুক্তিসঙ্গত যেকোনো শর্ত মেনে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করে নিই। আমরা মদীনা থেকে সোজা আপনার কাছে চলে এসেছি। এই আলোচনার সঙ্গে আমর ইবনে আস-এর কোনোই সম্পর্ক নেই। আমি আপনার শর্তাবলি শুনেছি। অপর নয় সঙ্গী দুর্গ থেকে সামান্য দূরে একস্থানে বসে আমার অপেক্ষা করছে। আপনি চাইলে আমি তাদের নিয়ে আসব কিংবা যদি বলেন, আমি গিয়ে তাদের অবহিত করি যে, আপনার সঙ্গে আমার এই-এই আলোচনা হয়েছে। তারপর নিজেরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসে আপনাকে জানাব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার সঙ্গীরা আপনার শর্তগুলো মেনে নেবে।'

'এ তো আরও ভালো'— আতরাবুন বলল— 'উত্তম হবে, তুমি তাদের এখানেই নিয়ে আসো।'

তারপর আরতাবুন আবার কী একটা বাহানা দেখিয়ে বাইরে গেল এবং এক রক্ষীকে আদেশ করল, অমুক রক্ষী অমুক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে; গিয়ে তাকে বলো, তোমাকে যে-কাজটা করতে বলা হয়েছিল, সেটা করতে হবে না; তুমি ফিরে এসো।

আমর ইবনে আস ওখান থেকে উঠলেন এবং নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। ফেরার সময় একটা মুহূর্তেরও জন্য পেছনপানে মোড় ঘুরিয়ে তাকালেন না।

আতরাবুন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকল।

'এই আরব সেনাপতিটা আমাকে ধোঁকা দিয়ে জীবিত বেরিয়ে গেছে'— আতরাবুন বলল— 'তার থেকে বড় ধূর্ত মানুষ আমি জীবনে আর দেখিনি।'

তারপর রণাঙ্গনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। উভয় পক্ষের বিপুলসংখ্যক সৈনিক প্রাণ হারাল। আতরাবুন অল্পকিছু সৈন্য নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস চলে গেল এবং ওখানে তাদের দুর্গে আটকে রাখল।

আমর ইবনে আস বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করে ফেললেন।

একদিন আমর ইবনে আস সংবাদ পেলেন, কী একটা বার্তা নিয়ে আতরাবুন-এর এক দূত এসেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দূতকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন এবং পত্রটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

পত্রে আতরাবুন লিখেছে : 'আপনি আমার বন্ধু। আপনার জাতি আপনাকে সেই মর্যাদা দিয়েছে, যেমনটি আমার জাতি আমাকে দিয়ে রেখেছে। আমি আপনাকে কোনো প্রতারণার ফাঁদে আটকে রাখতে চাই না। আপনি আজনাদাইনকে আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাতে এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হওয়ার কোনোই কারণ নেই যে, আপনি ফিলিস্তিনেরও কোনো একটি অংশ জয় করতে পারবেন। ফিলিস্তিনে আর কোনো সফল আক্রমণ আপনি চালাতে সক্ষম হবেন না। তাই আপনার জন্য কল্যাণকর হবে, আপনি এখান থেকে ফিরে যান এবং নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। কিন্তু যদি আপনি আমার পরামর্শ না মানেন, তা হলে আপনার পরিণতিও তাদের মতো হবে, যারা ইতিপূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করতে এসেছিল এবং জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারেনি।'

আমর ইবনে আস আতরাবুন-এর দূতের হাতেই এই পত্রের উত্তর পাঠিয়ে দিলেন।

উত্তরে তিনি লিখেছেন : 'আমি ফিলিস্তিনের বিজেতা। তোমাকে আমি বন্ধুসুলভ পরামর্শ দিচ্ছি, উপদেষ্টাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তুমি তোমার চিন্তাধারা পালটে নাও। হতে পারে, তোমাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তারা অন্য কোনো বিচক্ষণতামূলক পরামর্শ দেবে।'

আজনাদাইন ও বাইতুল মুকাদ্দাসজয় আলাদা এক উপাখ্যান। ঐতিহাসিক তাবারি লিখেছেন, আতরাবুন আমর ইবনে আস (রা.)-এর উত্তরপত্রটি পাঠ করার সময় 'আমি ফিলিস্তিনের বিজেতা' বাক্যটি পড়েই হো-হো করে হেসে উঠেছিল।

বাইতুল মুকাদ্দাস এখনও জয় হয়নি। আতরাবুন তার মোসাহেব ও উপদেষ্টাদের আমর ইবনে আস (রা.)-এর পত্রখানা পড়ে শোনালেন এবং বললেন, আমর ইবনে আস বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজেতা হতে পারবে না। কথাটা তিনি এমন এক ধারায় ও এমন এক ভঙ্গিতে বললেন যে, শ্রোতারা ধরে নিয়েছিল, তিনি বলতে চেয়েছেন, বাইতুল মুকাদ্দাস জয় অবশ্যই হবে; কিন্তু এই জয় আমর ইবনে আস-এর হাতে হবে না। শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি এমন কথা কেন বললেন?

'বাইতুল মুকাদ্দাস-বিজেতার নাম ওমর'– আতরাবুন চমকে দেওয়ার মতো কথা বলল– 'তাওরীতে লেখা আছে, বাইতুল মুকাদ্দাস-বিজেতার নামে তিনটি বর্ণ থাকবে। এই তিন বর্ণ 'ওমর' হতে পারে। তা ছাড়া তাওরীতে ওমরের গুণ-পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই এখানে সংশয়ের কোনোই অবকাশ নেই। তাওরীতে লেখা আছে, বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের কব্জায় চলে যাবে।'

তাবারি লিখেছেন, আতরাবুন এই কথাটা পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল এবং তার এই বক্তব্যে সভায় নীরবতা ছেয়ে গিয়েছিল। কোনো-কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, আতরাবুন যুদ্ধ না করেই বাহিনী নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

* * *

মিসর-জয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই একটি প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায় যে, সে-সময় মিসরে কার শাসন ছিল? ইতিহাস যখন উত্তর দেয়, সে-সময় মিসর রোমানদের দখলে ছিল এবং তার শাসনকর্তা ছিলেন সম্রাট হেরাক্ল। তখন আবার প্রশ্ন জাগে, হেরাক্ল তো শাম রাজ্যে ছিলেন এবং এই পুরো ভূখণ্ডটি তার শাসনাধীন ছিল। তা হলে এই লোকটি মিসর এলেন কী করে?

হেরাক্ল শাম থেকে মিসরে আপন মর্জিতে আসেননি। মুসলমানরা তাকে শাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেযুগে সমগ্র পৃথিবীতে দুটিমাত্র সামরিক শক্তি ছিল। একটি অগ্নিপূজারি ইরানি, অপরটি রোমান। রোমানরা বহুকাল আগেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। এই দুটি শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে পরস্পর সঙ্ঘাতে লিপ্ত থাকত। ইরানিরা কখনও শাম ও মিসরে ঢুকে পড়ত, আবার কখনও রোমানরা তাদের পরাজিত করে তাদের থেকে এই অঞ্চলগুলো ছিনিয়ে নিত।

এই দুটি শক্তির কখনও কল্পনায়ও জাগেনি যে, দিগন্ত থেকে তৃতীয় আরেকটি শক্তির উত্থান ঘটবে, যে কিনা তাদের উভয় শক্তিকেই ভেঙে-চুরে খান-খান করে দেবে। বিশেষ করে আরবদের থেকে তো তারা এমন কোনো আশঙ্কা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি। তারা আরবদের অজ্ঞ ও পশ্চাদপদ বদ্দু মনে করত। কিন্তু এই আরবেরই এক অন্ধকার গুহা থেকে আল্লাহর নূর বিচ্ছুরিত হলো, যার কিরণমালা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ল এবং মানুষের মন-মস্তিষ্ককে আলোকিত করে চলল।

এই গুহাটির নাম 'গারে হেরা' বা 'হেরা গুহা'। এখানেই আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর উপর প্রথমবারের মতো অহী নাযিল হয়েছিল এবং এখানেই আল্লাহপাক তাঁকে নবুওত দান করেছিলেন।

এখান থেকেই তৃতীয় সামরিক শক্তিটির উত্থান শুরু হলো। কিন্তু হলো একটি পার্থক্যের সঙ্গে। এই তৃতীয় শক্তিটির শুধু যুদ্ধাস্ত্রের উপর নির্ভরতা ছিল না। বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহর শক্তি শামিল ছিল।

ইরানি ও রোমানদের হাতে বিপুলসংখ্যক ঘোড়া ও তির-ধনুক ছিল। এসবের জন্য তাদের বেজায় দম্ভ ছিল। কিন্তু যখন তাদের বিশাল-বিশাল বাহিনী মুসলমানদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাহিনীর মোকাবেলায় এল, তখন তাদের পক্ষে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকাও

অসম্ভব হয়ে গেল। এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও একটি বিশ্বাসের কারিশমা ছিল, যাকে আজ 'আল্লাহর দীন' বলা হয়।

ইতিহাস আজও বিস্মিয়ে হতবাক্, যে-রোমানরা ইরানের মতো পরাশক্তিকে একের-পর-এর পরাজিত করে আসছিল, তারা এই মুষ্টিমেয় মুসলমানের হাতে কীভাবে তছনছ হয়ে গেল! তাও এমনভাবে যে, মুসলমানরা তাদের শাম থেকে বেদখল করে ছাড়ল এবং তাদের সৈন্যরা মিসর এসে নিঃশ্বাস ফেলল!

ইতিহাস একদিকে এই প্রশ্ন তুলে বিস্ময় প্রকাশ করছে, অপরদিকে তার উত্তরও লিখে রেখেছে। মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকরা এক-একটি মুহূর্তের উপাখ্যান লিখে ইতিহাসের হাতে অর্পণ করে দিয়েছিলেন। সেই ইতিহাস আজও জগদ্বাসীর সামনে বিদ্যমান আছে। ঐতিহাসিকরা মুসলমানদের সামরিক যোগ্যতা, চেতনা ও বিচক্ষণতাকে অলৌকিক ব্যাপার বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা মুসলমান সেনাপতিদের রণকৌশল, নেতৃত্ব ও সেনাদের মাঝে শৃঙ্খলা অটুট রাখার জন্য তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এমন একটি বিষয় আছে, যাকে ঐতিহাসিকরা হয় স্বেচ্ছায় এড়িয়ে গেছেন নতুবা বিষয়টি তারা জানতেন না। এখানে আমি তার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব।

মুসলমানরা যখন হযরত আবু উবাইদা, খালিদ ইবনে অলীদ ও আমর ইবনে আস (রা.)-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘাতে লিপ্ত, সে-সময়কার ঘটনা। যুদ্ধের প্রতিটি অঙ্গন থেকে রোমানদের পা উপড়ে যাচ্ছিল। সে-সময় উক্ত অঞ্চলে দুর্গঘেরা বিখ্যাত একটি শহর ছিল। শহরটির নাম কানসারিন। তার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা খুবই মজবুত ছিল। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) এই শহরটি কীভাবে দখল করেছিলেন, সেটি একটি আলাদা উপাখ্যান। এখানে আমরা তার একটি ঘটনা উল্লেখ করব, যার দ্বারা ইসলামের মৌলিক শিক্ষামালা ও মাহাত্ম্য ফুটে উঠবে।

জাবালা ইবনুল ইয়াহাম গাস্সানি নামক এক ব্যক্তি উক্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন। এটি ছিল তার নিজের গোত্র, যেটি বনু গাস্সান নামে বিখ্যাত ছিল। লোকটি রোমানদের মিত্র ছিলেন। রোমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করা ছাড়াও তিনি তাদের সব ধরনের সহযোগিতা দিতেন। লোকটি বিপুল সম্পদ ও ধনভাণ্ডারের অধিকারী ছিলেন। ছিলেন সুযোগসন্ধানী ও বসন্তের কোকিল। অবশ্য মুসলমানদের তিনি সেভাবে শত্রু মনে করতেন না, যেমনটি মনে করত রোমানরা।

জাবালা অত্যন্ত সুরুচির অধিকারী শৌখিন মানুষ ছিলেন। আরবের কবিদের সঙ্গে তার হার্দিক সম্পর্ক ছিল। রাসূলে আকরাম (সা.)-এর কবি হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত (রা.)কে খুব ভালবাসতেন। তাঁর কবিতা শুনে তিনি আবেগে আপ্লুত হতে

পড়তেন। কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি রোমানদের মিত্র ছিলেন। কারণ, তার রাজ্যটি তাদের আওতাভুক্ত ছিল।

হেরাক্‌ল যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন, তখন জাবালা ইবনুল ইয়াহাম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার মাঝেই নিজের কল্যাণ ও নিরাপত্তা অনুভব করলেন। উক্ত অঞ্চলে মুজাহিদদের যে-বাহিনীটি লড়াই করছিল, তার সিপাহসালার ছিলেন হযরত আবু উবাইদা (রা.)। জাবালা তাঁর কাছে দূতমারফত বার্তা পাঠালেন, আমি আমার গোত্র গাস্‌সানের সব কজন সদস্য নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে চাই।

হযরত আবু উবাইদা (রা.)-এর দৃষ্টিতে এটি বিরাট এক বিজয় ছিল। তিনি দু-তিনজন লোক জাবালার কাছে প্রেরণ করলেন। এরা সেখানে গেলেন এবং জাবালা তার গোত্রসহ মুসলমান হয়ে গেলেন। আবু উবাইদা (রা.) এই সংবাদ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করলেন। ইতিহাস লিখেছে, হযরত ওমর এই সংবাদ শুনে এত খুশি হয়েছিলেন যে, তাঁর চোখে অশ্রু এসে পড়েছিল।

আরবের স্মরণ জাবালাকে ধিকিধিকি পীড়া দিচ্ছিল। তিনি তাঁর প্রিয় কবিদের দেশটিকে একনজর দেখতে চাচ্ছিলেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে এই আবেদন নিয়ে দূত পাঠালেন যে, আমি আপনার খেদমতে হাজির হতে চাই। সাথে তিনি হজ করার আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করলেন।

হযরত ওমর (রা.) তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। জাবালা ইবনুল ইয়াহাম কোন ধারার মানুষ, তা তিনি জানতেন। তাই ধরে নিলেন, হজ করে লোকটি পাক্কা মুসলমান হয়ে যাবে।

* * *

একদিন আমীরুল মুমিনীনকে সংবাদ জানানো হলো, জাবালা ইবনুল ইয়াহাম গাস্‌সানি আসছেন। এটি মদীনার ঘটনা। মদীনার সমগ্র নগরীজুড়ে হইচই পড়ে গেল। জাবালা দু-একজন লোককে সঙ্গে করে আসছেন না। তার সঙ্গে আছে পাঁচশো লোক, যাদের অধিকাংশই রাজপরিবারের সদস্য। অবশিষ্টরা গাস্‌সান গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বিপুলসংখ্যক মহিলাও আছে কাফেলায়।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) মুসলমানদের মাঝে ঘোষণা করে দিলেন, তোমরা নগরীর বাইরে গিয়ে জাবালা ও তার সঙ্গীদের স্বাগত জানাও এবং তাকে সম্মানের সঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসো।

জনতা আগে থেকেই রাস্তায় নেমে এসেছিল। মহিলারা দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে কাফেলার অপেক্ষায় অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। জাবালা তার দুশো আরোহীকে বিশেষ ধরনের মূল্যবান পোশাক পরিধান করতে আদেশ করলেন। এ-কাজের জন্য কাফেলা মদীনা থেকে সামান্য দূরে একস্থানে দাঁড়িয়ে গেল।

তারা সবাই যখন বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করল, তখন দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। লোকগুলো অনেক মূল্যবান রেশমি পোশাক পরিধান করেছে। প্রতিজন আরোহীকে আপন-আপন জায়গায় রাজা-রাজপুত্র বলে মনে হচ্ছিল। তাদের ঘোড়াগুলোর গলায় সোনা-রুপার হার আর গায়ে রং-বেরঙের রেশমি চাদর বিছানো।

জাবালা নিজে মাথায় মুকুট পরিধান করেছেন। তাঁর গায়ের পোশাকটি কত মূল্যবান, তা বলে বোঝানো কঠিন। ছিলেন তো রাজা– যদিও তার রাজ্য ছিল ক্ষুদ্র একটা অঞ্চল।

কাফেলা যখন শহরে প্রবেশ করল, তখন নগরীর বাসিন্দাদের মাঝে নীরবতা ছেয়ে গেল। সবাই বিস্ময়ে থ বনে গেল। অনেকে দাঁতে আঙুল চেপে ধরল। এমন মূল্যবান পোশাক তারা কোনোদিন দেখেনি। মদীনার মুসলিম জনতার বিস্ময়ের আরও একটি কারণ হলো, লোকটি মুসলমান হয়েছেন বটে; কিন্তু রাজকীয় ভাবটা ছাড়েননি!

হযরত ওমর (রা.) জাবালাকে স্বাগত জানাতে বের হলেন না। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য জাবালা কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমীরুল মুমিনীন এবার উঠে দাঁড়িয়ে তাকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন এবং সম্মানের সঙ্গে নিজের পাশে বসালেন। আমীরুল মুমিনীন জাবালাকে ধন্যবাদ জানালেন, তুমি আল্লাহর সত্য দীন কবুল করেছ। বললেন, এখন আর কোনো শক্তি তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না।

পাঁচশো সঙ্গীর জন্য জাবালা সাথে করে অত্যন্ত সুন্দর ও অতিশয় মূল্যবান তাঁবু নিয়ে এসেছিলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) নগরী থেকে খানিক দূরে তাঁকে মনোরম একটা জায়গা দিয়ে দিলেন। তারা সুবিন্যস্তরূপে সেখানে তাঁবু স্থাপন করল। এলাকাটা স্বতন্ত্র একটা পল্লীর রূপ ধারণ করল।

হজের সময় ঘনিয়ে এল। একদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) জাবালাকে সঙ্গে নিয়ে হজের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওনা হলেন। জাবালা সঙ্গীদের থেকে মাত্র একজনকে সাথে নিয়ে অন্যদের মদীনায় রেখে হজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

জাবালা হজের জন্য যে-ইহরাম বেঁধেছিলেন, সেটি তার পায়ের গোড়ালির নিচে নেমে গিয়েছিল। বাইতুল্লার তাওয়াফের সময় পেছন-থেকে-আসা একব্যক্তির পা তার ইহরামের উপর গিয়ে পড়ল এবং ইহরাম খুলে গেল। রাজা বলে কথা! বিষয়টা জাবালার আত্মমর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত হানল। লোকটির এই আচরণে তিনি অপমানিত বোধ করলেন এবং পেছনে মোড় ঘুরিয়ে লোকটির নাকের উপর কষে একটা ঘুষি মারলেন। লোকটির নাক ফেটে রক্ত বেরোতে শুরু করল।

হযরত ওমর (রা.) সে-সময় তার সঙ্গে ছিলেন না। তিনি পরে সংবাদ পেলেন জাবালা এহেন আচরণ করেছেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে ডাকালেন এবং উক্ত

লোকটিও এসে তাঁর কাছে নালিশ জানাল যে, জাবালা আমার নাকের উপর ঘুষি মেরেছে, যার ফলে আমার নাক ফেটে রক্ত বেরুতে শুরু করেছে এবং আমি তাওয়াফ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছি।

এই অভিযোগের পর হযরত ওমর (রা.)-এর পদমর্যাদা একদম বদলে গেল। তিনি আর জাবালার মেজবান রইলেন না। এখন তিনি আমীরুল মুমিনীন হয়ে গেলেন। সেইসঙ্গে একজন বিচারকের দায়িত্বও তাঁর কাঁধে এসে চাপল।

তিনি জাবালা ইবনুল ইয়াহামকে ডেকে পাঠালেন। জাবালা সঙ্গে-সঙ্গে এসে হাজির হলেন। সেই রাজকীয় ভাব। এসে হযরত ওমর (রা.)-এর পাশে বসতে লাগলেন।

খলীফা এই মর্যাদা উঁচুমাপের একজন মেহমানকে প্রদান করতেন যে, তাকে তাঁর পাশে বসতে দিতেন। জাবালাকেও তিনি সেই মর্যাদা-ই দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতির দাবি অন্য কিছু।

'এখানে নয়– তুমি ওই ওখানে গিয়ে বসো'– হযরত ওমর জাবালাকে নিজের পার্শ্ব থেকে সরিয়ে দিতে-দিতে বললেন– 'এখন তুমি আমার মেহমান নও– তুমি এখন একজন আসামী।'

জাবালা ক্ষুণ্ন মনে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর দেখিয়ে-দেওয়া-জায়গাটাতে গিয়ে বসলেন। তার চেহারায় ক্ষোভের ছাপ এবং কিছুটা বিস্ময়ও।

'জাবালা ইবনুল ইয়াহাম!'– হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কি এই লোকটির নাকে ঘুষি মেরেছ?'

'হ্যাঁ মেরেছি তো'– জাবালা নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিলেন– 'এর নাকে আমি কষে একটা ঘুষি মেরেছি। কারণ, এ আমার ইহরামের উপর পা রেখেছিল।'

'লোকটি বলছে, ভিড়ের কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে তার পা তোমার ইহরামের উপর পড়েছিল'– হযরত ওমর (রা.) বললেন– 'আর তাওয়াফের সময় এমনটা হওয়া-ই স্বাভাবিক। তা-ই যদি হয়, তা হলে বলো, এই অধিকার তোমাকে কে দিল যে, তুমি তাকে শাস্তি দিলে? তুমি তো জানবার চেষ্টা করলে না, এটি সে কেন করেছে। তাকে জিজ্ঞেস করলেই তো বিষয়টা জানতে পারতে।'

'এখানে তো আমি ওকে একটা ঘুষি মেরেছিমাত্র'– জাবালা বললেন– 'আমার ওখানে হলে এমন শাস্তি দিতাম যে, অন্যরাও এর থেকে শিক্ষা নিত।'

'ওটা তোমার রাজত্ব; ওখানে তোমার আইন চলে'– হযরত ওমর (রা.) বললেন– 'তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ। তার অর্থ হলো, তুমি ইসলামের সুবিচারমূলক আইনকেও মেনে নিয়েছ। ইসলামের বিধান অনুপাতে তোমাকে এর শাস্তি ভোগ করতেই হবে।'

'আমি আপনাকে আমীরুল মুমিনীন মেনে নিয়েছি'– জাবালা অনীহ কণ্ঠে বললেন– 'কিন্তু আমি ভেবে বিস্মিত হচ্ছি, আপনি কেমন আমীরুল মুমিনীন যে, ছোট-বড়র পার্থক্য বোঝেন না! আমি আমার অঞ্চলের রাজা আর এ একজন সাধারণ মানুষ। এটা কি আমার জন্য অপমান নয় যে, আপনি আমাকে এই সাধারণ লোকটার সঙ্গে বসিয়ে দিলেন এবং আমার সঙ্গে একজন আসামীর মতো আচরণ করছেন?'

'ইসলাম তোমাদের দুজনের মর্যাদা এক করে দিয়েছে'– হযরত ওমর (রা.) বললেন– 'ইসলামে মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া। যার তাকওয়া যত বেশি, সে তত মর্যাদাবান। ইসলামে সম্পদ-রাজত্ব মর্যাদার মাপকাঠি নয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে একই রকম করে সৃষ্টি করেছেন। তুমি দুটা অপরাধ করেছ। একটা হলো, তুমি আল্লাহর ঘরে অন্যায় আচরণ করেছ। আরেকটা হলো, তুমি এই লোকটির নাকে ঘুষি মেরে রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছ, যার ফলে সে তাওয়াফ সম্পন্ন করতে পারেনি।'

'আমি বোধহয় ভুল জায়গায় এসে পড়েছি'– জাবালা বলল– 'আমি তো মনে করতাম, মুসলমানরা বিত্তশালী মানুষ নয়; কাজেই ওখানে গিয়ে আমি বেশ মর্যাদা পাব। কিন্তু এসে তো এখন দেখছি তার উলটোটা।'

'যদি মর্যাদা চাও, তা হলে এর একটি-ই পন্থা আছে'– হযরত ওমর বললেন– 'এর কাছে তুমি ক্ষমা চাও। যদি এ তোমাকে ক্ষমা করে দেয়, তা হলে আমি তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।'

'তা হলে কি এর চেয়ে ভালো হয় না, আমি খ্রিস্টধর্মেই ফিরে যাব?'– জাবালা বললেন– 'ওখানে তো আমার সঙ্গে এমন আচরণ কখনও হবে না!'

'আমি তোমাকে ইসলামের এই বিধানটিও জানিয়ে রাখছি'– হযরত ওমর বললেন– 'তুমি যদি শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে ইসলাম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে ফিরে যাও, তা হলে আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রদান করব।'

'আর আপনিও মনে রাখুন আমীরুল মুমিনীন!'– জাবালা ঝাঁজমেশানো উদ্ধত কণ্ঠে বললেন– 'আমার সঙ্গে যদি আপনি এই আচরণ অব্যাহত রাখেন, তা হলে আপনি আমার ও আমার এত বড় গোত্রের বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন। আপনি বোধহয় জানেন না, আমার গোত্র এতটা-ই সম্পদশালী যে, আমরা হিরা-জহরতের মাঝে খেলা করে বেড়াই। তা ছাড়া আমার গোত্র একটি শক্তি। এত বড় ক্ষতি আপনি বরণ করে নেবেন কি-না ভেবে দেখতে পারেন।'

'আমরা শুধু ইসলামের ক্ষতি সহ্য করতে পারি না'– হযরত ওমর বললেন– 'আমরা নিজেদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও আপন জীবনকে ইসলামের জন্য কুরবান করে দেওয়ার মতো মানুষ। আমাদের যদি কারও বন্ধুত্বের প্রয়োজন থাকে, তিনি হলেন শুধু মহান আল্লাহ। এই বিষয়টিকে আমি আর দীর্ঘ করব না। তুমি এর থেকে

ক্ষমা চাও। যদি এ তোমাকে ক্ষমা করে, তা হলে তোমার জন্য কোনো শাস্তি নেই। অন্যথায় শাস্তি তোমাকে ভোগ করতেই হবে।'

জাবালা মাথাটা নত করে গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন।

'আমীরুল মুমিনীন!'– কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে জাবালা বললেন– 'আমাকে মাত্র একটা রাতের সময় দিন। সকালেই আপনাকে বলে দেব, আমি এই লোকটার কাছে ক্ষমা চাইব, নাকি আপনার শাস্তি বরণ করে নেব।'

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) তাকে চিন্তা করার সময় দিলেন এবং অনুমতি দিয়ে দিলেন, এখন তুমি তোমার অবস্থানে চলে যাও; আগামীকাল সকালে এসে আমাকে সিদ্ধান্ত জানাও।'

ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। জাবালা যখন বের হলেন, তখন বাইরে হাজীদের বিশাল একটা ভিড় দাঁড়িয়ে ছিল। লোকগুলো সুবিচারের দাবি জানাচ্ছিল। অবশেষে জনতাকে জানানো হলো, রায় আগামী কাল ঘোষণা করা হবে।

পরদিন ভোরবেলা। পুবাকাশে সূর্য উদিত হয়েছে। জাবালা এখনও আসেননি। তাকে ফজরের জামাতেও মসজিদে দেখা যায়নি। এখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমীরুল মুমিনীন আদেশ জারি করলেন, জাবালাকে ধরে নিয়ে আসো। কিছুলোক দৌড়ে গেল। দেখল, জাবালা ওখানে নেই। তাঁবুটা যথাবৎ দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু ভেতরে মানুষ নেই। জাবালা ও তাঁর সঙ্গীর ঘোড়া উধাও।

জাবালা পালিয়ে গেছে।

জাবালার কাফেলার পাঁচশো লোক মদীনায় অবস্থানরত ছিল। তাকে ধাওয়া করা এখন বৃথা। কারণ, এক রাতেরও বেশি সময় অতীত হয়ে গেছে। এতক্ষণে জাবালা নিশ্চয় অনেক দূরে চলে গেছে।

এখান থেকে পালিয়ে জাবালা তার সঙ্গীসহ মদীনা চলে গিয়েছিলেন। ওখান থেকে পুরো কাফেলাকে দ্রুত প্রস্তুত করে মদীনা থেকে পালিয়ে গেছেন। মদীনার লোকদের জানা ছিল না, জাবালা কেন চলে যাচ্ছে আর আমীরুল মুমিনীনইবা কেন মক্কায় রয়ে গেলেন।

সে-সময় রোমরাজা হেরাক্ল কুস্তুন্তনিয়া ছিলেন। জাবালা সেখানে চলে গেলেন এবং তার কাছে ক্ষমা চাইলেন যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম এবং ইতিমধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। ফলে আমি ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি।

শুনে হেরাক্ল খুব খুশি হলেন যে, এমন একটা শক্তিশালী গোত্র ফের তার মিত্র হয়ে গেছে।

হেরাক্ল জাবালাকে আরও কিছু জায়গির দিয়ে দিলেন।

এ ছিল ইসলামের সেই শক্তি, যে-শক্তিটি অগ্নিপূজক ইরানি ও রোমানদের পরাজিত করেছিল।

* * *

রোমরাজা হেরাক্ল-এর আপন শক্তিমত্তার উপর এতই দম্ভ ছিল যে, তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন, তার রাজত্বে কখনও পতন আসবে না এবং রোমসাম্রাজ্য উত্তরোত্তর বিস্তৃত হতেই থাকবে। কিন্তু মুসলমানরা তার জন্য এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে দিল যে, তিনি এখন পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে শুরু করলেন। পিছপা হয়ে-হয়ে তিনি যেখানেই গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন, মুসলমানরা সেখানেই পৌঁছে যাচ্ছে এবং সেই শহরটিকে অবরোধ করে ফেলছে।

অবশেষে তিনি আন্তাকিয়ার দুর্গঘেরা শহরটিতে গিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাকে সেখানে টিকতে দিলেন না। অবশেষে তিনি ক্ষুদ্র একটি শহর রুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

ঐতিহাসিক এলফার্ড বাটলার লিখেছেন, তার আশা ছিল, তিনি তার বিক্ষিপ্ত বাহিনীটিকে একত্রিত করে নেবেন এবং জমে মুসলমানদের মোকাবেলা করতে ও তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু তিনি যেদিকেই বার্তা পাঠালেন, কোনো দিক থেকেই কোনো উত্তর এল না। যদিবা এল, এল হতাশাব্যঞ্জক। ইসলামের সেনাপতিগণ রোমানদের বিক্ষিপ্ত বাহিনীটার অনুরূপ নিজেদের ফৌজকেও বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। ফলে আপন বাহিনীকে কোনো একস্থানে জড়ো করা রোমানদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

হেরাক্ল রুহায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। তার রাজপরিবারটি তার সঙ্গে ছিল। দুটি যুবতী কন্যা ছিল। বহুসংখ্যক স্ত্রী ছিল। ওরা স্ত্রী ছিল নামমাত্র। সবাই ছিল গণিকা-রক্ষিতা। এ ছাড়া সব ধরনের রাজকীয় উপকরণ সঙ্গে ছিল। এই অবস্থায়ও তিনি ফেরাউনের মতো রাজা ছিলেন।

হেরাক্ল দরবার বসালেন, যেমনটি অতীতে বসাতেন। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, সম্রাট হেরাক্ল গণক-জ্যোতিষীদের পূর্বাভাস অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং তাদের পরামর্শ অনুসারে পা বাড়াতেন। অন্তত একজন করে সুযোগ্য গণক-জ্যোতিষী সব সময় তার সঙ্গে থাকত। যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে তিনি গণক-জ্যোতিষীদের জিজ্ঞেস করে নিতেন, এই পদক্ষেপ আমার নেওয়া উচিত কি-না। যদি উচিত হয়, তা হলে তার জন্য কোন দিন ও কোন সময়টি যথোপযুক্ত হবে।

পক্ষান্তরে মুসলমানরা কাজ করতেন আল্লাহর উপর আস্থা ও ভরসা রেখে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত যুদ্ধ করতেন এবং জীবন কুরবান করতেন।

হেরাক্ল দরবার বসালেন এবং আদেশ করলেন, গণককে হাজির করা হোক। রাজগণক আদেশ পাওয়ামাত্র এসে হাজির হলো এবং আদবের সঙ্গে সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়াল। মনে-মনে খুশি হচ্ছিল, সম্রাট আমার কাছে জানতে চাইবেন, তোমার তারকা কী বলছে দেখো; আমি এখন কোন দিকে যাব, কী পদক্ষেপ নেব।

কিন্তু হেরাক্ল-এর চোখ খুলে গিয়েছিল।

'এবার বলো ওহে নক্ষত্রের ভেদী!'– হেরাক্ল রাজকীয় ভর্ৎসনার সুরে বললেন– 'তোমার নক্ষত্র কী বলছে? প্রতিবারই তুমি আমাকে বলেছিলে, এবার যদি আমি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তা হলে এমন হবে এবং মুসলমানরা অন্ধ হয়ে পালিয়ে যাবে। তুমি তোমার বিগত দিনের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর কথা স্মরণ করো এবং বলো, আমাকে এই তথ্য কেন দিলে না যে, আমার ভাগ্যে দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়ানো, লুকিয়ে-লুকিয়ে জীবন রক্ষা করা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এবং আমার কোনো আশ্রয় নেই? কালবিলম্ব না করে এক্ষুনি জবাব দাও।'

গণক জ্যোতিষশাস্ত্রের পরিভাষায় কথা বলল এবং হেরাক্লকে বোঝানোর চেষ্টা করল, এই ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দায়ী আমি নই। এর জন্য দায়ী সেই তারকা, যেটি মহাশূন্যের বিস্তৃত অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'তোমার একটা কথাও আমার বুঝে আসছে না'– হেরাক্ল বললেন– 'আমাকে কেন বললে না, আমার ভাগ্যে আমারই সাম্রাজ্যে দ্বারে-দ্বারে লুকিয়ে বেড়ানো এবং আশ্রয় খুঁজে ফেরা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে? এই বাস্তবতা আমার কাছে এখন উন্মোচিত হয়েছে যে, আমি যেভাবে দেউলিয়ার মতো ঘুরে ফিরছি, তেমনি এই তারকাটিও মহাশূন্যের বিস্তৃতির মাঝে গন্তব্যহীন ঘুরে ফিরছে। আরও একটা বাস্তবত হলো, আমাকে ধোঁকা দিয়ে-দিয়ে এবং আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত করে এত দিন তুমি শুধুই পকেট ভারী করেছ!'

সম্রাটকে কী বলে এবং কীভাবে বোঝাবে জ্যোতিষীর কিছুই মাথায় ধরছে না। তার চেহারার রং বদলে গেছে। সে মাথাটা নত করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বসে রইল। সম্রাট বসা থেকে উঠলেন এবং ধীরপায়ে এগিয়ে জ্যোতিষীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। পুরো দরবারে নীরবতা ছেয়ে আছে। কারও নিঃশ্বাস ফেলার শব্দটিও শোনা যাচ্ছে না। কারুরই বুঝতে বাকি রইল না, সম্রাট বিনা কারণে উঠে জ্যোতিষীর সামনে গিয়ে দাঁড়াননি।

হেরাক্ল হিরাখচিত হাতলের সুদৃশ্য একটা খঞ্জর সব সময় কোমরে ঝুলিয়ে রাখতেন। তার হাতটা তড়িতগতিতে সেই খঞ্জরের হাতলে পৌঁছে গেল। অস্ত্রটা খাপ থেকে বেরিয়ে এল। পরবর্তী মুহূর্তেই খঞ্জরটা জ্যোত্যিষীর বুকে বিদ্ধ হয়ে গেল। জ্যোতিষী ঝটপট উভয় হাত দ্বারা পেটটা চেপে ধরে দুপা পেছনে সরে গেল। তার দেহটা কাঁপতে লাগল। পরক্ষণেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

হেরাক্‌ল হাতের খঞ্জরটা একধারে ছুড়ে ফেললেন। একব্যক্তি খঞ্জরটা তুলে নিল। তার অর্থ এই ছিল যে, এটি পরিষ্কার করে আমাকে ফেরত দাও।

হেরাক্‌ল আসনে গিয়ে বসলেন। কিছুলোক ধেয়ে এল। তারা মৃত জ্যোতিষীর লাশটা তুলে নিয়ে গেল।

'শাহ মারদিনকে নিয়ে আসো'— হেরাক্‌ল আদেশ করলেন— আজ আমি এই দুজনেরই ভাগ্যের ফয়সালা করতে চাই। এরা আমাকে আমার ভাগ্যের মিথ্যা প্রতিচ্ছায়া দেখাত।'

বেশিক্ষণ দেরি হলো না। হেরাক্‌ল-এরই বয়সী এক ব্যক্তিকে দরবারে নিয়ে আসা হলো। পরিষদের সব কজন সদস্য তার প্রতি তাকিয়ে থাকল। সকলেরই দৃষ্টিতে লোকটার প্রতি মমতা ঝরে পড়ছিল। তারা বোধহয় ভাবছিল, যদি লোকটাকে অবহিত করা হয়, তোমার জীবনের আর কয়েকটা মুহূর্তমাত্র অবশিষ্ট আছে, তা হলে তার অবস্থাটা কেমন হবে! সম্রাট হেরাক্‌লই একমাত্র ব্যক্তি, যার চোখে ও অন্তরে এই মুহূর্তে কোনো মমতা নেই। এক দরবারি খঞ্জরটা পরিষ্কার করে তার হাতে তুলে দিল। হেরাক্‌ল খঞ্জরটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন।

শাহ মারদিন নামক এই লোকটা রাজজ্যোতিষী। হেরাক্‌ল প্রতিটি যুদ্ধ ও প্রতিটি অগ্রযাত্রার আগে তার থেকে আগাম ধারণা গ্রহণ করতেন।

'আমার ভাগ্য গণনাকারী!'— হেরাক্‌ল শাহ মারদিনকে জিজ্ঞেস করলেন— 'তুমি কি বলতে পার, তোমার ভাগ্যে কী লিপিবদ্ধ আছে?'

'তা-ই, যা আমি চেয়েছিলাম'— শাহ মারদিন উত্তর দিল— 'আজ যখন আমাকে মৃত্যুর অলিন্দে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো, তখন জীবনদানের পূর্বক্ষণে সত্য বলে যেতে চাই। শুনুন হে রোমের মহা শক্তিধর সম্রাট! আপনি যখনই আমাকে আপনার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী প্রস্তুত করতে বলেছেন, সব সময় আমি আপনার চাহিদা অনুযায়ী মতামত প্রদান করেছি। আপনাকে আমি আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত রেখেছি এবং এ-ধারণা-ই প্রদান করেছি যে, আপনি মানুষ নন— আপনি দেবতা এবং আপনার সম্মুখে দাঁড়াবার সাধ্য কারও নেই।'

'তার মানে এত কাল তুমি আমাকে অনবরত ধোঁকা দিয়েছ আর পুরস্কার গ্রহণ করেছ'— হেরাক্‌ল বললেন— 'আমার ভাগ্যগণনার বিনিময়ে আমি তোমাকে রাজকীয় মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলাম এবং তোমার পেছনে অকাতরে সম্পদ ব্যয় করে আসছিলাম। আর তুমি কিনা সেই মর্যাদা আর সম্পদের বিনিময়ে আমাকে ধোঁকা দিয়ে আসছ!'

'বিত্তের বিনিময়ে নয়'— শাহ মারদিন বলল— 'প্রতিশোধের খাতিরে। আমি আপনার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। আপনাকে আমি এমন একটা জায়গায় পৌঁছিয়ে

দিয়েছি, যেখান থেকে ফিরে আপনি শাম রাজ্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে যেতে সক্ষম হবেন না।'

'প্রতিশোধ!'– হেরাক্ল বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন– 'কীসের প্রতিশোধ? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি?'

'হ্যাঁ প্রতিশোধ!'– শাহ মারদিন পরম বীরত্বের সঙ্গে বললেন– 'আমি আপনার একটা পাপের প্রতিশোধ নিয়েছি। আপনি আজ থেকে সাতাশ-আটাশ বছর আগের একটা ঘটনা স্মরণ করুন।

'নাহ, সেই ঘটনাটা আপনার মনে পড়বে না। কারণ, রাজা-বাদশাদের অতীত মনে থাকে না। আপনি একদিন বনে শিকার খেলতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে মোহাফেয ও চাকর-বাকরদের একটা বহর ছিল। আমি আমার এক যুবতী বোনকে নিয়ে সেই বনের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। আমার বোনটা খুব সুন্দরী ছিল এবং আমি তাকে এত স্নেহ করতাম যে, আপন ধর্মের প্রতিও আমার অত আন্তরিকতা ছিল না।

'আপনার দুজন মোহাফেয আমার বোনটাকে দেখে ফেলল এবং তাকে ধরে ফেলল। আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা আমাকে পেটাতে শুরু করল এবং বলল, সম্রাট হেরাক্ল-এর জন্য একটা রূপসী মেয়ে দরকার। তিনি তিন-চারদিন এই বনে অবস্থান করবেন। ফলে তার জন্য এই মেয়েটাকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। তারা আমার হাত থেকে আমার বোনটাকে নিয়ে গেল। বোন আমার 'ভাইয়া! আমাকে বাঁচাও-বাঁচাও' বলে আর্তনাদ করছিল। কিন্তু আমার কিছুই করার ছিল না। আমি আপনার কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু আপনার লোকেরা আমাকে যেতে দিল না। আমি সেখানেই পড়ে রইলাম।

'পরে যখন আপনি তাঁবু থেকে শিকারে বের হলেন, তখন আমি দৌড়ে এসে আপনার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লাম এবং আমার বোনকে আপনার কাছে ভিক্ষা চাইলাম। কিন্তু আপনি আমাকে পা দ্বারা সজোরে লাথি মেরে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, একে তুলে দূরে কোথাও ফেলে দাও। আপনার লোকেরা আমাকে মেরে-পিটিয়ে একস্থানে ফেলে রাখল। কিন্তু তারপরও আমি সেখানে বসে রইলাম।

'আমি তিন থেকে চারটা দিন না খেয়ে অতিবাহিত করলাম। পরে আপনি যখন শিকার থেকে ফিরে এলেন, তখন আমি সেই জায়গায় গেলাম, যেখানে আপনার তাঁবু ছিল। ওখানে আমি আমার বোনের বিবসনা মৃতদেহটা পড়ে আছে দেখতে পেলাম। আমার বুঝতে বাকি রইল না, আপনি ও আপনার সঙ্গীরা আমার নিরপরাধ বোনটির সঙ্গে এই আচরণ করেছেন। আমি তখনই প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম, হেরাক্ল থেকে আমি এর প্রতিশোধ নেব।

'আমার পিতা জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মানুষ থেকে অর্থ নিয়ে তিনি ভাগ্য গণনা করতেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন। তিনি এই বিদ্যাটি আমাকেও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিদ্যার প্রতি আমার কোনো আন্তরিকতা ছিল না। এসব আমার ভালো লাগত না। অবশেষে পিতা তার কন্যার বিরহব্যথা মনে নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। আমি সব সময় ভাবতে থাকলাম, কী করে আমি আপনার থেকে প্রতিশোধ নেব।

'একটা পন্থা আমার মাথায় এসে পড়ল। পিতার যোগ্যতার কারণে মানুষ আমাকেও বেশ শ্রদ্ধা করত। আমি আমার পিতার গদিতে বসে পড়লাম এবং জ্যোতিষী ও গণকের কাজ শুরু করে দিলাম। আর এ-বিষয়টি আমি বেশ জোরো-শোরে প্রচার করে দিলাম। কিন্তু আমি মূলত পিতার বিদ্যাচর্চা করিনি। তার স্থলে আমি প্রতারণা ও ভেলকি শিখে নিলাম। চারদিকে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এর সাত-আট বছর পর আমি কীভাবে আপনার কাছে পৌঁছে গেলাম এবং আপনি কীভাবে আমাকে মহলে রেখে দিলেন, সেই কাহিনী না হয় না-ই বললাম। আমি আপনার থেকে প্রতিশোধ নিতে শুরু করলাম।'

হেরাক্ল খুব অত্যাচারী ও হিংস্র প্রকৃতির শাসক ছিলেন। দরবারিদের ধারণা ছিল, তিনি এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবেন এবং শাহ মারদিনেরও পেটে সেভাবে খঞ্জর বিদ্ধ করবেন, যেভাবে একটু আগে আরেক জ্যোতিষীকে বিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, হেরাক্ল সেদিন মূর্তি হয়ে গিয়েছিলেন এবং চোখদুটোকে বিস্ফারিত করে শাহ মারদিনের প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। তার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, আজ অবধি কেউ এভাবে তার মুখের উপর এবং চোখে চোখ রেখে সত্য কথা বলার সাহস দেখায়নি।

সে-সময় দরবারে বেশ কজন দাসি ও দু-তিনজন রাজকন্যা উপস্থিত ছিল। তারাও বিস্মিতচোখে ও প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে শাহ মারদিনের প্রতি তাকিয়ে রইল।

* * *

'শুনুন সম্রাট হেরাক্ল!'– শাহ মারদিন বলল– 'নিজেকে শক্তির দেবতা মনে করা ছেড়ে দিন। আর অন্তর থেকে এই ভাবনাটাও বের করে দিন যে, প্রজাদের বোন-কন্যারা আপনার মালিকানা এবং সবাই আপনার হুকুমের দাস। আপনি পাপের শাস্তি ভোগ করছেন। আপনার থেকে আমি আমার বোনের শ্লীলতাহানি ও হত্যার প্রতিশোধ এভাবে নিলাম যে, অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও জাদুকরি আগামবার্তা তৈরি করে-করে আমি আপনাকে দেখাতে থাকলাম এবং সব সময় আপনাকে ঘোরের মধ্যে ফেলে রাখলাম।

'আরও একটি কাজ আমি করেছি। সেটি হলো, এই একটু আগে যে-গণককে আপনি হত্যা করলেন, তাকে আমি আমার সঙ্গে ভিড়িয়ে নিয়েছিলাম। আপনার

থেকে যে-বিত্ত আমি প্রাপ্ত হতাম, তার অর্ধেক আমি তাকে দিয়ে দিতাম। বিনিময়ে আমার সঙ্গে তার প্রতিশ্রুতি ছিল, আপনাকে সে সময়ের আগে কোনো বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করবে না। বরং এমন-এমন ভবিষ্যদ্বাণী আপনার কানে ঢালতে থাকবে, যার উপর ভিত্তি করে আপনি বিপদের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যান এবং পতনের গর্তে গিয়ে পতিত হন। আজ আপনি নিজের সেই পরিণতি দেখে নিন।

'আমি জানি, আজকের দিনটা আমার জীবনের শেষ দিন। জীবনের এই শেষ মুহূর্তে অন্তত একটি সঠিক ও সত্য কথা আমি আপনার কানে দিয়ে যেতে চাই। হতে পারে, তার দ্বারা আপনার দিন ফিরে যাবে। কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। শুনুন মহারাজ! প্রত্যের মানুষের ভাগ্য তার নিজেরই হাতে থাকে। গণক-জ্যোতিষীরা মানুষের উপর নেশা চাপিয়ে দেয়। এই নেশা মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও দেহকে বেকার করে তোলে। সেই লোক সফল হয়, যে সৃষ্টিকর্তা ও আপন সত্তার উপর আস্থা ও ভরসা রাখে। গণকের গণনা ও জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর নির্ভর করে যারা পথ চলে, তাদের পরিণতি তা-ই হয়, যেখানে আপনি পৌঁছে গেছেন। আরবের গরিব বদ্দু ও রাখালরা একটি শক্তিতে পরিণত হয়ে আপনাকে একের-পর-এক পরাজয় দিয়ে চলছে আর আপনি আশ্রয় খুঁজে ফিরছেন।

'আপনি উঠুন এবং আমাকে নিজহাতে হত্যা করুন। তার আগে আমার একটি সত্য ভবিষ্যদ্বাণী শুনে নিন। আপনার জন্য আমি জীবনে এ-ই প্রথম এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রস্তুত করেছি, যেটি সর্বদিক থেকে সঠিক ও সত্য। জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি আপনার সঙ্গে একটি পুণ্য করে যেতে চাই। এখন আর কোনো দিন আপনি শাম যেতে পারবেন না। আপনার ঠিকানা মিশর, যেখানে আপনার স্বজাতির রাজত্ব চলছে। কিছুদিন পরই আরবের মুসলমানরা আপনার উপর বজ্রের মতো এসে পতিত হবে। এত রক্ত ঝরবে যে, নীলনদ লাল হয়ে যাবে। তারপর আপনার রোমান রাজত্বের বোচকা গোল হয়ে যাবে এবং রোম-উপসাগরে ডুবে যাবে। মিসর ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনসব স্পর্শকাতর ঘটনা জন্ম নেবে, যেগুলো ঐতিহাসিকরা কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসীকে শোনাতে থাকবে। আপনি চাইলে আমাকে এখনই হত্যা করে ফেলতে পারেন। ইচ্ছে হলে কারাগারেও ফেলে রাখতে পারেন। যদি আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হয়, তা হলে তখন আমাকে হত্যা করবেন। আর যদি সত্য ও সঠিক প্রমাণিত হয়, তা হলে মুসলমানরা এসে আমাকে মুক্ত করবে।'

শাহ মারদিন থামলেন। সমগ্র দরবারের উপর নীরবতা ছেয়ে গেল। সম্রাট হেরাক্লও চুপচাপ বসে রইলেন। মনে হচ্ছিল, এখানে যতগুলো মানুষ ছিল, হঠাৎ সবাই পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে।

অবশেষে হেরাক্‌ল উঠে দাঁড়ালেন। 'শাহ মারদিন!'–হেরাক্‌ল তার রাজকীয় সুরে বললেন– 'আমি কখনও কারও কাছে ক্ষমা চাইনি। যাও; তুমি মুক্ত।'

শাহ মারদিন কিছুক্ষণ যাবত হেরাক্‌লের মুখপানে তাকিয়ে থাকল। যেন তার কানকে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। হেরাক্‌ল আরেকবার বললেন, 'তুমি চলে যাও।'

এবার শাহ মারদিন সম্বিত ফিলে পেল এবং মোড় ঘুরিয়ে উলটোপায়ে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে, সে-সময় হেরাক্‌ল মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং মানসিকভাবে তাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। তিনি আরও একটি বিস্ময়কর আচরণ করলেন। নিজের রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারকে ডাকলেন এবং তার কানে-কানে কী যেন বললেন। কমান্ডার দৌড়ে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল। হেরাক্‌ল বিভিন্ন কর্মকর্তাকে নানা আদেশ দিতে শুরু করলেন। এই মুহূর্তে তার সম্মুখে একটামাত্র সমস্যা যে, তিনি রুহায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা সৈন্যদের একত্রিত করতে পারবেন কি-না। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, পরাজয় তার কপালে লিপিবদ্ধ হয়ে ছিল।

কিছুক্ষণ পর রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার দরবারে প্রবেশ করল আবার হেরাক্‌ল-এর ইঙ্গিতে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর যখন ভেতরে ঢুকল, তখন তার সঙ্গে একজন কয়েদি ছিল, যার পায়ে বেড়ি এবং হাতদুটো শিকলে বাঁধা। লোকটি মুসলমান এবং তাগড়া যুবক ও সুদর্শন। মুখে ছোট-ছোট দাড়ি তার পুরুষোচিত সৌন্দর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। লোকটি কয়েদি। কিন্তু পরিধানের পোশাক-আশাক একদম পরিচ্ছন্ন এবং চেহারাটাও ঝরঝরে ও অমলিন। হেরাক্‌ল-এর আদেশে তাকে দরবারের মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো।

সে-সময় পর্যন্ত মুসলমান ও রোমানদের মাঝে যে-কটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলোতে হাজার-হাজার রোমান যুদ্ধবন্দী হয়েছিল। মুসলমানরা তাদেরকে পেছনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আবার কিছু মুসলমানও বন্দী হয়েছিল, যাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল।

হেরাক্‌ল-এর আদেশে দু-তিনজন কয়েদিকে কারাগারে রাখা হয়েছিল। অন্যদের সঙ্গে এমন খারাপ আচরণ করা হয়েছিল যে, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে তারা ধুকে-ধুকে প্রাণ হারাচ্ছিল। মুসলিম বন্দীদের তারা মানুষই মনে করছিল না। কিন্তু কারুরই জানা ছিল না, এই দু-তিনজন কয়েদিকে হেরাক্‌ল কারাগারে রাখলেন কেন।

এখন তাদের একজনকে দরবারে হাজির করা হলো। তার পোশাক ও চেহারা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, তার সঙ্গে খুবই ভালো আচরণ করা হচ্ছে, তার সেবা-যত্ন করা হচ্ছে এবং ভালো-ভালো খাবার খাওয়ানো হচ্ছে।

'তুমি একজন যুদ্ধবন্দী'- হেরাক্ল কয়েদিকে উদ্দেশ করে বললেন- 'যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে এখানে কীরূপ আচরণ হয়, তা তোমার জানা আছে। অর্ধেকেরও বেশি কয়েদি মরে গেছে। অবশিষ্ট যে-কজন এখনও জীবিত আছে, তারা হাড়ের কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তোমাকে আমরা সম্মানিত মেহমান বানিয়ে রেখেছি। কারাগারের প্রকোষ্ঠে এজন্য রেখেছি, যাতে তুমি পালাতে না পার। আমার আদেশে তোমাকে যে-সম্মান দেওয়া হয়েছে এবং যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, তার বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে আমি একটি ভেদ জানতে চাই। আমি আশা করছি, তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। বিনিময়ে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব। তুমি যদি না বল, তা হলে আমার হাতে আরও কয়েদি আছে; তথ্যটা আমি তাদের কাছ থেকে আদায় করব আর তোমাকে হত্যা করে ফেলব। তুমি একজন দায়িত্বশীল মানুষ। আমি জানি, তুমি একটি গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার। তুমি যা জানাতে পারবে, অন্যরা তা পারবে না।'

'আপনি সম্রাট হোন কিংবা সেনাপতি এসব পদমর্যাদা আমার উপর কোনোই ক্রিয়া করবে না'- মুসলমান কয়েদি বলল- 'আপনার জল্লাদ যদি তরবারিটা আমার ঘাড়ে ঠেকিয়েও ধরে, তবু আপনি কোনো তথ্য আমার থেকে বের করতে পারবেন না। এই চিত্তহারী রূপসী দাসী-রাজকন্যাদের একজনও যদি আমাকে দিয়ে দেন এবং সেইসঙ্গে ঢের সম্পদের স্তূপ আমার পায়ের উপর নিক্ষেপ করেন, তবু মুসলমানদের গোপন কোনো তথ্য আমার মুখ থেকে বের হবে না। আমি আমার মুজাহিদ সঙ্গীদের বিরুদ্ধে, আমার দীন ও জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আমরা যদি মৃত্যুকে ভয় করার মতো জাতি হতাম, তা হলে আজ তোমার মতো শক্তিধর রাজাকে আমাদের কাছে পরাজয় বরণ করতে হতো না। আমাদের জীবনগুলোকে আমরা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে রেখেছি। আমাদের দেহটি যদি কাটা পড়ে, তা হলে আমাদের আত্মা লড়াই চালিয়ে যায়।'

'আমি তোমার কাছে কোনো সামরিক তথ্য জিজ্ঞেস করছি না'- হেরাক্ল বললেন- 'যুদ্ধসংক্রান্ত গোপন কোনো কথা আমি তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি না। তুমি আমার ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছ। আর আমি মেনে নিচ্ছি, তোমরা আমাদের উপর জয়লাভ করেছ। তোমাকে একজন বিচক্ষণ মানুষ বলে মনে হচ্ছে। আমাকে শুধু এই তথ্যটুকু দাও যে, তোমাদের বাহিনীতে এমন কোন গুণটি আছে, যেটি আমার বাহিনীতে নেই আর আমার বাহিনীতে এমন কোন ত্রুটিটা আছে, যার ফলে আমরা সংখ্যায় এত বিপুল হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের অল্পসংখ্যক মানুষের কাছে

পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার এই ফৌজ ইরানি বাহিনীকে কয়েকটি ময়দান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ ইরানিরা বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী জাতি।'

'হ্যাঁ, এই ভেদ আমি আপনাকে জানাতে পারি'– মুসলমান কয়েদি বলল– 'আমরা ঐক্যবদ্ধ ও ধর্মপরায়ণ জাতি। আমাদের রাসূল আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, সমগ্র জগতের সমস্ত মুসলমান একটি দেহের মতো। এই দেহটিতে মস্তিষ্ক শুধু একটি, সারা দেহ যার আদেশ-নিষেধ মান্য করে থাকে। আপনি যদি কখনও আমাদের নামায পড়া দেখে থাকেন, তা হলে সেই দৃশ্য দ্বারা-ই বুঝতে পারবেন, আমরা যখন আল্লাহর সমীপে মাথা নত করি এবং সেজদা করি, তখনও আমরা একটি দেহেরই মতো এসব করি। আমরা এক ইমামের পেছনে নামায আদায় করি। আপনি বোধহয় জানেন না, যুদ্ধের ময়দানে আমাদের সেনাপতি আমাদের নামাযের ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন।

'তারপর আমাদের আরও একটি গুণ এই আছে যে, আমরা জীবনকে কম আর মৃত্যুকে বেশি ভালবাসি। অহংকার-আত্মম্ভরিতার পরিবর্তে বিনয়-নম্রতাকে অধিক পছন্দ করি। আমাদের শৃঙ্খলাও ঠিক তেমন, যেমনটি আপনার ফৌজের মাঝে আছে। আমাদের একজন প্রধান সেনাপতি আছেন। তাঁর অধীনে কয়েকজন সালার আছেন। তাদের অধীনে কমান্ডারগণ আছেন। এ ছাড়া আরও ছোট-ছোট অনেক পদ-পদবি আছে। কিন্তু আমরা যখন একত্রে বসি, তখন আমাদের মাঝে শাসক-শাসিতের কোনো ভেদাভেদ থাকে না। তখন আমাদের এসব পদমর্যাদা তিরোহিত হয়ে যায়। আমাদের মাঝে কেউ রাজা নন, কেউ প্রজা নয়। কেউ যদি আমাদের হত্যার হুমকি দেয় কিংবা সম্পদের প্রলোভন দেখায়, তা হলে সবার আগে আমরা আল্লাহর পানে তাকাই এবং তাঁরই বিধানের অনুসরণ করি।

'আপনি আমাকে আপনার বাহিনীর ত্রুটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আপনার বাহিনীর সবচেয়ে বড় ত্রুটিটা হলো আপনার অস্তিত্ব। আপনি মাথা থেকে ক্ষমতার দম্ভ বের করে দিন এবং নিজেকে মানসিকভাবে একজন সৈনিক ভাবতে শুরু করুন। তারপর দেখুন, এই বাহিনীর মাঝেও সেই শক্তিটি তৈরি হয়ে গেছে কি-না, যেটি আমাদের মাঝে আছে।

'আরেকটা ত্রুটি হলো, আমরা যুদ্ধ করি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আর আপনার ফৌজ যুদ্ধ করে আপনাকে খুশি করার জন্য। আপনি যদি পেছনে সরে যান, তা হলে আপনার সৈনিকরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের আল্লাহ কখনও পিছপা হন না। তাঁর নামে আমরা সামনের দিকে এগুতেই থাকি। আমাদের কেউ শহীদ হলে অন্যরা এসে তার স্থান পূরণ করে ফেলে। আমাদের সৈনিকরা যদি রণাঙ্গনে

নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে, তা হলে তারা নিজেরাই নিজেদের সালার হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের কখনও এই আদেশ করে না যে, তুমি যেহেতু একা; তাই পালিয়ে যাও।'

এই তথ্য জানার পর হেরাক্ল তার সঙ্গে এবার যুদ্ধের গোপন তথ্যাদির ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সিপাহসালারদের পরবর্তী পরিকল্পনা কী?

কিন্তু মুসলমান কয়েদি এ-জাতীয় কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে সাফ-সাফ অস্বীকৃতি জানালেন। 'তার মানে তুমি এখনও কয়েদি-ই থাকতে চাচ্ছ'– হেরাক্ল বললেন– 'যত দিন-না তুমি আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে, তত দিন তুমি আমার কারাগারে আটকই থাকবে আর আমি তোমার সঙ্গে সেই আচরণ শুরু করে দেব, যেমনটি আমরা শত্রুর যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে করে থাকি।'

হেরাক্ল আদেশ করলেন, 'একে আপাতত সেই প্রকোষ্ঠে নিয়ে ফেলে রাখো। দুদিন পর আবার আমার সামনে এনে হাজির করো।'

কয়েদিকে দরবার থেকে নিয়ে যাওয়া হলো। পরদিন সকালবেলা হেরাক্ল-এর এক যুবতী কন্যা ঘোড়ায় চড়ে কয়েদখানায় এল। জেলার সংবাদটা পেয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল এবং রাজকুমারীর সামনে অবনত মস্তকে ঝুঁকে পড়ল। ওখানে রাজপরিবারের প্রতিজন সদস্যেরই আদেশ চলত। এ তো রাজকন্যা। রাজকন্যাদের মর্যাদা-ই ছিল আলাদা।

রাজকুমারী মুসলমান কয়েদির নাম উল্লেখ করে বলল, আমি ওকে নিতে এসেছি। সম্রাট তাকে যেতে আদেশ করেছেন।

কয়েদি যদি অন্য কেউ হতো, তা হলে জেলার চিন্তা করত, একজন কয়েদিকে নেওয়ার জন্য রাজকুমারী এলেন কেন। কিন্তু জেলারের জানা ছিল, এই মুসলমান কয়েদির সঙ্গে আলাদা ধরনের আচরণ করা হচ্ছে এবং এ শুধ নামের কয়েদি। এই তো একদিন আগেই সম্রাট তাকে দরবারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ফলে জেলার ভাববার প্রয়োজন মনে করল না শাহজাদী এই কয়েদিকে সঙ্গে করে নিতে এল কেন।

জেলার রাজকুমারীকে সঙ্গে করে চাবি নিয়ে মুসলমান কয়েদির কক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কক্ষের দরজা খুলে কয়েদিকে বের করে আনল এবং তাকে রাজকুমারীর হাতে তুলে দিল।

'এ আজ সম্রাট হেরাক্ল-এর অতিথি হবে'– রাজকুমারী জেলারকে উদ্দেশ করে বলল– 'তিনি এর পায়ের বেড়ি ও হাতের শিকল খুলে দিতে আদেশ করেছেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে আদেশ তামিল হয়ে গেল। জেলার কয়েদির বেড়ি ও শিকল খুলে দিল। রাজকুমারী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। রাজকুমারী নিজে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং কয়েদিকে বলল, তুমি পায়ে হেঁটে অগ্রসর হও।

দুজন কিছুদূর এভাবে পথ চলল যে, রাজকুমারী ঘোড়ার পিঠে বসে আছে আর মুসলমান কয়েদি তার পাশে-পাশে পায়ে হেঁটে চলছে। একজায়গায় পৌঁছে রাজকুমারী ঘোড়াটা থামিয়ে ফেলল।

'আমার পেছনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসো'– রাজকুমারী কয়েদিকে বলল– 'লাগামটা হাতে নিয়ে ঘোড়া হাঁকাও এবং ঘোড়াটাকে স্বাধীন ছেড়ে দাও। সামনে তুমি আলাদা ঘোড়া পেয়ে যাবে। আর আমাকে একথা জিজ্ঞেস করো না, আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি।'

কয়েদি কোনো কথা না বলে চুপচাপ রাজকুমারীর পেছনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং দ্রুতবেগে ঘোড়া হাঁকাল।

সামনে ঘন বন ও পাহাড়ি অঞ্চল। এখন তারা শহর ছেড়ে অনেক দূর বেরিয়ে এসেছে। এবার কয়েদি রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করল, আমাকে আপনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

'তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ না– আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি'– রাজকুমারী বলল– 'আমাকে তোমার ফৌজে নিয়ে চলো। আমি ফিরে আসার জন্য যাচ্ছি না। আর এজন্যই আমি তোমাকে কয়েদখানা থেকে বের করে এনেছি।'

কয়েদি ঘোড়ার লাগামে মৃদু নাড়া দিল। ঘোড়া দ্রুতবেগে ছুটতে লাগল। কয়েদির জানা ছিল না, তার বাহিনী কোথায় থাকতে পারে। তাই ধরা পড়ার আশঙ্কা তার মাথায় ছিল। তাই সে ঘোড়ার গতি সামান্য বাড়িয়ে দিল।

দুই

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা। পশ্চিমাকাশে সূর্যটা অস্ত যেতে আর অল্প বাকি।

রাজকুমারির নাম শারিনা। কোনো সাধারণ পরবারের সন্তান নয় যে, ঘণ্টা-দুঘণ্টা পরেই ঘরের লোকেরা বিচলিত হয়ে উঠবে, আরে, মেয়েটা গেল কোথায়! সেই কখন গেল; এখনও তো এল না! ব্যাপারটা কী!

শারিনা রাজকন্যা। তার মায়ের জানা ছিল, মেয়েটা ঘোড়ায় চড়ে গেছে; কাজেই আসতে একটু বিলম্ব হবেই। কিন্তু সারাটা দিন কেটে গেল। শারিনা এখানে একলা মেয়ে নয়। এটি রাজমহল। এখানে তার মতো আরও অনেক মেয়ে আছে। অনেকে আছে রক্ষিতা। অন্যেকে স্ত্রী। ফলে একটা মেয়ের কিছু সময়ের জন্য এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়া বিচলিত হওয়ার মতো কোনো ঘটনা নয়।

সারাটা দিন গেল। শারিনার মা তার মেয়ের অনুপস্থিতি টেরই পেলেন না। টের না পাওয়ার বড় একটা কারণ, সময়টা ছিল খুবই নাজুক। মহলে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সম্রাট হেরাক্ল পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তার বাহিনী পরাজয়ের

গ্লানি মাথায় নিয়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান করছিল। হেরাক্ল ফেরাউনদের মতো শাসক ছিলেন। পরাজিত হয়ে তিনি পাগলের মতো হয়ে আছেন। তার স্ত্রী, রক্ষিতা ও মহলের অন্যান্য লোকেরা লুকিয়ে-লুকিয়ে সময় পার করছে। কারণ, বলা যায় না, রাগের মাথায় সম্রাট কখন কার পেটে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেন। কাউকে হত্যা করা ছিল তার জন্য এমন, যেন অপ্রয়োজনীয় কোনো বস্তুকে তুলে ঘর থেকে বাইরে ফেলে দিলেন।

এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এবার শারিনার মা বিচলিত হতে শুরু করলেন– ব্যাপারটা কী– মেয়েটা এখনও এল না কেন! কিন্তু তিনি বিষয়টা সম্রাটকে বলতে ভয় পাচ্ছেন। কারণ, সম্রাট আগে থেকেই ক্ষোভের আগুনে পুড়ছেন। মনটা তার এমনিতেই বেজায় খারাপ।

সূর্য অস্ত যেতে শুরু করেছে। রানির মনের অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। এবার তিনি সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

কক্ষে বসে সম্রাট হেরাক্ল গোয়েন্দাদের থেকে রিপোর্ট নিচ্ছিলেন। বাহিনীর ঊর্ধ্বতন অনেক কর্মকর্তাও তার সম্মুখে উপবিষ্ট। তাদের তিনি জরুরি নির্দেশনা প্রদান করছেন। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে তিনি চরম বিরক্তি বোধ করলেন। তার কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেল। রাগে চেহারাটা লাল হয়ে গেল।

'কেন এসেছ?'– রাজকীয় ভঙ্গিতে ও ঝাঁজমেশানো কণ্ঠে হেরাক্ল জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কি জান না...'

'সবই জানি'– শারিনার মা হেরাক্লের পুরো কথা না শুনেই অনুনয়ের স্বরে বললেন– 'আপনার ব্যস্ততা, আপনার অস্থিরতা সবই আমি জানি। এ শুধু আপনার নয়– আমাদের সকলের অস্থিরতা। আমি ভুলেও এভাবে আসতাম না। কিন্তু মা তো...।

'আসল কথাটা বলো কী হয়েছে!' হেরাক্ল এমনভাবে গর্জে উঠলেন, যেন কক্ষের ছাদটাও থরথর করে কেঁপে উঠেছে।

'শারিনা সেই ভোরে ঘোড়ায় চড়ে বের হয়েছিল'– শারিনার মা বললেন– 'কিন্তু এখনও ফেরেনি।'

'তা হলে কি আমি গিয়ে তাকে খুঁজব?' হেরাক্ল চরম তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন এবং বেশ কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অবার মুখ খুললেন– 'আপন-আপন সন্তানদের প্রতি তোমরা নিজেরাই দৃষ্টি রাখছ না কেন? মহলের চাকর, রক্ষী ও অন্যান্য কর্মচারীরা তোমাদের আদেশ মান্য করা ছেড়ে দিয়েছে নাকি? আমার কাছে তোমার আসা-ই উচিত হয়নি।'

'আপনি জানেন, ও আমার একমাত্র কন্যা'– শারিনার মা ভিখিরিনীর মতো মিনতির সুরে বললেন– 'আমি জানি না, মেয়েটা কোথায় চলে গেল! দেশের অবস্থা তো ভালো নয়।'

'তুমি এক কন্যার কান্না কাঁদছ'– হেরাক্ল বললেন– 'তুমি একটা মেয়েকে খুঁজে ফিরছ। আর এখানে গোটা একটা দেশ আমার সাম্রাজ্য থেকে খসে পড়েছে!'

হেরাক্ল-এর যদি এই একটামাত্র কিংবা দু-চারটা কন্যা থাকত, তা হলে না হয় তিনি বিচলিত হতেন যে, হায় মেয়েটার কী হলো! মেয়েটা আমার কোথায় গেল! কিন্তু তার তো হিসাবই নেই যে, তার কতটা রক্ষিতা আর কতজন স্ত্রী আছে। ছেলেমেয়ে কজন সেই হিসাব তো তার কাছে থাকবারই কথা নয়। তা ছাড়া এ-সময়ে তো তার রাজ্য ছাড়া আর কিছু মনেই নেই।

বিগত অধ্যায়ে আপনারা পড়ে এসেছেন, হেরাক্ল পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। মুসলামানরা তাকে শাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন তিনি রুহায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং বিক্ষিপ্ত বাহিনীটাকে কীভাবে একত্রিত করা যায় সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় একজন রাজকন্যার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা তার কাছে বিচলিত হওয়ার মতো কোনো দুর্ঘটনা নয়।

শারিনার মা সম্রাটের কথাগুলো শুনলেন এবং তার মানসিক অবস্থা আঁচ করলেন। তার নির্লিপ্ততা অনুভব করলেন। অবশেষে কিছু না বলেই মোড় ঘুরিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন।

* * *

কে একজন শারিনার মাকে তথ্য দিল, আপনার মেয়েকে সকালে কারাগারের দিকে যেতে দেখা গেছে। শারিনার মা চিন্তায় পড়ে গেলেন, ব্যাপারটা কী; শারিনা ওদিকে যাবে কেন! কারাগারের অবস্থান জনবসতি থেকে খানিক দূরে। আশপাশের সমস্ত এলাকা জনমানবহীন ও অনাবাদি। ওদিকে না কোনো ভ্রমণের উপযোগী জায়গা আছে, না এমন কোনো স্থান আছে, শারিনা যেখানে যেতে পারে। কারাগার তো এমন কোনো জায়গা নয়, যেখানে শারিনার যাওয়ার কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে। যদি কারাগারেই গিয়ে থাকে, তবুও তো এই সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওখানে আটকে থাকার কোনো কারণ বা যৌক্তিকতা নেই।

কিন্তু যুক্তি ও বাস্তবতা যা-ই বলুক, মা তো! তার মাথায় নানা ভাবনা, দুশ্চিন্তা ও সংশয় দানা বাঁধতে শুরু করল। চিন্তা করলেন, হয়ত শারিনা বিনোদনের জন্য কারাগারের কয়েদিদের দেখতে গেছে। হতে পারে, ভয়ংকর কোনো কয়েদি নাগালে পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেছে এবং কর্মচারীরা চাকুরি বাঁচানোর জন্য তার লাশটা ভেতরেই কোথাও পুঁতে রেখেছে।

শারিনার মা সম্রাট হেরাক্‌ল-এর অন্যান্য স্ত্রীদের মতো একজন স্ত্রীমাত্র– রানি নন। হেরাক্‌ল তার কোনো স্ত্রীকে রানির মর্যাদা দেননি। কিন্তু তারপরও তারা আদেশ-নিষেধ চালাতে পারতেন এবং রাজক্ষমতাকে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার অনুমতি ছিল।

শারিনার মা তার একান্ত নিজস্ব এক কর্মচারীকে কারাগারে পাঠালেন যে, জলদি গিয়ে জেলারকে সঙ্গে করে নিয়ে আসো। তিনি ভেবেছিলেন, শারিনা যদি কারাগারে বা তার আশপাশ দিয়ে কোনো দিকে গিয়ে থাকে, তা হলে তথ্যটা জেলারের অবশ্যই জানা থাকবে। কিন্তু শারিনার সকল তথ্যই যে তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে এমন আশা তিনি করেননি।

জেলার আদেশ পাওয়ামাত্র ছুটে এল। শারিনার মা অস্থির চিত্তে ও বিচলিত কণ্ঠে তাকে শারিনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, ও কি কারাগারে গিয়েছিল? বা ওকে তুমি কারাগারের আশপাশ দিয়ে কোথাও যেতে দেখেছ?

জেলার শারিনার মায়ের মুখের দিকে এমন এক দৃষ্টিতে তাকাল, যাতে প্রশ্নও ছিল, বিস্ময়ও ছিল। শারিনার মা যখন জানালেন, মেয়েটা সেই সকালবেলা বেরিয়ে গেল আর এখনও পর্যন্ত ফেরেনি, শুনে জেলারের মুখের রং বদলে গেল।

'মহারানি!'– সম্রাট হেরাক্‌ল-এর স্ত্রী হওয়ার কারণে শ্রদ্ধাবশত জেলার শারিনার মাকে 'মহারানি' বলে সম্বোধন করা জরুরি মনে করল এবং বলল– 'গত কাল সকালে সম্রাট এক মুসলমান কয়েদিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আজ সকালে রাজকুমারী শারিনা কারাগারে এসে ওই কয়েদিকে মুক্ত করিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল! বাইরে রাজকুমারীর ঘোড়া দণ্ডায়মান ছিল। তিনি সেই ঘোড়ায় সাওয়ার হলেন আর কয়েদিটা তার পাশে-পাশে পায়ে হেঁটে গিয়েছিল! বলেছিলেন, সম্রাট নাকি ওকে নিতে তাকে পাঠিয়েছেন!

শারিনার মা উক্ত মুসলমান কয়েদি সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন তাকে ও তার দু-তিনজন সঙ্গীকে কী কারণে কারাগারে অথিতির মতো রাখা হয়েছে। এখন তিনি জানতে পারলেন, তারই মেয়ে তাদের একজনকে মুক্ত করিয়ে নিয়ে গেছে।

সংবাদটা হেরাক্‌ল-এর কানে দেওয়া তিনি জরুরি মনে করলেন। কারণ, এটা কোনো ষড়যন্ত্রও তো হতে পারে, যে-বিষয়ে সম্রাটের অবহিত হওয়া আবশ্যক। শারিনার মা আশঙ্কা অনুভব করলেন, তথ্যটা যদি সম্রাট থেকে গোপন রাখা হয় আর কদিন পর অন্য কোনো উপায়ে তিনি বিষয়টা জানতে পারেন, তা হলে তাকে ও জেলারকে তিনি হত্যা করে ফেলবেন।

শারিনার মা জেলারকে সঙ্গে করে পুনরায় হেরাক্‌ল-এর কক্ষে প্রবেশ করলেন। এবার সম্রাট তার প্রতি এমন রোষকষায়িত লোচনে তাকালেন, যেন উঠে এসে এক্ষুনি তার পেটে খঞ্জরটা সেঁধিয়ে দিবেন। কিন্তু জেলার সঙ্গে থাকায় তার মনে

সন্দেহ জাগল, ব্যাপার বোধহয় অন্যকিছু হবে– বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেছে মনে হয়।

হেরাক্‌ল-এর চোখে যে-ক্ষোভ উথলে উঠেছিল, সেটি চোখেই মিলিয়ে গেল এবং নীরবতা তাকে ছেয়ে ফেলল। এই নীরবতার বুক চিড়ে কোন ঝড় উত্থিত হবে, তা কেউ বলতে পারছে না। এক রাজকুমারী কারাগার থেকে একজন কয়েদিকে মুক্ত করিয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে, তাতে সম্রাট হেরাক্‌ল-এর কিছুই যায় আসে না। এ নিয়ে তার ভাবনার কোনোই কারণ নেই। কিন্তু যে-বিষয়টি তাকে ভাবিয়ে তুলেছে, সেটি হলো, এই মুসলমান কয়েদিটার বিশেষ এক গুরুত্ব ছিল। লোকটা সাধারণ কোনো সৈনিক ছিল না। মুসলিম বাহিনীর উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা ছিল। আর লোকটা বেশ বিচক্ষণও ছিল।

'আর এক রাজকন্যার কথায় তুমি তাকে মুক্ত করে দিলে!'– হেরাক্‌ল জেলারকে বললেন– 'তার পায়ের বেড়ি আর হাতের কড়া খুলে দিলে! এ আমাকে গ্রেফতার করাবার চক্রান্তও হতে পারে। আমাকে হত্যা করার গভীর কোনো ষড়যন্ত্রও হতে পারে।'

জেলার চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে মানসিকভাবে ধরেই নিয়েছে, তার জীবনের আর কয়েক মিনিট সময় অবশিষ্ট আছে মাত্র। কারণ, তার জানা আছে, হেরাক্‌ল-এর কাছে মৃত্যুদণ্ডই সবচেয়ে লঘু শাস্তি।

'আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেব'– হেরাক্‌ল বললেন– 'রাজকুমারীর সহযোগিতায় পলায়নকারী কয়েদিটা যদি খ্রিস্টান হতো, তা হলে আমার আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু লোকটা মুসলমান। তুমি কি দেখছ না, এই মুসলমানরা আমাদের কোন পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে? তুমি কি শ্রেফ একটা কারণ দর্শাতে পারবে, যার উপর ভিত্তি করে আমি তোমার এই পদক্ষেপকে যথাযথ বলে মেনে নিতে পারব?'

জ্যোতিষী যেভাবে নিজেকে মৃত্যুর মুখোমুখি দণ্ডায়মান দেখে হেরাক্‌লকে কিছু সত্য ও তিক্ত কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, তেমনি জেলারও মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা মাথায় নিয়ে তাকে কিছু তিক্তসত্য শুনিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। সে নিশ্চিত হয়ে গেছে, এখান থেকে তার আর জীবন নিয়ে বেরুবার সুযোগ মিলবে না। কাজেই বেপরোয়া হয়ে সত্য বলার এ এক উপযুক্ত সময়।

'রোমের সম্রাট!'– জেলার বলল– 'আমি যদি রাজকুমারীর আদেশ পালন না করতাম, তা হলে তিনি আমাকে হত্যা করে ফেলতেন। তাই আমি তার আদেশ মান্য করেছি। আর তারই অপরাধে এখন আপনি আমাকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোনাচ্ছেন। আপনার এই শাস্তি আমি বরণ করে নিলাম। আমি জানি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন না। আমি আপনার অনেক নিমক খেয়েছি। এই মর্যাদা

আমাকে আপনি দান করেছেন। তাই মৃত্যুর আগে আপনার সেই নিমককে হালাল করা আমি আমার কর্তব্য মনে করছি। এ-ই একটি প্রতিদান, যেটি আমি আপনার পায়ে অর্পণ করতে চাই। এটি কোনো সোনা-চাঁদির ভাণ্ডার নয়– কয়েকটি শব্দমাত্র। আপনি যদি আমার এই উপঢৌকনগুলো সাদরে গ্রহণ করে নেন, তা হলে আপনার ও আপনার সাম্রাজ্যের জন্য খুবই কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।'

হেরাক্‌ল অপলক চোখে চুপচাপ লোকটির পানে তাকিয়ে আছেন। তার এই নীরবতার অর্থ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, তিনি জেলারকে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু মৃত্যু জেলারের উপর ভীতি ও অনুশোচনা সৃষ্টি করার পরিবর্তে তার মাঝে সাহসিকতা তৈরি করে দিল।

'আপনার কাছে আমি জীবনের ভিক্ষা চাইব না'– জেলার বলল– 'আদেশ মান্য করা আমাদের কর্তব্য। এখানে আদেশ একজন থেকে আসে না; বরং রাজপরিবারের অনেকের পক্ষ থেকে আদেশ আসে। আমরা কারুরই আদেশ অমান্য করার দুঃসাহস দেখাতে পারি না। আমি জানি, কারাগারে তিন-চারজন মুসলমান কয়েদিকে আপনি অতিথির মতো রেখেছেন। লোকগুলোর সঙ্গে কেন ভালো আচরণ করা হচ্ছে, তা-ও আমার জানা আছে। আপনি তাদের থেকে জানতে চাচ্ছিলেন, মুসলমানরা এত অল্পসংখ্যক মানুষ রোমের এমন বিশাল শক্তিটিকে কীভাবে এমন তছনছ করে দিল যে, তারা এখন কোথাও দাঁড়াতেই পারছে না। হতে পারে, তাদের দ্বারা আপনি আরও গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ নিতে চাচ্ছেন। তা অবশ্য আমার জানাও নেই, জানবার আবশ্যকতাও নেই। আমি তাদের দুবার এই প্রশ্নটি করেছিলাম। তারা যে-উত্তর দিয়েছে, সেটি আমার অন্তর গ্রহণ করে নিয়েছে। আর এখন আমি সেই উত্তরটি-ই আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করতে চাই।

'তারা বলেছে, ইসলামে কোনো রাজা থাকেন না। তাদের মাঝে রাজপরিবার বলতে কিছু নেই। রাজত্ব শুধুই আল্লাহর। মুসলমানরা তাঁর বিধান মান্য করে এবং তাঁরই পথে চলে। তারা আমাকে বলেছে, তারা লড়াইও করে আল্লাহকে উপস্থিত জ্ঞান করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে। দুই কি তিনজন মুসলমানও যদি একত্র হয় কিংবা ভ্রমণে বের হয়, তা হলে সবার মধ্য থেকে একজনকে তারা নেতা বানিয়ে নেয় এবং তারপর তার কথামতো চলে। তাদের বাহিনীর সালার আমিরও, আবার ইমামও। তারা আমাকে বলেছে, তাদের রাসূলও তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এখন তাদের একজন খলীফা আছেন, যাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধকে তারা সবাই শিরোধার্য মনে করে। কিন্তু তিনিও পরামর্শ ছাড়া কোনো আদেশ-নিষেধ জারি করেন না। খলীফার, কোনো নেতার, কোনো সিপাহসালারের স্ত্রী-কন্যারা কোনো আদেশ জারি করতে পারেন না। তাদেরও কেউ যদি কোনো

অপরাধ করেন, তা হলে তাকেও সেই শাস্তি বরণ করে নিতে হয়, যে-শাস্তি পেতে হয় একজন সাধারণ নাগরিককে।

'মহান সম্রাট! অপরদিকে আপনি এখানকার অবস্থা দেখুন। আপনার রাজপরিবারের সদস্যসংখ্যা গণনা করুন। আমাদের জন্য এমন কোনো আদেশ নেই যে, আমরা এদের কারও আজ্ঞা পালন করব না। আমি যদি এদের কারও আদেশ অমান্য করি, তা হলে আমাকে সেই কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা হবে, আজ আমি যার জেলার। আপনি একথাটিও মাথায় রাখুন যে, রাজকুমারীর সঙ্গে বেরিয়ে-যাওয়া-কয়েদিটাকে আপনি অতিথির মতো রাখতে আদেশ করেছিলেন। রাজকুমারী শারিনা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এলেন এবং বললেন, সম্রাট একে তলব করেছেন। তখন আর আমার এই আদেশ অমান্য করার কোনোই উপায় ছিল না।'

'অপর তিন মুসলমান কয়েদির এসব সুবিধা বন্ধ করে দাও'– হেরাক্ল বললেন– 'ওদের পাতাল কক্ষের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখো। ওখানেই ওরা মরে পঁচে-গলে যাক।'

হেরাক্ল এমন এক সুরে, এমন এক ভঙ্গিতে আদেশটি জারি করলেন, যেন তিনি ঘুমের মধ্যে কথা বলছেন। এমন ধারণাও করা অসঙ্গত ছিল না যে, জেলারের বক্তব্য তিনি পুরোপুরি শোনেনইনি। পরাজয়ের পাহাড় এসে তাকে চেপে ধরেছে। শাম বিশাল একটি রাজ্য ছিল। সেটি মুসলমানদের ঝুলিতে চলে গেছে।

'আপনি কি ওদের ধাওয়া করার আদেশ দেবেন না?' শারিনার মা জিজ্ঞেস করলেন।

'না'– হেরাক্ল নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললেন– 'সেই সকালে বেরিয়েছে। এতক্ষণে বহুদূর চলে গেছে। আর আমাদের এ-ও তো জানা নেই যে, ওরা কোন দিকে গেছে।'

শারিনার মা এটা-ওটা বলছেন আর হেরাক্ল তার কোনো কথার অসম্পূর্ণ উত্তর দিচ্ছেন, আবার কোনোটির উত্তরে তার মুখপানে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

হেরাক্ল জেলারকে কী একটা ইঙ্গিত করলেন কিংবা সে ধরে নিয়েছে, তার মুক্তি মিলে গেছে। তাই সে মোড় ঘুরিয়ে ধীর পদক্ষেপে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

'ও চলে গেছে'– শারিনার মা বললেন– 'আপনি ওকে ক্ষমা করবেন না।'

'যেতে দাও'– হেরাক্ল বললেন– 'আমি ভবিষ্যতের চিন্তায় বিচলিত। তুমি আমাকে আগামী দিনের ভাবনা ভাবতে দাও।'

* * *

সূর্য ডুবে গেছে অনেক আগে। রাত গভীর হয়ে গেছে। এতক্ষণে শারিনা রুহা ছেড়ে বহু দূর চলে এসেছে। তার সফরের একটি দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। মুসলমান

কয়েদির নাম হাদীদ ইবনে মুমিন খাযরাজ। খাযরাজ আরবের বড় ও বিখ্যাত একটি গোত্রের নাম। হাদীদ এই গোত্রের সদস্য।

হেরাক্ল-এর কারাগার লোকালয় থেকে খানিক দূরে। সম্মুখে জনমানবহীন মরু-অঞ্চল। কিছুদূর পর্যন্ত শারিনা ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট থাকল আর হাদীদ তার কথামতো ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে থাকল। অপরিচিত কেউ দেখলে নির্ঘাত মনে করত, আরোহী মেয়েটি কোনো মন্ত্রী কিংবা ধনাঢ্য কোনো পিতার কন্যা আর সঙ্গের পুরুষ লোকটা তার ভৃত্য। হাদীদ পথে শারিনাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা কোথায় যাচ্ছি। শারিনা উত্তর দিয়েছিল, কোনো কথা না বলে সামনের দিকে এগুতে থাকো। হাদীদ কোনো প্রকার ভয় পায়নি এবং তার মনে কোনো আশঙ্কাও জাগেনি। লোকটি সুদর্শন যুবক। দেহে তার প্রবল শক্তি আছে। আছে উচ্ছৃঙ্খলতাও।

কয়েদখানা থেকে বের হয়ে কিছু পথ অতিক্রম করার পর দুজন জগতের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। এখান থেকে উঁচু অঞ্চল শুরু। আশেপাশে এদিক-ওদিক ছোট-বড় কিছু নিচু এলাকাও আছে। মাঝে-মাঝে টিলা-টিপি, ঝোপঝাড় ও গাছ-গাছালিও চোখে পড়ছে। এখানে নিয়মতান্ত্রিক কোনো রাস্তা নেই। কোনো পাকডন্ডিও নেই। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এপথে মানুষ কমই চলাচল করে।

তারা আরও সামনে এগিয়ে গেল। এখানে ঐকব্যক্তি একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। শারিনা তার কাছে গিয়ে ঘোড়াটা থামিয়ে দিল। লোকটা মধ্যবয়সী একজন পুরুষ। শারিনা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে-নামতে সে তার ঘোড়াটা নিয়ে আরও কাছে এগিয়ে এল।

'তুমি এই ঘোড়াটাতে চড়ে বসো।' শারিনা হাদীদকে বলল।

হদীদের বুঝতে কষ্ট হলো না, এটা সেই ঘোড়া, যার সম্পর্কে শারিনা কয়েদখানা থেকে বের হয়ে বলেছিল, সামনে গিয়ে তুমি আলাদা ঘোড়া পেয়ে যাবে। মধ্যবয়সী লোকটা নিশ্চয় শারিনার ভৃত্য।

হাদীদ ঘোড়া চড়ে বসল।

ঘোড়ায় চড়ে বসে হাদীদ শারিনার পানে তাকাল। শারিনা এখনও তার ঘোড়ায় সাওয়ার হয়নি। মধ্যবয়সী লোকটা তার সম্মানে এতটাই ঝুঁকে গেল যে, লোকটা রুকুর অবস্থায় চলে গেল। শারিনা একজন রাজকন্যা। এই লোকটা তার চাকর বা সহিস। তা ছাড়া তার এই আশাও আছে, রাজকুমারী তাকে পুরস্কৃত করবেন।

রাজকুমারীকে কুর্নিশ জানিয়ে লোকটা এখনও সোজা হয়ে দাঁড়ায়নি। এরই মধ্যে রাজকুমারী তাকে তার পুরস্কারটা বুঝিয়ে দিল। রাজকুমারী ঝট করে পরিধানের কাপড়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা খঞ্জর বের করল এবং অস্ত্রটা উঁচু করে ধরে অমনি সেটা লোকটার পিঠে সেঁধিয়ে দিল। লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই খঞ্জরটা বের করে আবারও ঠিক আগের জায়গায় আঘাত হানল।

হতভাগা লোকটা আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। ওখান থেকেই একদিকে কাত হয়ে মাটিতে লুটিতে পড়ল। শারিনা তার পাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা অবলোকন করল। মৃত্যু লোকটাকে সোজা করে ভূতলে শুইয়ে দিল।

শারিনা লাশের প্রতি ঝুঁকে তার পরিধানের কাপড় দ্বারা রক্তমাখা খঞ্জরটা পরিষ্কার করে খাপে ভরে নিল। লোকটার কোমরে চামড়ার পেটির সঙ্গে একটা তরবারি বাঁধা ছিল। শারিনা পেটিটা খুলে তরবারি ও পেটি দুটাই হাদীদের হাতে দিয়ে বলল, এগুলো কোমরে বেঁধে নাও।

'এখন আর তুমি নিরস্ত্র থাকবে না'– শারিনা প্রফুল্ল মনে বলল– 'আমার কাছে তো খঞ্জর আছেই।'

'ওকে কোন পাপের শাস্তি দিলে?' হাদীদ জিজ্ঞেস করল।

'এখানে আর দাঁড়ানো যাবে না'– শারিনা বলল– 'আমরা এখনও ঝুঁকির মধ্যে আছি।'

বলেই শারিনা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং লাগামে ঝাঁকুনি দিল। ঘোড়া চলতে শুরু করল। এবার শারিনা বলল, 'এই লোকটা আমাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারত। এ মহলের ভৃত্য। এখান থেকে ছুটে যেত এবং আমার মায়ের সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভের আশায় তাকে বলে দিত, আমি একব্যক্তির সঙ্গে অমুক দিকে চলে গেছি। আর মা তৎক্ষণাৎ আমাদের পেছনে লোক পাঠিয়ে দিতেন। তখন আমার তো কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারত না; কিন্তু তোমাকে তারা হত্যা করে ফেলত।'

'এবার বলো তুমি কে'– হাদীদ জিজ্ঞেস করল– 'আমাকে জিজ্ঞেস করা ছাড়াই আমার নামটা তোমার জানা আছে। বলো, তোমার নাম কী? আর আমি একথাটাও অবশ্যই জিজ্ঞেস করব, আমাকে নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ?

'আমার নাম শারিনা'– শারিনা বলল– 'আমি রাজপরিবারের সদস্যা। আমার মা সম্রাট হেরাক্‌ল-এর স্ত্রী; কিন্তু আমি তার কন্যা নই। তার আগে রোমের সম্রাট ছিলেন ফোকাস। আমি তার মেয়ে। আর আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, না? এই প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে আগেই দিয়েছি যে, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি না– আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আরেকবার শুনে নাও– তুমি আমাকে তোমাদের বাহিনীতে নিয়ে যাও।'

'কিন্তু কেন?– হাদীদ জিজ্ঞেস করল'– 'আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? আমি কি সন্দেহ করব না যে, তুমি আমাকে এমন এক প্রয়োজনে নিয়ে যাচ্ছ, যা আমার জন্য সঙ্গত হবে না?'

'তুমি পুরুষ। তোমার কাছে তরবারি আছে'– শারিনা মিটিমিটি হেসে বলল– 'যখনই ও যেখানেই শঙ্কা অনুভব করবে, আমাকে হত্যা করে ফেলবে।'

শারিনা তার ঘোড়ার গতি সামান্য বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এখন কিছু দূর পর্যন্ত ঘোড়াদুটোকে ছুটতে দাও। সামনে এমন অঞ্চল আসছে, যেখানে ঘোড়া ঠিকমতো দৌড়াতে পারবে না। সামনে গিয়ে বলব, আমি কে। তখন তুমি আমাকে বোলো, আমি পাগল কি-না।

অঞ্চলটা ধীরে-ধীরে উঁচু হতে চলেছে। সামনে টিলা-টিপি আছে। ঘাস, লতা-পাতা ও গাছ-গাছালিতে জড়ানো সুন্দর-সুন্দর পাথরখণ্ডও আছে। কতটুকু সামনে অগ্রসর হয়ে শারিনা তার ঘোড়াটা থামাল এবং পেছনের দিকে তাকাল। দেখাদেখি হাদীদও ঘোড়া থামিয়ে পেছনপানে দৃষ্টিপাত করল। গাছ-গাছালির উপর দিয়ে রুহার দুর্গঘেরা নগরীটা দেখা যাচ্ছে। তারা শহর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে।

'দূরদিগন্ত পর্যন্ত তাকাও'– শারিনা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল– 'কত সুন্দর এলাকা। এই অঞ্চল এখন তোমাদের। এই এলাকা রোমের শাহেনশাহি থেকে বেরিয়ে গেছে। রোমের রাজা ও আমার মতো রাজকন্যারা অতীতের কাহিনীতে পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সম্রাট হেরাক্‌ল-এর কোনো বিজয়ে এত খুশি হইনি, যত আনন্দিত হচ্ছি তার পিছুহটা দেখে। চলো; বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না।'

তারা ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে চলতে শুরু করল। কিন্তু দুজনের একজনও এখনও জানে না, তাদের গন্তব্য কোথায়।

'এখন তুমি আমার পথনির্দেশক'– শারিনা বলল– 'অনুমান করে নাও; তুমি কোথা থেকে ধরা পড়েছিলে এবং তোমাদের ফৌজ কোথায় থাকতে পারে। এখন তুমি আমাকে তোমার মালিকানা ভাব কিংবা কয়েদি মনে কর বা সফরসঙ্গী জ্ঞান কর; আমার জীবনের সফর তোমারই সঙ্গে অতিবাহিত হবে।'

এখন তারা চটান ও উঁচু-নিচু পাথুরে এক অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এখানে কোনো সোজা পথ নেই। হাদীদ এমনিতেই অনুমানের উপর পথ চলছে।

'মহলের লোকেরা আমাকে ভালো চোখে দেখে না'– 'শারিনা আত্মকাহিনী বলা শুরু করল– আমাকে তারা আধপাগলিনী মনে করে। পুরো পাগল বলার লোকও কম নয়। তারা ঠিকই বলে। আমার কথাবার্তা ও স্বভাব-চরিত্র কিছুটা এমনই। আমি রাজকন্যা বটে; কিন্তু আমার রক্তে বোধহয় কোনো দোষ আছে।'

'আমাকে তুমি আসল কথাটা শোনাও শারিনা!'– হাদীদ বলল– 'আমি তোমাকে জানাব, দোষটা তোমার রক্তে, নাকি মস্তিষ্কে।'

'আমার মাকে তুমি দেখনি'– শারিনা বলল– 'খুবই সুন্দরী মহিলা। আমি তার একমাত্র সন্তান। বংশগতভাবে তিনি রাজপরিবারের সন্তান নন। আরবের কোনো এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর কন্যা ছিলেন। তুমি তো জান, ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়িক কাজে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায় এবং কাফেলার সঙ্গে পথ চলে। তখন আমার মায়ের বয়স ষোলো-সতেরো বছর ছিল। নানাজান একদিন বললেন, আমি ব্যবসায়িক কাজে

মিসর যাব এবং তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাব। তিনি সপরিবারে মিসর গেলেন। আমার মা-ও সঙ্গে ছিলেন। তার ছোট দুটি ভাই ছিল। একচাচাও সঙ্গে ছিলেন। এসব কাহিনী আমাকে আমার মা শুনিয়েছেন।

'অনেক বড় কাফেলা ছিল। কাফেলার অধিকাংশ সদস্য ব্যবসায়ী ছিল। আর নানা ধরনের বাণিজ্যপণ্যের তো কোনো শুমারই ছিল না। মরুতস্করেরা এ-ধরনের কাফেলার সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাকে। তারা এই কাফেলাটার সন্ধান পেয়ে গেল। কিছুদিন পর কাফেলা শাম দেশে প্রবেশ করল। তখন একস্থানে দস্যুরা কাফেলাটা আটকে ফেলল। কাফেলালুণ্ঠনের ঘটনা তো আজও ঘটছে। আর তুমি তো জান কাফেলা কীভাবে লুণ্ঠিত হয়।

'মা আমাকে বলেছেন, দস্যুরা সংখ্যায় ছিল অনেক। মনে হচ্ছিল, যেন আকাশ থেকে শকুনের পাল আর মাটি থেকে হাজার-হাজার নেকড়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমার মা যুবতীও ছিলেন আবার এত রূপসীও যে, একবার চোখ পড়লে আর ফিরতে চাইত না। এক দস্যু মাকে তুলে নিয়ে গেল। তার পিতা ও ভাইদের পরিণতি কী হয়েছিল তিনি বলতে পারেন না। দস্যুরা আমার মাকে অপহরণ করে নিয়ে গেল।

'আমি কল্পনা করতে পারি, সেই তরুণ বয়সে আমার মায়ের মূল্য হিরার চেয়ে কম ছিল না। সাধারণ কোনো মেয়ে হলে খোলা বাজারে বিক্রি হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি রাজা-বাদশাহদের পছন্দের জিনিস ছিলেন।

'সে-সময় মিসর ও শামে রোমানদের শাসন ছিল আর রাজা ছিলেন ফোকাস। রাজার মতো রাজা ছিলেন তিনি। সারাক্ষণ বিলাসিতায় ডুবে থাকতেন। নিজেকে খোদা মনে করতেন এবং মানুষ তাকে সেজদা করত।

'দস্যুরা তার কাছে পৌঁছার মতো সুযোগ অর্জন করে আমার মায়ের একটা ঝলক তাকে দেখাল। দেখে তিনি আত্মহারা হয়ে গেলেন। এমন নারী বোধহয় জীবনে আর দেখেননি। মুখ-চাওয়া দামে তিনি আমার মাকে ক্রয় করে নিলেন।

'সেসব রাজা-বাদশার বিয়ের ধার ধারতে হতো না। যখন যে-নারীকে ভালো লাগত, তাকেই সাময়িক বা স্থায়ী রক্ষিতা বানিয়ে মহলে রেখে দিতেন। কিন্তু সম্রাট ফোকাস আমার মায়ের রূপ-যৌবনে এতই প্রভাবিত হলেন যে, তিনি তাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিবাহ করে নিলেন। কিন্তু আমার মা একবিন্দুও খুশি হলেন না যে, তিনি এমন একজন প্রতাপশালী রাজার রানি হয়ে গেলেন। বয়সইবা তার কী ছিল। পিতা ও ভাইদের কথা তার মনে পড়ত এবং নির্জনে বসে-বসে কাঁদতেন।

'তার আরেকটা ব্যথা এই ছিল যে, তিনি মুসলমান ছিলেন। পিতামাতা অল্প কদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা কোনো প্রলোভন বা কোনো রকম চাপের কাছে নতি স্বীকার করার মতো মানুষ ছিলেন না। এই ধর্মটির প্রতি তিনি

আন্তরিকভাবেই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন। আমার মা তখন খুব ছোট ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন, তার যখন ভালো-মন্দ বুঝবার মতো বয়স হলো, তখন তাকে ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানদান শুরু হলো। ইসলাম তার শিরায়-শিরায় ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে, তিনি অপহৃতা হয়ে গেলেন এবং একজন খ্রিস্টান রাজার স্ত্রী হয়ে গেলেন। রাজা-বাদশাহদের কোনো ধর্ম থাকে না। আমার মায়ের এও একটা বেদনা যে, তিনি মুসলমানও থাকতে পারলেন না। কিন্তু তিনি খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করলেন না।

'আমি জন্ম নিলাম এবং রাজকন্যাদের মতো প্রতিপালিত হলাম। এতে কোনো সংশয় ছিল না যে, আমি একজন রাজকন্যা। যখন তিন-চার বছর বয়স হলো, আমার মনে আছে, তখন আমার মাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে নামায পড়তে দেখেছি। কিন্তু আমার বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছর হলো, তখন দেখলাম, মা আমার মদপান করছেন এবং নামায ছেড়ে দিয়েছেন। শয়তানদের রাজমহলে অবস্থান করায় তার প্রকৃতি-ই বদলে গেল এবং তিনিও শয়তান-স্বভাবের মানুষ হয়ে গেলেন। আমি তোমাকে সেসব ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও রাজনীতিবাজির উপাখ্যান শোনাচ্ছি না, যেগুলো রাজা-বাদশাহদের প্রাসাদের সাধারণ কর্ম। আমার মা আমাকে এসব ইবলিসি আচরণ– তার নিজেরও, সম্রাট ফোকাস-এর অন্যান্য স্ত্রীদেরও– আমাকে সবিস্তার শুনিয়েছেন।

'তুমি তো জান, ইরানিরা অগ্নিপূজক জাতি এবং রোমের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো একটি সামরিক শক্তি। আমি ভেবে বিস্মিত হই, মুসলমানরা এই ইরানিদের কীভাবে ইরাক থেকে উচ্ছেদ করে পঙ্গু বানিয়ে বসিয়ে দিল! তারা হঠাৎ রোম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ করে বসল আর দেখতে-না-দেখতে মিসর ও শাম দখল করে নিল আর সম্রাট ফোকাস স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল!

'হেরাক্‌ল রোম সাম্রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন। সেনাপতি তো আরও ছিল। কিন্তু হেরাক্‌ল ছিলেন সবার উপরে ও সবচেয়ে বিখ্যাত। কারণ, সামরিক যোগ্যতা ও দক্ষতায় তার সম্মুখে দাঁড়াবার মতো কেউ ছিল না। তার খ্যাতি ও মর্যাদার আরও একটি কারণ এই ছিল যে, তিনি রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন। ইরানিরা রোমানদের পরাজিত করেছে এ-বিষয়টা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। তিনি জানতেন, এই পরাজয়ের প্রকৃত কারণ সম্রাট ফোকাস-এর বিলাসী রাজত্ব। ইরানিদের তিনি সব সময় হিসাবের বাইরে রেখেছেন এবং আপন সাম্রাজ্য সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন।

'আমার বয়স তখন ছয় কি সাত বছর। এই বয়সের শিশুর অতটা বোঝে না, যতটা বুঝ আমার মস্তিষ্কে বসে গিয়েছিল। শত্রুরা আমাদের এই বিশাল সাম্রাজ্য থেকে উৎখাত করে দিয়েছে, আমার বয়সী শিশুরা এই বিষয়টা মাথায়ই নেইনি। এ-বিষয়ে

তারা পুরোপুরি উদাসীন ছিল। কিন্তু এই পরাজয়ে আমি অতটা ব্যথিত হয়েছি, যতটা ব্যথা পেয়েছিলেন সম্রাট হেরাক্ল। হেরাক্ল আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমার মায়ের সঙ্গে তার খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। প্রথম-প্রথম যখন মা হেরাক্ল-এর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন কিংবা হেরাক্ল আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তখন মা আমাকে সাথে রাখতেন। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মা আমাকে দুজনের মধ্যখান থেকে সরিয়ে দিলেন। বড় হয়ে আমি জানতে পারলাম, আমার মা হেরাক্ল-এর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছেন। অবশ্য এটি কোনো বিরল ঘটনা ছিল না। রাজপ্রাসাদগুলোতে এ-জাতীয় সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব সচরাচর ছিল। সম্রাট ফোকাস তো আর অত খবর রাখতেন না।

'আমি বড় হয়ে জানতে পেরেছি, হেরাক্ল সম্রাট ফোকাসকে ইরানিদের উপর জবাবি আক্রমণ চালানোর জন্য খুব উসকানি দিতে থাকেন। কিন্তু ফোকাস বিষয়টি বরাবরই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে হেরাক্ল সম্রাট ফোকাসের সিংহাসন উলটে দেওয়ার ষড়যন্ত্র আঁটলেন। এ-লক্ষ্যে তিনি অন্যান্য সেনাপতিদেরও দলে ভিড়িয়ে নিলেন। সম্রাট ফোকাস এই পরাজয়ের দায়ভার সব সময় সেনাপতিদের উপর চাপাতেন। ফলে তারাও সম্রাটের উপর ক্ষুব্ধ ছিল। এবার প্রতিশোধ নিতে তারা হেরাক্লের দলে যোগ দিল। তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

'হেরাক্ল ভেবেছিলেন, তিনি যদি ফোকাস-এর সিংহাসন উলটে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তা হলে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবে এবং তাতে সাম্রাজ্যের বেশ ক্ষতি হবে। আর এই গৃহযুদ্ধ ছাড়া ফোকাসকে ক্ষমতাচ্যুত করার একটামাত্র পথ হলো, কোনো এক উপায়ে তাকে হত্যা করতে হবে।

'কিন্তু সম্রাট ফোকাসকে হত্যা করা অসম্ভবের মতো বিষয়। তিনি সব সময় বিলাসিতায় ডুবে থাকেন এবং তার চার পাশে দেহরক্ষীদের প্রাচীর দাঁড়িয়ে থাকে। আমার ধারণা, সম্রাট জেনে ফেলেছিলেন, তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলছে। হেরাক্ল-এর সঙ্গে তার সম্পর্কে টানাপড়েন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সম্রাট ফোকাস হেরাক্লকে ভয় করতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'আমার মা হেরাক্ল-এর সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন এবং তাদের বন্ধুত্ব আগেরই মতো চলছিল। কিন্তু হেরাক্ল আমার মাকে তার পরিকল্পনার কথা কখনও বলেননি। একদিন মা সন্দেহের উপর ভিত্তি করে জিজ্ঞাসা করলে হেরাক্ল অস্বীকার করলেন। মা তাকে বললেন, লোকটার প্রতি আমার মনে এতটাই ঘৃণা জন্মে গেছে যে, আমি তাকে হত্যা করার ভাবনা ভাবছি। কিন্তু এর জন্য আমার কারও পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। এবার হেরাক্ল তার গোমর ফাঁস করে দিলেন। বললেন, ঠিক আছে, তুমি তাকে যেকোনো উপায়ে হত্যা করো; আমি তোমাকে সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতা দেব।

'মা প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং কীভাবে সম্রাটকে হত্যা করা যায় ভাবতে লাগলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাকে বিষ পান করাবেন। বিষয়টা হেরাক্‌লকে অবহিত করা হলো। আমার মায়ের জন্য কাজটা খুব সহজ ছিল। হেরাক্‌ল এমন এক ধরনের বিষ সংগ্রহ করে আমার মায়ের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন, যে কাজ করে ধীরে-ধীরে। ভেতর থেকে দেহটা কুরে-কুরে খেয়ে ফেলে এবং বারো থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে আক্রান্ত মানুষটা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু তথ্যটা কেউ জানতে পারে না, লোকটা কীসে মারা গেল। ডাক্তাররাও ব্যাপারটা ধরতে না পেরে বলে দেন, এ রহস্যময় একটা ব্যাধি।

'একরাতে আমার মা মদের সঙ্গে মিশিয়ে সম্রাট ফোকাসকে এই বিষ খাইয়ে দিলেন। পরদিন হেরাক্‌লকে সংবাদ জানালেন, বিষ সম্রাটের পেটে চলে গেছে। হেরাক্‌ল ফৌজের কমান্ডার-ইন-চিফ ছিলেন। গোটা বাহিনীর উপর তার আদেশ চলত। তিনি বাহিনীর কিছু সৈনিককে আলাদা ডেকে আদেশ দিলেন, তোমরা রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলো। সঙ্গে-সঙ্গে তার আদেশ পালিত হলো। হেরাক্‌ল সম্রাটের কাছে গিয়ে বললেন, আপনি ক্ষমতা থেকে ইস্তফা দিন এবং রাজক্ষমতা আমার নামে লিখে দিন।

'সব কজন সেনাপতি-ই হেরাক্‌ল-এর দলে যোগ দিল। কিন্তু হেরাক্‌ল পরে জানতে পারলেন, দুজন সেনাপতি মূলত ফোকাসের সমর্থক। ফৌজের বিপুলসংখ্যক সদস্যকে তারা সম্রাট ফোকাসের ব্যক্তিগত বাহিনী বানিয়ে রেখেছে।

'তারা হেরাক্‌ল-এর পরিকল্পনা জেনে ফেলল। ফলে তারা ফৌজের যে-অংশটি তাদের অনুগত ছিল, তাদের তৈরি করে নিল। তারা প্রাসাদ অবরোধকারী বিদ্রোহী সেনাদের উপর আক্রমণ চালাল। হেরাক্‌ল-এর সৈন্যরা জোরালোভাবে তাদের মোকাবেলা করল।

'হেরাক্‌ল দেখলেন, সম্রাটের দেহে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং তিনি ভেতরে-ভেতরে কষ্ট পেতে শুরু করেছেন। হেরাক্‌ল তাকে বললেন, আপনার আয়ু আর বেশি বাকি নেই। জীবনের আর কয়েকটা দিন অবশিষ্ট আছে মাত্র। কাজেই আপনি আমার নামে ফরমান লিখে দিন এবং নিজে সম্মানের মৃত্যু বরণ করুন। তারপর হেরাক্‌ল হুমকির সুরে বললেন, কিন্তু যদি আপনি তা না করেন, তা হলে আপনার লাশ শহরের অলি-গলিতে ঘোরানো হবে এবং পরে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হবে। হেরাক্‌ল চিন্তা করলেন, বিদ্রোহ তখন শুরু করা হবে, যখন সম্রাট ভেতর থেকে দুর্বল হতে শুরু করবেন।

'হেরাক্‌ল-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল বেশি হাজার। তিনি সম্রাটের সমর্থক সেনাপতি দুজনকে নির্জনে ডেকে বললেন, আমি জানতে পেরেছি, সম্রাট এমন একটা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন, যার কোনো নিরাময় নেই। এই রোগ

থেকে তিনি সেরে উঠবেন না এবং খুবসম্ভব আট-দশদিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। কাজেই ভালো হবে, আপনারা আমার সঙ্গে চলে আসুন এবং এই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটুক। অযথা নিজেরা-নিজেরা প্রাণহানি ঘটিয়ে লাভ কী। কিন্তু তারা এই প্রস্তাবে সম্মত হলো না। সম্রাটের উপর তাদের প্রবল আস্থা ছিল এবং তার সমর্থন ও সহযোগিতার বিনিময়ে পুরস্কার লাভের আশা পোষণ করছিল। ফলে হেরাক্‌ল-এর কোনো কথা-ই তাদের মাঝে ক্রিয়া করল না।

'তারা সম্ভবত ভুলে গিয়েছিল, হেরাক্‌ল-এর মস্তিষ্ক অত্যন্ত প্রখর এবং তার বিছানো জাল কারও চোখে পড়ে না। যে-ই আসে, সে-ই তার ফাঁদে আটকে যায়। হেরাক্‌ল এমন চাল চালল যে, দুই সেনাপতি তার ফাঁদে এসে পড়ল। তিনি তাদের গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তাদের যে-কজন সৈনিক ছিল, তারা বেকার হয়ে পড়ল। হেরাক্‌ল তাদের হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন, যদি তোমরা অস্ত্রসমর্পণ না কর, তা হলে আমি তোমাদের একজনকেও জীবিত রাখব না। এখন যখন তাদের কমান্ড দেওয়ার মতো কেউ রইল না, তখন তারা অস্ত্রসমর্পণ করল।

'আরও তিন-চার দিন কেটে গেল। বিষের ক্রিয়ায় ফোকাসের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। এবার তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। অবশেষে হেরাক্‌ল তাকে নিজের পক্ষে শাহী ফরমান লিখে দিতে বাধ্য করলেন।

'সম্রাট ফোকাস বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছেন। সুস্থতা ও জীবনের ভিক্ষা চাইছেন তিনি। বিলাসিতাপুজারি মানুষ এই জগত থেকে সহজে যেতে চায় না। ফোকাস হেরাক্‌ল-এর কাছে অনুনয়-বিনয় করলেন, তুমি চিকিৎসা করিয়ে আমাকে সুস্থ করে তোলো। তিনি বলছিলেন, আমার শরীরটা ভেতর থেকে কেটে টুকরা-টুকরা হয়ে যাচ্ছে। একটা জীবন্ত লাশে পরিণত গিয়েছিলেন তিনি। ডাক্তার অন্ধকারে হাত-পা ছুড়ছিলেন। কোন ব্যাধিটা সম্রাট ফোকাসকে এভাবে ভেতর থেকে খেয়ে ফেলছে, তারা ধরতে পারছিলেন না। হেরাক্‌ল তাকে আশ্বাস দিলেন, ঠিক আছে; আমি আপনাকে চিকিৎসা করাব এবং আপনি ঠিক হয়ে যাবেন। কিন্তু শর্ত হলো, ফরমান জারি করে দিন।

'আরও একটা দিন কেটে গেল। ফোকাস অনুভব করতে লাগলেন, তার শরীরের ভেতরটায় যেন আগুন ধরে গেছে। এই অবস্থায় হেরাক্‌ল তার থেকে ফরমান লিখিয়ে নিলেন এবং ঘোষকের মাধ্যমে রাজ্যময় এই ফরমান ঘোষণা করিয়ে দিলেন।

হেরাক্‌ল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন এবং ফোকাসকে রাজকীয় মর্যাদায় মহলেই থাকতে দিলেন। তিনি জানতেন, ফোকাস আর দু-চারদিনের মেহমানমাত্র। হলোও তা-ই। একদিন সম্রাট ফোকাস জীবনের শেষ প্রশ্বাসটি গ্রহণ করলেন এবং

চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। হেরাক্ল রোমের সিংহাসন সামলে নিলেন এবং ফোকাস-এর রাজপরিবারকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিলেন।

'হেরাক্ল আমার মায়ের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন। তিনি মাকে বিবাহ করে নিলেন। কিন্তু এই বিয়ের মাধ্যমে পরিবর্তন শুধু এটুকু হলো যে, হেরাক্ল-এর স্ত্রীর সংখ্যা একজন বেড়ে গেল। এই বিবাহও একজন রাজার বিবাহ ছিল। কিন্তু এই বিবাহে আমার মায়ের খুব গর্ব ছিল। হেরাক্ল কিছু দিন তাকে বেশ মর্যাদা দিলেন। তার বিশেষ কারণটি ছিল, মা যদি ফোকাসকে বিষপান না করাতেন, তা হলে আর পক্ষে ফোকাসের সিংহাসন উলটানো সম্ভব ছিল না।

'আমার অনুভূতি জেগে গিয়েছিল। আমার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল আমার মায়ের। তিনি নিজেকে হেরাক্ল-এর মহারানি ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং উঠতে-বসতে সব সময়ই বলতেন, ইরানিদের উপর জবাবি আক্রমণ চালিয়ে মিসর ও শামকে পুনর্বার রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। হেরাক্ল-এরও প্রত্যয় এটি-ই ছিল। আর একথাটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এরই জন্য হেরাক্ল ফোকাসকে ক্ষমতাচ্যুৎ করে নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন।

'আমার উপর তার প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, আমার মধ্যে জাতীয় মর্যাদাবোধ জেগে গেল। আমি এতটা-ই উজ্জীবিত হয়ে উঠলাম, মনে আকাঙ্ক্ষা জাগতে লাগল, মেয়ে হয়ে জন্মানোর পর এখন তো আমার পক্ষে পুরুষ হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার পক্ষে তো আর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কাজ করার সুযোগ নেই। কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করার পর আমি আমার মতো মেয়েদের নিয়ে একটি নারীফৌজ গঠন করব এবং তাদের নিয়ে ইরানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। এভাবে আমার মধ্যে সামরিক চেতনা জাগ্রত হতে লাগল এবং এটি-ই আমার স্বভাবে পরিণত হয়ে গেল।

হেরাক্ল যখন বাহিনী গঠন করে ইরানিদের উপর আক্রমণ চালালেন, সে-সময় আমি শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে পা রাখি। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। বিপুল হতাহতের ঘটনা ঘটল। হেরাক্ল অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। কয়েকটি বছর সময় ব্যয় করে তিনি তার বাহিনীটি প্রস্তুত করেছেন। অবশেষে ইরানিদের পা উপড়ে গেল। তারা পিছপা হতে-হতে মিসরও খালি হয়ে গেল, শামও খালি হয়ে গেল। এই দুটি রাজ্য আরেকবার রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

'হেরাক্ল-এর চোখে আমার মায়ের মর্যাদা নিঃশেষ হয়ে গেল। সম্রাটের বোধহয় এতটুকুই মনে ছিল যে, তিনি এই মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। পরাজিত ইরানিদের অনেকগুলো সুন্দরী ও রূপসী তরুণী-যুবতী রোমানদের হাতে এসেছিল। তাদের কয়েকজনকে হেরাক্ল-এর হেরেমে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। তত দিনে আমার মায়ের যৌবনে ভাটা পড়তে শুরু করেছিল। হেরাক্ল রাজা ছিলেন বটে; কিন্তু

ফোকাস-এর মতো ছিলেন না। তার আসল পরিচয় ছিল, তিনি একজন সেনাপতি, একজন লড়াকু। যুদ্ধকৌশল ও রণবিদ্যায় তিনি বেশ নাম করেছিলেন যে, তিনি একটি ভয়ংকর শক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন।

'আমি আমার মাকে মনমরা ও উদাসিনী দেখতে শুরু করলাম। সম্ভবত তারই ক্রিয়া ছিল যে, আমার মনে পড়তে শুরু করল, আমি আমার মাকে একসময় লুকিয়ে-লুকিয়ে নামায পড়তে দেখেছি। এক তো এই চেতনা বা অনুভূতি, অপরদিকে আমার মাঝে সামরিক চেতনা জেগে গিয়েছিল। আমি শুধু এটুকুই কামনা করতাম না যে, কোনো একজন সুদর্শন রাজকুমার আমাকে বিয়ে করে নেবে আর আমি তার রানি হয়ে জীবন যাপন করব। আমার অস্তিত্বে কেমন এক ধরনের আগুন ধরে গিয়েছিল তোমাকে আমি তা বলে বোঝাতে পারব না।'

* * *

শারিনার মস্তিষ্ক সেই আগুন বুঝতে ব্যর্থ ছিল, যেটা তার অস্তিত্বে জ্বলে উঠেছিল। হাদীদ তার এই উপাখ্যান শুনে যাচ্ছে। দুটা ঘোড়া পাশাপাশি মধ্যম গতিতে চলছে। সূর্য দিনমানের সফর শেষ করে দিগন্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। পার্বত্য এখাকার টিলা-টিপিগুলো একটা আরেকটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হাদীদ মাথায় গন্তব্য ঠিক করে রেখেছে আন্তাকিয়া। চল্লিশ-পঞ্চাশ পা পরপর টিলা-টিপি ঘোড়ার মোড় পালটে দিচ্ছে। কিন্তু হাদীদ তার দিকটা মাথা থেকে হারাতে দিচ্ছে না।

শারিনা অনর্গল বলে যাচ্ছে। তার কণ্ঠে জলতরঙ্গের মতো বাজনার সুরও আছে, আবেগের জ্বলনও আছে। ভেতরের এই আগুনটা আসলে কী! শারিনা যখন বিষয়টা নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করল, তখন তার মাথাটা ঘুলিয়ে গেল এবং তার জিহ্বায় জড়তা এসে গেল। মেয়েটা তার সমস্ত অতীত বিবৃত করেছে। কিন্তু তার চিন্তা-চেতনায় যে-বিপ্লব এসেছিল, তার সঠিক বিবরণ দিতে সে ব্যর্থ হলো। শারিনা জানে না, তার এই বিপ্লব মহান আল্লাহর বিরাট এক নেয়ামত, যেটি ভ্যাগ্যবানরা ব্যতীত আর কেউ পায় না।

শারিনা নিরতিশয় সুন্দরী ও যুবতী এক রাজকন্যা। কিন্তু সে আপন অস্তিত্ব, স্বভাব-চরিত্র ও চিন্তা-চেতনাকে রাজসিকতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছে। রাজকীয়তার অর্থ হলো আল্লাহর বান্দাদের মাটির কীট মনে করা, বিলাসিতা আর ফেরাউনি চরিত্র। শারিনা না প্রেম-ভালবাসার খেলা খেলেছে, না নিজের রূপ-যৌবনকে দাবার গুটির মতো ব্যবহার করেছে।

মেয়েটা সেই চেতনা ও অনুভূতির মাঝে ফেঁসে যেতে লাগল, যেটি তার চিন্তা-চেতনাকে জাগিয়ে তুলছিল।

শারিনা হাদীদকে তার সৌভাগ্যের যে-উপাখ্যান শোনাচ্ছিল, সেটি মূলত এই পুরো ভূখণ্ডেরই কাহিনী। আজ যে-অঞ্চলটাকে ইরাক ও শাম বলা হয়, সেটা মিথ্যার

পুজারিদের অতিশয় নির্মম কব্জায় চলে এসেছিল। ইরাকের উপর অগ্নিপুজক ইরানিদের দখল ছিল। শাম ও মিসর রোমানদের কব্জায় ছিল। ইরানিরা আগুনপূজা করত আর রোমানরা– যারা হযরত ঈসা (আ.) কে শূলিতে চড়িয়েছিল– খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিল। বাইতুল মুকাদ্দাসকে তারা সারা পৃথিবীর খ্রিস্টানদের জন্য কাবার মতো একটি পবিত্র ভূমিতে পরিণত করে রেখেছিল। মসজিদে আকসাকে তারা তাদের উপাসনালয় মনে করত।

শারিনা হাদীদকে সঠিকই শুনিয়েছিল যে, ইরানিরা রোমানদের থেকে শাম ও মিসর ছিনিয়ে নিয়েছিল। এটি ৬১৪ সালের ঘটনা। সে-সময় রোমের সম্রাট ছিলেন ফোকাস। তিনি তার বিলাসী জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এত বড় পরাজয়কে তিনি অতি সহজেই হজম করে নিয়েছিলেন।

ফোকাস শুধু বিলাসিতার মাঝেই নিমজ্জিত ছিলেন না; তিনি তার প্রজাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনও শুরু করে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ এবং ইরানিদের থেকে মিসর ও শামকে উদ্ধার করার কল্পনাও তার মাথায় ছিল না। এ-বিষয়ে কোনো কথা না তিনি নিজে বলতেন, না অপর কেউ বললে শুনতেন। এটি তার ভাবনার কোনো বিষয়ই ছিল না। তিনি যখন দেখলেন, জনাসধারণ ফুঁসে উঠছে এবং তারা বিক্ষোভ-প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে, তখন আপন দেশের জনসাধারণকে গোলাম বানানোর মতলব আঁটলেন। মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য তিনি সেনাবাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন। তারা প্রজাদের উপর নিপীড়ন চালাতে শুরু করল।

শারিনা হাদীদকে হেরাক্‌ল-এর বিদ্রোহের কাহিনী ঠিক-ঠিক বর্ণনা করল। সেই বিদ্রোহের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে আজও বিদ্যমান আছে। হেরাক্‌ল শারিনার মায়ের হাতে ফোকাসকে বিষ পান করিয়ে বিদ্রোহ করলেন এবং সফল হলেন। তিনি নিজে রোমের সিংহাসনে বসলেন। তারপর ৫২৫ সালে মিসর ও শামের উপর এমন আক্রমণ চালালেন যে, ইরানিদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং এই দুটি রাজ্যকে পুনর্বার রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বানিয়ে নিলেন। তার পর আর ইরানিরা রোমানদের সঙ্গে টক্কর লাগাতে সাহস করেনি।

সে-সময়কার ঐতিহাসিকরা মন্তব্য করেছেন, কারও কল্পনায়ও এমন কোনো চিন্তা বা আশঙ্কা ছিল না যে, তৃতীয় আরেকটি শক্তি উঠে এসে এই দুই শক্তির কোনো একটিকে কুপোকাত বা দুর্বল করতে পারে। পরাশক্তি বলতে সে-যুগে এই দুটি-ই ছিল, যার একটিকে 'কায়সারে রোম' আর অপরটিকে 'কেসরায়ে ইরান' বলা হতো। কিন্তু একটি তৃতীয় শক্তির উত্থান ঘটল। এটি শুধু সামরিক শক্তি-ই নয়– একটি আদর্শিক শক্তিও বটে। প্রথম-প্রথম যখন ইরান ও রোমের রাজপ্রাসাদগুলোতে এই শক্তির সংবাদ পৌঁছল, তখন তারা বলল, এরা আরব সাহারার লুটেরা বেদুঈন। তারা ঠাট্টাচ্ছলে সংবাদটি উড়িয়ে দিল।

কিন্তু এই তৃতীয় শক্তিটি দিগন্ত থেকে অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের মতো উঠে এল। এটি অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ছিল কম, আদর্শ ও চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল বেশি। এটি এমন একটি বাহিনী, যার সৈন্যসংখ্যা নগণ্য; কিন্তু আল্লাহপাক তাঁদের এমন একটি শক্তি দান করেছেন, যাকে তারা ঈমানি শক্তি বলে আখ্যায়িত করে।

আরবের মরু-অঞ্চল থেকে এই যে-বাহিনীটি উঠে এল, তার সেনাপতিদের অন্তরে রাজ্য ও ক্ষমতার মোহ ছিল না। বরং তাঁরা আল্লাহর এই বার্তাটি নিয়ে বের হয়েছিলেন যে, পৃথিবীকে শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর এক বান্দা আরেক বান্দাকে গোলাম বানাতে পারে না। আল্লাহপাক এই বার্তাটি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে অবতারণ করেছেন। আল্লাহর এই রহস্যময় বান্দারা মিথ্যার অবসান ঘটাতে, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে, বিশ্বমানবতাকে অন্যায়-অবিচার থেকে রক্ষা করতে এবং বান্দাকে বান্দার হক শেখাতে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

এই শক্তিটি এমনভাবে উত্থিত হলো যে, প্রবল ঝড়োহাওয়া যেভাবে খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে যায়, এই শক্তিটিও তেমনি মিথ্যার শক্তিগুলোকে উড়িয়ে-ভাসিয়ে নিয়ে গেল। যে-রাজা-বাদশাহদের অপরাজেয় মনে করা হতো, এই বাহিনী তাদের উপর বজ্রের মতো এসে আপতিত হলো। তারপর আকাশ দেখেছে, পৃথিবী দেখেছে, জগতের বড়-বড় শক্তিগুলোর মাঝে মুষ্টিমেয় এই মুজাহিদ বাহিনীটির সামনে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এই মুজাহিদদেরই ইরানি ও রোমানরা 'আরব বেদুঈন' বলে মশকারা করেছিল এবং হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। ইরাক ও শামের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। আল্লাহর পয়গাম এই ভূখণ্ডগুলোতে পৌঁছে গেল।

আর এখন হেরাক্ল পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও এমন একটা ঠাঁই পাচ্ছেন না, যেখানে তিনি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারেন।

এটি ৬৩৪ ও ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের চিত্র।

* * *

শারিনা ও হাদীদের ঘোড়াদুটো আপন গতিতে এগিয়ে চলছে। তারা দুপুরে একস্থানে বসে বিশ্রাম নিল এবং ঘোড়াগুলোকে উন্মুক্ত ছেড়ে দিল, যাতে ওরা ইচ্ছেমতো পানাহার করতে পারে। শারিনা সঙ্গে করে খাদ্য-পানীয় নিয়ে এসেছে। দুজনে খাবার খেল এবং পুনরায় রওনা হলো।

শারিনার কাহিনী এখনও শেষ হয়নি। সে হাদীদকে বিগত দিনগুলোর সেই উপাখ্যান ও ঘটনাবলি শুনিয়ে যেতে লাগল, যার সে নিজে প্রত্যক্ষদর্শী। এই সামান্য বয়সে মেয়েটা সময়ের অনেক বিবর্তন ও উত্থান-পতন দেখেছে। সেসব তার উপর যে-প্রভাব তৈরি করেছে, হাদীদকে তার বিবরণ শুনিয়ে যাচ্ছে।

'জান হাদীদ! হেরাক্ল-এর পরাজয়ের আসল কারণটা কী?'– শারিনা বলল– 'তিনি যখন সম্রাট ফোকাসকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন জনগণ খুব খুশি হয়েছিল। দেশের মানুষ সম্রাট ফোকাস-এর নির্যাতন-জ্বালাতনে অতিষ্ঠ ছিল। এমনকি কিছু লোক দেশ ছেড়ে স্থায়ীভাবে চলেও গিয়েছিল। তারা এই ভেবে উৎফুল্ল হয়েছিল যে, এবার হেরাক্ল ইরানিদের পরাজিত করবেন এবং রোমের হৃতগৌরব ফিরে আসবে। আমরা রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাব এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত ও নিরাপদ হবে। রোমানদের মাথা পুনরায় উঁচু হয়ে যাবে।

'জনতার খুশি হওয়ার আরেকটি কারণ ছিল, সম্রাট ফোকাস তার বিলাসিতার অর্থ জনগণের রক্ত চুষে জোগান দিতে শুরু করেছিলেন। মানুষ দিন-দিন নিঃস্ব হতে চলছিল। ফলে জনমনে তার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহে রোমের ফৌজ যদি হেরাক্লকে সঙ্গ না-ও দিত, তবু জনতা এসে তার পাশে দাঁড়াত এবং ফোকাসকে ক্ষমতাচ্যুত করেই ছাড়ত। বিদ্রোহের দিন রাজসেনারা কোথাও-কোথাও জনতার উপর চড়াও হয়েছিল। কিন্তু তারা সফল হয়নি। কারণ, জনতা অস্ত্রহাতে হেরাক্ল-এর পক্ষে রাস্তায় নেমে এসেছিল। এই বিদ্রোহে যে-রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল, তাতে বিপুলসংখ্যক অসামরিক লোকও প্রাণ হারিয়েছিল, যারা বিদ্রোহী বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল।

'ফোকাসকে ক্ষমতাচ্যুত করে হেরাক্ল সিংহাসনের আরোহণ করার পর জনতা বিজয়োল্লাস করেছিল। হেরাক্লও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দান করেছিলেন। অনেক মানুষ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।

'তুমি তো জান হাদীদ! সৈনিকরা বেতন-ভাতার জন্য যুদ্ধ করে। তাদের মনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভ থাকে। তাদের মাঝে চেতনা বলতে কিছু থাকে না। ফল এই দাঁড়ায় যে, শত্রুপক্ষের সামান্য চাপও তারা সহ্য করতে পারে না। আপন জীবনের ঝুঁকি সামনে এলে তারা পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু হেরাক্ল যখন ইরানিদের উপর আক্রমণ চালালেন, তখন তার সৈন্যরা জীবনের বাজি লাগিয়ে যুদ্ধ করল। তাদের অন্তরে বেতন-ভাতা বা গনিমতের মোহ ছিল না। ছিল অপার জাতীয় চেতনা। এই চেতনা যদি না থাকত, তা হলে ইরানিদের পরাজিত করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল।

'হেরাক্ল শামও জয় করলেন, মিসরও জয় করলেন। রোমানরা এই বিজয়ের উল্লাস এমনভাবে পালন করল, যেন আনন্দ তাদের পাগল বানিয়ে দিয়েছিল। তারা খুশিতে বাগবাগ হয়ে গেল।

'হেরাক্ল শাম ও মিসরের ব্যবস্থাপনা বহাল করে ফেললেন। অল্প কদিনের মধ্যেই জনজীবন স্বাভাবিক হয়ে গেল। পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এই যুদ্ধের ফলে সেনাবাহিনীতে যে-ঘাটতি তৈরি হয়েছিল, নতুন ভর্তি দিয়ে হেরাক্ল সেটি পূরণ করে নিলেন।

'কিন্তু হেরাক্ল যখন দেখলেন, তার রাজত্বে এখন কোনো দিক থেকেই কোনো হুমকি নেই, এবার তিনি জনগণের ঘাড়ে করের বোঝা চাপাতে শুরু করলেন। ইরানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তার বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছিল। রাষ্ট্রের কোষাগার শূন্য হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া রাজপরিবারের সদস্যদের বিলাসিতা তো করতে হয়। এসব পুষিয়ে নিতে হেরাক্ল ঠিক সেভাবে প্রজাদের রক্ত চুষতে শুরু করলেন, যেভাবে চুষেছিলেন ক্ষমতাচ্যুত সম্রাট ফোকাস। করারোপের আগে শাম-মিসরের জনগণও হেরাক্লকে পছন্দ করত। কিন্তু এবার তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

জনতা আবার নিঃস্ব হতে শুরু করল।

'হেরাক্ল আপন ধর্ম খ্রিস্টবাদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। সেকালে খ্রিস্টধর্ম কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি দল যদি আপন-আপন বিশ্বাস অনুসারে উপাসনা করত এবং অন্য কোনো সমস্যা না থাকত, তা হলে এদিকে হেরাক্ল-এর চোখ যেত না। কিন্তু তিনি দেখলেন, এই দলগুলো একে অপরকে শত্রু মনে করছে এবং মাঝে-মধ্যে পরস্পরে বিবাদ-সংঘাতও বাঁধছে। তাতে মানুষ হতাহতও হচ্ছে। এটি এমন একটি পরিস্থিতি ছিল যে, বিষয়টি গৃহযুদ্ধেরও রূপ নিতে পারত। হেরাক্ল সব কটি উপদলের নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তারা সবাই আপন-আপন অবস্থানে অনড়। সবাই মনে করে, আমার বিশ্বাস, আমার দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক।

'হেরাক্ল সিদ্ধান্ত নিলেন, আমি এই দলাদলি নির্মূল করেই তবে ক্ষান্ত হব। তিনি একটি রাষ্ট্রীয় ধর্মের রূপরেখা তৈরি করলেন এবং আদেশ জারি করলেন, সকল উপদলের খ্রিস্টানরা এই ধর্মে এসে পড়ো। আমার সাম্রাজ্যে এটি ছাড়া আর কোনো ধর্মগোষ্ঠী থাকবে না। হেরাক্ল ধর্মীয় ফেরকাবাজিকে অপরাধ বলে সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু জনতা তার এই ঘোষণায় কর্ণপাত করল না। সরকারি ধর্মের প্রতি কেউই সমর্থন জানাল না। সবাই পূর্বেকার আপন-আপন বোধ-বিশ্বাসের উপর অটল থাকল।

'কোনো সাড়া না পেয়ে হেরাক্ল তার সেনাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন যে, তোমরা জনতাকে আমার সরকারি ধর্ম মেনে নিতে বাধ্য করো। কেউ প্রতিরোধ করলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করো। সেনাবাহিনী নাগরিকদের সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ শুরু করল। তাদের অভিযান নাগরিক নির্যাতনের রূপ নিল।

মানুষের ঘরে-ঘরে ঢুকে সুন্দরী মেয়েদের সম্ভ্রমহানি শুরু করল। পরে প্রচার করত, এই ঘরের লোকেরা ধর্মীয় ফেরকাবাজি থেকে বিরত হতে এবং সরকারি ধর্মকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

'একদিকে জনতা করের বোঝার তলে চাপা পড়ে কাতরাচ্ছিল। এবার জোরপূর্বক ধর্ম চাপানোর ফলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ল। সম্রাট হেরাক্ল-এর প্রতি জনরোষ তৈরি হয়ে গেল। মানুষ হেরাক্লকে ঘৃণা করতে শুর করল। তারা অনুশোচনার নিঃশ্বাস ছাড়তে আরম্ভ করল যে, একজন খারাপ সম্রাটের খাতিরে আমরা এত ত্যাগ স্বীকার করলাম!

'জনতার প্রতিক্রিয়া তখন সামনে এল, যখন তোমরা শামের উপর আক্রমণ চালালে। আমাদের রাজপ্রাসাদে যখনই মুসলমান নামটি আলোচনায় আসত, তখন সবাই হেসে উড়িয়ে দিত এবং অবজ্ঞার সাথে বলত, আরবের বদ্দুরা আক্রমণ করতে আসছে! তারা এ-ও বলাবলি করত, ওরা লুটেরা ও দস্যু; লুটপাট ছাড়া আর কিছু ওরা জানে না। কিন্তু আমি দেখলাম, হেরাক্ল-এর সৈন্যরা তাদের প্রথম আক্রমণটি-ই সহ্য করতে পারল না। এ তো আমিও কখনও স্বীকার করিনি, মুসলমানরা এত বড় শক্তিশালী হতে পারে যে, আমাদের বাহিনীকে তারা পরাজিত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ওদিকে তারা ইরানিদের তাড়িয়ে দিল আর এদিকে হেরাক্ল-এর পা-ও উপড়ে দিল।

'আমি প্রাসাদের বাইরে চলে যেতাম এবং মানুষকে জিজ্ঞেস করতাম, মুসলমান কেমন? তারা কীভাবে এত বড় শক্তিতে পরিণত হলো? ধীরে-ধীরে আমি মুসলমানদের সম্পর্কে জানতে শুরু করলাম। সবাই বলছিল, মুসলমান শুধু এক আল্লাহর শাসন মান্য করে এবং তারা মানবতার হিতকামী ও বন্ধু। আমি আমাদের এমন তিন-চারজন সেনা-অফিসারের দেখা পেয়েছি, যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছিল। তারা আমাকে বলেছে, মুসলমান যখন কোনো অঞ্চল জয় করে নিজেদের দখলে নিয়ে যায়, তখন তারা ওখানকার লোকদের বাড়ি-ঘরে লুটপাট করে না এবং কোনো নারীর গায়ে– সে যতই রূপসী হোক– হাত লাগানো তো দূরের কথা, তাদের পানে তাকানোকেও অন্যায় মনে করে। তা ছাড়া আমি তাদের আরও একটি গুণের কথা শুনেছি যে, তারা বিজিত অঞ্চলের নাগরিকদের উপর বাধ্যতামূলক একটি কর আরোপ করে দেয় এবং তার বিনিময়ে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। এখানকার লোকদের মাঝে হেরাক্ল-এর প্রতি ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। তারা যখন মুসলমানদের এই চরিত্র ও রীতি দেখল, তখন জনতা হাত বাড়িয়ে তাদের স্বাগত জানাল।'

'কিন্তু শারিনা!'– হাদীদ শারিনাকে থামিয়ে দিয়ে বলল– 'তোমাদের বাহিনীর পরাজয়ের কারণ শুধু এটি-ই নয় যে, এখানকার মানুষ হেরাক্লকে ঘৃণা করত এবং

তাদের অন্তরে মুসলমানদের ভালবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তুমি বোধহয় শোননি, মুসলমানরা কীরূপ বীরত্ব ও নির্ভীকতার সঙ্গে লড়াই করেছিল। শুনলে হয়ত তুমি অবাক হবে যে, প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে ও প্রতিটি লড়াইয়ে আমাদের সৈন্যসংখ্যা শত্রুবাহিনী অপেক্ষা চার থেকে পাঁচ গুণ কম থাকে।

'এই তথ্যও আমি শুনেছি'– শারিনা বলল– 'শুধু চরিত্রের কারণেই নয়– এই বীরত্বের কারণেও মুসলমান আমার কাছে খুব ভালো লাগে। আর এ-কারণেই আমি তোমার সঙ্গে এসে পড়েছি। সত্য হলো, হেরাক্‌ল মানুষটার প্রতি আমার এত ঘৃণা জন্মে গিয়েছে যে, এত দিন আমি নিজের মনের উপর জোর খাটিয়ে ওখানে বাস করেছি। আমার পুরোপুরি আস্থা ও আশা আছে, তুমি আমাকে ধোঁকা দেবে না।'

ধোঁকা-প্রতারণা আমাদের ধর্মে পাপ'– হাদীদ বলল– 'একজন নারীর সঙ্গে প্রতারণা করাকে তো আমরা গুরুতর অপরাধ মনে করি। অবশ্য আমি তোমাকে একথাটি বলে রাখা আব্যশ্যক মনে করি যে, তোমাকে আমি ভালবাসতে পারব বটে; কিন্তু সেই ভালবাসার জন্য আপন কর্তব্যকে বিসর্জন দিতে পারব না।'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি, আমাকে তুমি শুধু রাজকন্যা মনে করো না'– শারিনা বলল– 'তোমাকে দেখে আচমকা আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাসা কীভাবে জন্মে গেল, সে-কথাটি আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলতে আসিনি। তুমি আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছ। তোমার যে-গুণটি আমাকে তোমার অনুরক্তে পরিণত করেছে, তা হলো তোমার দুঃসাহসী উচ্চারণ। রোমের মহা প্রতাপশালী সম্রাটের চোখে চোখ রেখে তুমি পরম সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলেছ এবং একদম সত্য কথা বলেছ। তুমি জানতে, তুমি হেরাক্‌ল-এর কয়েদি এবং যেকোনো মুহূর্তে চাইলেই তিনি তোমাকে হত্যা করে ফেলতে পারেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুমি সেই কথাগুলোই বলেছ, যে-কথাগুলো ওই সময় বলা দরকার ছিল। হেরাক্‌ল-এর মুখের উপর এভাবে কথা বলার সাহস কারও হয় না। আমি মুসলমানদের চরিত্র সম্বন্ধে যা-যা শুনেছিলাম, তুমি তাকে সত্য প্রমাণিত করে দেখিয়েছ।'

হাদীদের প্রতি আসক্ত হওয়া শারিনার জন্য বিস্ময়কর কোনো বিষয় ছিল না। হাদীদ সুঠাম, সুদেহী ও সুদর্শন যুবক। মুখে অন্যরকম এক জৌলুস। এই জৌলুস সেই লোকদেরই মুখে থাকে, যারা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না।

* * *

শারিনা ও হাদীদ এখন যে-জায়গাটায় এসে পৌঁছেছে, এখানে একটা শঙ্কা এসে হাজির হলো। রোমান ফৌজের পরাজিত সৈনিকরা এমন শোচনীয়ভাবে পিছপা হয়েছিল যে, তারা আশপাশের কয়েকটা বনে এসে আত্মগোপন করেছিল। এখন তারা একজন-একজন, দুজন-দুজন বা চারজন-চারজনের দলে বিক্ষিপ্ত হয়ে এমন

কোনো শহরের দিকে যাচ্ছে, যেটা এখনও রোমানদের হাতে আছে। হাদীদ ও শারিনা দূর থেকে এমন তিনজন সৈনিককে দেখেছিল। কিন্তু সৈনিকরা তাদের দেখতে পায়নি। মাঝখানের দূরত্বটা বেশ ছিল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশের লাল সূর্যটা দিগন্তে পৌঁছে গেছে। কোনো একটা জায়গায় অবস্থান নিয়ে তাদের রাতযাপন করতে হবে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে হাদীদ হঠাৎ নিজের ঘোড়াটা দাঁড় করাল এবং শারিনার কাঁধে হাত রাখল। শারিনাও তার ঘোড়াটা থামিয়ে দিল। হাদীদ কানদুটো খাড়া করে রাখল। শারিনাকে বলল, আমি ঘোড়ার হ্রেষারব শুনতে পাচ্ছি। আর বোধহয় মানুষ কথা বলছে।

শব্দটা যেদিক থেকে আসছিল, হাদীদ ও শারিনা সেদিকে তাকাল। ওদিকে ছোট-ছোট কতগুলো টিপি আছে, যেগুলো অতটা উঁচু নয় যে, একজন মানুষ তার পেছনে পুরোপুরি লুকোতে পারে। লম্বা-লম্বা সবুজ ঘাস আছে। বুনো লতাপাতাও আছে। আনুমানিক তিনশো পা দূরে হাদীদ ও শারিনা তিনজন মানুষের কাঁধ ও মাথা দেখতে পেল। লোকগুলো ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে আছে। ঘোড়ারগুলোর কান দেখা যাচ্ছে।

সূর্য এখনও পুরোপুরি ডোবেনি। এখনও এতটুকু আলো আছে যে, এতখানি দূর থেকে মানুষের আকার দেখা যাচ্ছে ও চেনা যাচ্ছে, ওরা মানুষ। হাদীদ ও শারিনা ঝটপট তাদের ঘোড়াগুলোকে এক দিকে ঘুরিয়ে দিল এবং কাছের টিপিটার পেছনে চলে গেল, যাতে ওরা দেখতে না পায়। তাদের আশা ছিল, ওরা তাদের দেখতে পায়নি। তারা উঁচু একটা টিলার আড়ালে চলে গেল এবং ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ওই লোকগুলোর মুখ পশ্চিম দিকে আর এরা যাচ্ছে পূর্ব দিকে।

হাদীদ ও শারিনা এখনও এক মাইল পথও অতিক্রম করেনি। এখানে তারা সুন্দর একটা জায়গা পেয়ে গেল। টলটলে পানির কূপও আছে। আশেপাশে উঁচু-উঁচু টিলাও আছে। টিলাগুলোতে সুন্দর-সুন্দর গাছ-গাছালি ও মনোহারী সবুজ ঝোপঝাড় আছে। টিলা ও কূপের মধ্যখানে বেশ খোলামেলা একটা জায়গা। সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ জায়গাটা বেশ মনোরম ও আরামদায়ক। রাতযাপনের বেশ উপযোগী জায়গা এটা।

তারা ঘোড়া থেকে নামল। হাদীদ দুটা ঘোড়ার পিঠ থেকে যিনগুলো খুলে ফেলল এবং ঘোড়াগুলোকে ঘাস-পানি খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিল। তারপর নিজে একধারে বসে পড়ল। শারিনা খাদ্যসামগ্রী বের করল।

* * *

সূর্য অস্ত গেছে অনেক সময় হয়ে গেছে। কিন্তু চাঁদের আলো রাতটাকে অন্ধকার হতে দেয়নি। সবুজ বনের জোসনা এতটাই স্বচ্ছ যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার অনুভূতি

কমই অনুভূত হচ্ছে। আহার শেষ করে হাদীদ ও শারিনা শোওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

'এবার নিশ্চিন্ত হয়ে যাও হাদীদ!'– শারিনা বলল– 'এখন আর আমাদের পেছনে কেউ আসবে না। একদম প্রশান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ো।'

'আমার কাছে তরবারি আছে'– হাদীদ বলল– 'আমার কোনো ভাবনা নেই। কেউ আসেও যদি জমে মোকাবেলা করতে পারব।'

'যে-তিন অশ্বারোহীকে আমরা দেখেছিলাম, ওরা আমাদের ফৌজের লোক'– শারিনা বলল– 'ভালোই হলো, ওরা আমাদের দেখেনি। এত দূর থেকে লোকগুলোকে আমি চিনতে পারিনি বটে; তবে সন্দেহ হচ্ছে, ওদের একজনকে আমি জানি। ও সামনের ঘোড়াটায় সাওয়ার ছিল। ওর মাথাটা ঝোঁকানো ছিল।'

'যারা-ই থাকুক; ওরা আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে'– হাদীদ বলল– 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, ওরা কোনো রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছে এবং কোনো শহরে যাচ্ছে।'

শারিনা ও হাদীদ শুতে লাগল। এমন সময় তারা কতগুলো ধাবমান পায়ের শব্দ শুনতে পেল। দুজনই চকিত হয়ে উঠে বসে কান খাড়া করে ওদিকে তাকাল। ওখানে একজন রোমান সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি কি দৌড়ে এসেছ?'– শারিনা জিজ্ঞেস করল– 'কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাচ্ছ?

'ক্ষুধার্ত'– রোমান সিপাই ভিখিরীর মতো বলল– 'মুসলমানরা আমাদের ফৌজের অনেক ক্ষতি করেছে। বাহিনীটা একদম তছনছ হয়ে গেছে। বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে। যে-কজন বেঁচে আছে, তারা এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেছে। মুসলমান বড়ই হিংস্র জাতি। পিছপা হয়েছে যে, আমাদের বলা হয়েছিল, ওরা আরবের বদ্দু এবং লুট-পাট করা ব্যতীত আর কিছু জানে না; কাজেই ওদের ভয় করবার কোনোই কারণ নেই। কিন্তু এই অল্প কজন মানুষ যখন আমাদের মোকাবেলায় এল, তখন আমাদের সন্দেহ হতে লাগল, এরা মানুষ, না জিন। আমাদের এত বড় বাহিনীটাকে ওরা রক্তবানে ভাসিয়ে দিল। আমি সামনের দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনাকে দেখে এখানে চলে এলাম। কিছু খেতে দিন। নাহয় অনাহারে মনে যাব।'

'যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে, তাদের না খেয়েই মরা দরকার'– শারিনা বলল– 'আচ্ছা, ওখানেই বসে পড়ো; আমি তোমাকে কিছু দিচ্ছি। মানবতা বলতে একটা কথা তো আছে।'

হাদীদ পোটলা থেকে কিছু খাবার বের করে উঠে এগিয়ে গিয়ে রোমান সিপাইকে দিল। সিপাই ওখানেই বসে অস্থির মনে ও অধৈর্যের সঙ্গে গপাগপ খেতে শুরু করল।

'এখানে বসে থেকো না'– শারিনা বলল– 'এখান থেকে চলে যাও। অন্য কোথাও গিয়ে খাও।'

শারিনার ভঙ্গিতে ও স্বরে রাজকুমারীর ভাব। হাদীদ তাকে বলল, এমন কঠোর ভাষায় ও অবজ্ঞার সুরে কথা বলো না। বেচারাকে খাবারটা ধীরে-সুস্থে খেতে দাও।

হাদীদের কথায় ভরসা পেয়ে রোমান সিপাই ওখানেই বসে খেতে থাকল, যেন সে কিছুই শোনেনি।

রাতের সুনসান নীরবতার মধ্যে একটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। শব্দটা কাছে থেকেই আসছে। অমনি হাদীদের ডান হাতটা তরবারির হাতলে পৌঁছে গেল। জোসনার আলোয় রাতটা এখন ফকফক করছে। ঘোড়ার পদশব্দ যেদিক থেকে আসছিল, ওদিকে দুটা টিলার মাথা পরস্পর মিলে আছে। কিন্তু মধ্যখান দিয়ে রাস্তা আছে। এক রোমান সিপাই উক্ত স্থানে আত্মপ্রকাশ করল। সে একটি ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে আর আরেক ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার। যে-রোমান সৈনিক শারিনার দেওয়া খাবার খাচ্ছিল, সে তাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং অশ্বারোহীর দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। লোকটা এসেছিল হেলেদুলে পড়িমরি অবস্থায়, যেন সত্যিই অনাহারে মরে যাচ্ছে। কিন্তু এখন যখন উঠে অশ্বারোহীর পানে এগিয়ে যেতে শুরু করল, তখন তার চলনে তেজও আছে, উদ্দীপনাও আছে।

হাদীদ তরবারি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু একপাও সম্মুখে এগোল না। শারিনাও উঠে দাঁড়িয়ে আছে।

দুই রোমান সিপাই মিলে অশ্বারোহী লোকটাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে ধরাধরি করে সেই জায়গাটাতে নিয়ে এল, যেখানে হাদীদ ও শারিনা শোওয়ার জন্য কম্বল বিছিয়েছিল। তারা লোকটাকে একটা কম্বলের উপর বসিয়ে দিল।

'আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি না শারিনা!'– অশ্বারোহী লোকটা বলল– 'আমি যা-কিছু দেখছি, সত্য ও বাস্তবই দেখছি। অবাক্ হচ্ছি এজন্য যে, আমাদের সাক্ষাতটা কোথায় এসে হলো! তোমরা আমাকে দেখনি– আমি তোমাদের দেখে ফেলেছি।'

'হ্যাঁ কেলাশ!'– শারিনা বলল– 'তুমি যতটা অবাক্ হয়েছ, তারও চেয়ে বেশি বিস্মিত হওয়া দরকার ছিল। আমি এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণই করিনি যে, তুমি রাস্তায় আমাকে পেয়ে যাব...। তুমি আহত নাকি?

'হ্যাঁ শারিনা!'– লোকটা উত্তর দিল– 'দুটা পা-ই মারাত্মকভাবে আহত। সম্ভবত একটা পায়ের হাড়ও ভেঙে থাকবে। তুমি এখানে কীভাবে এলে? এই লোকটা কে?'

'তুমি বিশ্বাস করবে না'– শারিনা বলল– 'যদি বলি, আমি তোমার সন্ধানে বের হয়েছি এবং তোমাকে খুঁজে বের করতে হন্যে হয়ে ঘুরে ফিরছি, তা হলে আমার কথাটা তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'আমি বিশ্বাস করব না'– লোকটা বলল– 'তোমার সঙ্গে যদি তিন-চারজন, এমনকি এক-দুজনও সৈনিক থাকত, তা হলে নাহয় তোমার কথাটা আমি মেনে নিতাম। কিন্তু তোমার এই সঙ্গী রোমান নয়। একে আরবি বলে অনুমিত হচ্ছে। আর একে তোমার রক্ষী বলে মনে হচ্ছে না। আমি তোমার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারব না। আমি তো দাঁড়াতেই পারছি না। তুমি যদি সত্য বল, তা হলে আমি তোমার পথ আগলাব না। আমার মাঝে সাহস আছে। ভালো হবে, তুমি সত্য কথা বলো।'

এই আহত লোকটা সুদর্শন ও যুবক। রোমান ফৌজে অফিসার পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। নাম কেলাশ। একটা গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার ছিল। অত্যন্ত সাহসী ও জানবাজ সৈনিক। তার গেরিলা অভিযানের সুখ্যাতি হেরাক্ল-এর বাহিনীতে অনেক প্রসিদ্ধ। শিকারের উপর ব্যাঘ্রের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং শিকার কিছু বুঝে উঠতে-না-উঠতেই কাজ সমাধা করে উধাও হয়ে যেত।

এই সুদর্শন গেরিলা যুবককে শারিনার শৈশব থেকেই ভালো লাগত। একে সে নিজের আদর্শ বানিয়ে নিয়েছিল। ছেলেটা রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত বিধায় তার সঙ্গে মিলিত হতে শারিনার কোনোই সমস্যা হতো না।

শারিনা যখন যৌবনে পদার্পণ করল, তখন শৈশবের এই ভালো লাগা অন্তরঙ্গ ভালবাসায় বদলে গেল। সচরাচর যুবক-যুবতীদের মাঝে যেমন ভালাবাসা তৈরি হয়, কেলাশ একে তেমনই একটা ভালবাসা মনে করত। কিন্তু শারিনার এই আবেগতাড়িত আচরণ তার সহজাত প্রবৃত্তির হাদীদকে ধারণা দিয়েছিল, সামরিক চেতনা তার স্বভাবের একটা প্রধান অংশ। অনুগামী ছিল। সে আপন স্বভাবের যে-চিত্র সে হাদীদের সম্মুখে অঙ্কন করেছিল, তেমনই একটা ছবি কেলাশেরও সামনে এঁকেছিল। কিন্তু কেলাশের বুঝ ভিন্ন। সে একে আবেগতাড়িত প্রেম ছাড়া আর কিছু বুঝতে রাজী নয়। শারিনাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে তার উদগ্র বাসনার কথা প্রকাশ করল। শারিনা তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিল, যেদিন তুমি কোনো মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে ফিরে আসতে পারবে, সেদিন আমি তোমাকে বিয়ে করব।

কেলাশের বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কথা শারিনা ভালো করেই জানত। এটি তার সেই গুণ, যে কিনা তাকে কেলাশেরভালবাসার জালে আটক করেছিল। কিন্তু এই প্রেম কেলাশেরউপর উলটো ক্রিয়া করতে শুরু করল। কেলাশ যুদ্ধের প্রতি নিঃস্পৃহ হয়ে উঠল এবং কোনো-না-কোনো অজুহাতে রণাঙ্গন থেকে পেছনে থাকার চেষ্টা শুরু করে দিল।

কেলাশেরএই আচরণ শারিনার কাছে ভালো লাগল না। শারিনা বলত, আমিও তোমার মতো যুদ্ধ করব। তুমি আমাকে রণাঙ্গনে নিয়ে চলো। আমি শত্রুর মোকাবেলায় বুক টান করে দাঁড়াব এবং পুরুষদের মতো লড়াই করব। কিন্তু শারিনার এই মানসিকতা কেলাশেরভালো লাগত না। সে বলত, তুমি হলে একটি সুগন্ধময় ফুল। তোমাকে আমি ফুলেরই আকারে দেখতে চাই, শুকতে চাই। আমার মনের ঐকান্তিক বাসনা হলো, আমি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসব আর তুমি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে।

কেলাশের এই আচরণ শারিনার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করল। তার যে-ছবিটা সে নিজের মনের মাঝে অঙ্কন করে রেখেছিল, কেলাশ তাকে কুৎসিত ও কলঙ্কিত করে ফেলল। শারিনা তাকে একথা বলেনি যে, আমি যে-কেলাশকে ভালবাসতাম, সেই কেলাশ একটা কল্পনা ছিল মাত্র। আর শারিনা কল্পনাপুজারি মেয়ে হতে চায় না। তারপর খালিদ ইবনে অলীদ, আবু উবায়দা, শুরাহবিল ইবনে হাসানা ও অন্যান্য মুসলমি সালারদের নেতৃত্বে ইসলামের মুজাহিদগণ যখন রোমের বিরুদ্ধে ঝড়ের বেগে ধেয়ে এলেন, তখন কেলাশের প্রতি আদেশ জারি হলো, তুমি তোমার গেরিলা বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাও এবং মুসলমানদের ছাউনির উপর ঝটিকা আক্রমণ চালাও।

এই যুদ্ধ দীর্ঘতা লাভ করছিল এবং প্রতিটি অঙ্গনে মুসলমানরা জয়ী হচ্ছিল আর রোমানরা পেছনে সরে যাচ্ছিল। শারিনার চিন্তা-চেতনায় সেই বিপ্লব আসতে শুরু করল, যার বিবরণ হাদীদকে প্রদান করেছিল। কেলাশ তার হৃদয় থেকে নেমে গেল।

এখন কেলাশ জনবসতি থেকে দূরে এই এই বনে শারিনার পথে এসে পড়ল। এমন অবস্থায় এল যে, তার দুটা পা-ই গুরুতর আহত, জখমের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এবং হাঁটতে-চলতে অক্ষম। তার আশা ছিল, শারিনার হৃদয়ে তার ভালবাসা আগের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি না পেলেও কমেনি অবশ্যই। কিন্তু শারিনাকে সে এই বনে একজন মুসলমানের সঙ্গে দেখে বিচলিত হয়ে উঠল এবং হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে উঠে-আসা ক্ষোভ ও ভর্ৎসনায় মুখটা তার লাল হয়ে গেল।

'আমাকে বেশি সময় বিস্ময় ও অস্থিরতার মধ্যে ফেলে রেখো না শারিনা!'— কেলাশ বলল— 'বলো, এই লোকটা কে আর এর সঙ্গে তুমি কোথায় যাচ্ছ? এমন যদি হতো যে, লোকটা তোমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে, তা হলে আমাদের দেখে তুমি খুশি হতে এবং দেখামাত্র আমাদের কাছে ছুটে গিয়ে আমাদের আশ্রয় কামনা করতে।'

'এ আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না কেলাশ!— শারিনা অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলল— 'আমি একে নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমাদের জগত থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাচ্ছি। আমাকে তুমি ভুলে যাও। আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে।'

'প্রাসাদের মেয়েরা তোমাকে পাগল বলত'– কেলাশ হতাশ কণ্ঠে বলল– 'এখন বুঝছি, ওরা ঠিকই বলত। তোমাকে এখানে দেখে আমার বিশ্বাস হয়নি, তুমি একজন মুসলমানের সঙ্গে পলায়ন করছ। রাজপরিবারের মান-গৌরব তুমি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছ!'

'তোমাদের রাজপরিবারের মর্যাদা কিছু অবশিষ্ট আছে নাকি?'– মধ্যখান থেকে হাদীদ মুখে মুচকি হাসির ভাব ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল এবং কেলাশকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলল– 'যারা অন্যের মর্যাদা নিয়ে তামাশা করে, তাদের পরিণতি এমনই হয়, যেখানে তোমার রাজপরিবার পৌঁছে গেছে।'

'তোমাদের রাজা-বাদশাহদের স্ত্রীদের গণনা করো'– শারিনা মুখ খুলল– 'তাদের রক্ষিতা-গণিকাদের হিসাব করো। তুমি গুনে শেষ করতে পারবে না। রাজপরিবারের লোকেরা যেখানেই একটা রূপসী নারী দেখে, অমনি আদেশ জারি করে, ওকে মহলে পৌঁছিয়ে দাও আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই আদেশ পালিত হয়ে যায়। তারা পিতামাতা ও ভাই-বোনদের থেকে অল্পবয়সী মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে আসে। কোনো অঞ্চল বিজিত হলে সৈনিকরা ওখানকার মেয়েদের উপর পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার মাকে একটা কাফেলা থেকে অপহরণ করা হয়েছিল এবং তখনকার সম্রাট ফোকাসের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাজার কর্তব্য এই হওয়া দরকার ছিল যে, তিনি সেই পিতামাতাদের ফরিয়াদ শুনবেন, যাদের কন্যারা অপহৃতা হচ্ছে এবং দস্যুদের হাতে অপহৃতা মেয়েদের খুঁজে বের করতে আদেশ জারি করবেন। কিন্তু এখানকার রাজ-বাদশাহরা দস্যুদের চেয়েও খারাপ। এগুলোই সেই কারণ, যেগুলো আমার হৃদয়ে রাজপরিবারের প্রতি ঘৃণা তৈরি করেছে।'

'কেলাশ ভাই!'– হাদীদ বলল– 'আজ তোমাদের একটা মেয়ে যাচ্ছে আর তুমি বলছ, এতে রাজপরিবারের মান চলে গেছে। এই মেয়েটাকে আমি জোর করে নিয়ে যাচ্ছি না। এ আমার বা অন্য কারও রক্ষিতা হবে না। একে কারও বিনোদনের সামগ্রীও বানানো হবে না। আমি যদি একে বিবাহ করতে ইচ্ছা করি, তা হলে সেনাপতির অনুমোদন ছাড়া করতে পারব না। এমনও হবে না যে, সেনাপতির মেয়েটাকে ভালো লেগে গেল আর তিনি একে দখল করে ফেলবেন। আমাদের কাছে এ ঠিক অতটুকু মর্যাদা পাবে, যতটুকু মর্যাদা পায় আমাদের খলীফা ও সালারদের স্ত্রী-কন্যারা। সম্মান-মর্যাদা যদি দেখতে চাও, তা হলে আমার সঙ্গে চলো। ওখানে তোমার চিকিৎসা হবে। আর যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও, তা হলে তোমার সামরিক যোগ্যতা অনুপাতে তোমাকে পদ দেওয়া হবে।'

'তোমার ভাগ্য ভালো যে, আমি আহত'– কেলাশ বলল– 'অন্যথায় আমি তোমাকে এখানেই থামিয়ে দিতাম। যতটুকু বলেছ, তারপর আর একটাও কথা বলবার সুযোগ আমি তোমাকে দিতাম না।'

হাদীদের মুখের হাসিটা আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠল। সে আর কোনো কথা বলল না। কেলাশের সঙ্গে আরও দুজন সিপাই আছে। তারা তার পেছনে বসে আছে। সম্ভবত তারা কেলাশের আদেশের অপেক্ষা করছে। কেলাশ এক তো বাহিনীর একজন অফিসার; তা ছাড়া রাজপরিবারের সদস্য। এসব কারণে সিপাইরা তার কথার মধ্যে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না।

পেছনে একস্থানে যখন শারিনা ও হাদীদ একটা নিচু টিলার আড়ালে তিন অশ্বারোহীকে দেখেছিল, তখন তারাও এদের দেখে ফেলেছিল। কিন্তু শারিনা-হাদীদ মনে করেছিল, ওরা তাদের দেখেনি। তখনই কেলাশের সন্দেহ হয়েছিল, মেয়েটা শারিনা বলে মনে হচ্ছে। না-ও যদি হয়, তার আকার-গঠন শারিনার মতো এবং একটা রূপসী মেয়ে বটে। মেয়েটার সঙ্গে একজনমাত্র পুরুষ আর কেলাশের সাথে আছে দুজন সৈনিক। ফলে মেয়েটাকে ধরে নিতে সে ঘোড়ার মুখ এদিকে ঘুরিয়ে দিল।

হাদীদ ও শারিনা লম্বা একটা টিলার আড়ালে-আড়ালে সামনের দিকে এগিয়ে চলছিল এবং কেলাশের অশ্বারোহী সিপাইদ্বয় তাদের অনুসন্ধান করে ফিরছিল। কেলাশ তাদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল, তোমরা পায়ে হেঁটে এবং বিড়ালের মতো পা টিপে-টিপে অনুসন্ধান চালাও।

নির্দেশনা বুঝিয়ে দিয়ে কেলাশ নিজে একস্থানে বসে রইল। হাদীদ ও শারিনা কূপ দেখে এবং জায়গাটা ভালো লাগায় এখানে থেমে গেল।

চাঁদের আলো নিভে গিয়ে এখন রাত অন্ধকার হয়ে গেছে। এ-সময়ে এসে সৈনিকদ্বয় হাদীদ ও শারিনার সন্ধান পেয়ে গেল। তারা একসঙ্গে এসেছিল। একজন বলল, আমি স্যারকে সংবাদটা জানিয়ে আসি। বলেই সে ওখান থেকে দৌড় দিল। শারিনা ও হাদীদ যে-ধাবমান পদশব্দ শুনেছিল, সেটি এই আওয়াজই ছিল আর ওদিকে তাকিয়ে এক সিপাইকে দণ্ডায়মান দেখতে পেল। শারিনা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি দৌড়ে এসেছিলে? কিন্তু উত্তরে সে প্রতারণার আশ্রয় নিল যে, ক্ষুধার্ত ভিখিরী সাজল এবং খাবার ভিক্ষা করতে লাগল। শারিনা তার উপর কিছুটা ক্ষোভ ঝেড়েছিল বটে; কিন্তু মানবতার কথা চিন্তা করে কিছু খাবার দিল। এর মধ্যে তার সঙ্গী কেলাশের কাছে পৌঁছে গেল এবং তারা ঘোড়ায় চড়ে এখানে এসে পড়ল। কেলাশ যখন শারিনাকে কাছ থেকে দেখল, তখন তার বিস্ময়ের অবধি রইল না যে, মেয়েটা আসলে শারিনা-ই ছিল। তার বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না, রাজপরিবারের একটা মেয়ে অচেনা একজন পুরুষের সঙ্গে এই বিজন অরণ্যে এভাবে অবস্থান নিয়ে আছে!

কেলাশ শারিনার সঙ্গে আরও অনেক কথা বলল। কিন্তু তার বক্তব্য মেয়েটার উপর কোনোই ক্রিয়া করল না। সে মুসলমানদের খুব গালাগাল ও বদনাম করল এবং

ইসলামের ব্যাপারে অবমাননাকর কথা বলল। শারিনাকে একথা বোঝানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করল যে, এই মুসলমানরা দস্যু ও লুটেরা। ওদের না কোনো খোদা আছে, না কোনো ধর্ম আছে।

'আমার সৌভাগ্য নয় যে, তুমি আহত'– হাদীদ বলল– 'তোমার বরং কপাল ভালো যে, তুমি অক্ষম এবং দাঁড়াতে পারছ না। আমরা আহত ব্যক্তির উপর, নারীর উপর, শিশু ও বৃদ্ধের উপর হাত তুলি না। তুমি আমাকে অপমান করে, আমার ধর্মের অবমাননা করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছ। কিন্তু এর জন্য আমি তোমার গায়ে হাত তুলতে পারি না। এটি সেই ইসলামের বিধান, যাকে তুমি ভালো মনে করছ না; বরং বলছ, এটি কোনো ধর্মই নয়।'

'শারিনা!'– কেলাশ বলল– 'তুমি যদি অপছন্দ না কর, তা হলে আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে রাতটা এখানেই কাটাতে চাই।'

'আমি অপছন্দ করব কেন?'– শারিনা বলল– 'তোমার যেখানে মন চায়, শুয়ে পড়ো।'

'আর আমাদের কাছে খাবার আছে'– হাদীদ কেলাশকে উদ্দেশ করে বলল– ' চারটে খেয়ে নাও। আর কোনো কষ্ট বা সমস্যা হলে আমাকে বোলো।'

'আমার কিছুরই দরকার নেই'– কেলাশ বলল এবং শারিনার পানে তাকাল– 'শারিনা! তুমি আমার থেকে আজীবনের জন্য আলাদা হয়ে যাচ্ছ। আমার একটামাত্র কথা মেনে নাও– সামান্য সময়ের জন্য নির্জনে আমার সঙ্গে এসে বসো।'

'বসব'– শারিনা বলল– 'কিন্তু আমারও একটা কথা তুমি মেনে নাও– আমার থেকে দূরে কোথাও গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

কেলাশ তার সঙ্গীদের বলল, এখান থেকে সামান্য দূরে ওই টিলাটার কাছে আমার শয্যা রচনা করো।

এক সিপাই দৌড়ে গেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে বিছানা খুলে আনল এবং কেলাশের দেখিয়ে-দেওয়া-জায়গাটায় পেতে দিল। দুজনে ধরাধরি করে নিয়ে কেলাশকে ওখানে শুইয়ে দিল। কেলাশের কথা অনুযায়ী তার সঙ্গীরা তার থেকে দূরে একস্থানে শোওয়ার ব্যবস্থা করল।

শারিনা কেলাশের শয্যায় গিয়ে বসল এবং জিজ্ঞাসা করল, আর কী কথা বলবে বলো। কেলাশ তাকে মতে আনতে চেষ্টা করল, তুমি আমার সঙ্গে ফিরে চলো। শারিনা তার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিল, না; আমি আর যাব না। কেলাশ অনুনয়-বিনয়ের পর্যায়ে নেমে এল। তারপর মেয়েটাকে মুসলমানদের ভয় দেখাল। কিন্তু তার কোনো কথাই শারিনার উপর ক্রিয়া করল না। অবশেষে শারিনা তাকে নিরাশার মাঝে ফেলে রেখে হাদীদের কাছে ফিরে এল এবং তার সঙ্গে পাতানো বিছানায়

শুয়ে পড়ল। দু-দিনের ক্লান্ত শরীরদুটো অল্প সময়ের মধ্যে গভীর নিদ্রার অতল সমুদ্রে তলিয়ে গেল।

তিন

রাতের অর্ধেকটা কেটে গেছে। হঠাৎ কাছের একটা গাছের উপর বসা কী একটা পাখি খুব উঁচু শব্দে ফড়ফড় করে উঠল। শারিনার চোখ খুলে গেল। কাছাকাছি শোওয়া হাদীদের হালকা নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার মানে, লোকটা গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছে।

শারিনা ওভাবেই শুয়ে-শুয়ে কেলাশ যেখানে শয়ন করেছিল, সেদিকে তাকাল। ওদের তো ঘুমিয়ে থাকার কথা। কিন্তু কেলাশ বসে আছে। এক সিপাই তার ডানে, আরেকজন বাঁয়ে উপবিষ্ট। কেলাশ কানে-কানে ওদের সঙ্গে কী যেন কথা বলছে।

শারিনার মাথায় একবার ভাবনা এল, গিয়ে দেখি, ওরা কী করছে এবং কেলাশকে জিজ্ঞেস করি, এত রাত পর্যন্ত এখনও জেগে আছ কেন; তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে নাকি। শারিনা কিছুক্ষণ চিন্তা করল এবং ক্ষণিকের জন্য তার হৃদয়ে মমতার ঢেউ খেলে গেল। জখমের ব্যাপারে তো সে কেলাশের কোনো উপকার করতে পারবে না। কিন্তু তার মাথায় ভাবনা এল, আমি লোকটার কাছে গিয়ে বসি এবং কথাবার্তা বলি। তাতে সাময়িকের জন্য হলেও সে কষ্টের কথা ভুলে যাবে এবং আরাম বোধ করবে।

এই চিন্তা মাথায় নিয়ে শারিনা শোওয়া থেকে উঠতে লাগল। কিন্তু হঠাৎই তার মস্তিষ্কে আলো চমকে উঠল এবং মনে সংশয় জেগে উঠল। সন্দেহটা কেলাশের নিয়তের উপর। এমনও তো হতে পারে, কেলাশ কানে-কানে যে-কথাটা বলছে, তা হলো, সে তার সাথীদের বলছে, তোমরা এমনভাবে শারিনাকে তুলে নিয়ে আসবে, যেন হাদীদ টের না পায়। তার মানে কেলাশ আমাকে জোরপূর্বক তুলে নেওয়ার পরিকল্পনা এঁটে থাকতে পারে।

শারিনার চোখের ঘুম উড়ে গেল। সে শুয়েই থাকল এবং ওদের দেখতে থাকল। কেলাশ কানে-কানে তার সঙ্গীদের সাথে কথা বলছে। সঙ্গীরা কেলাশের কথা শুনছে আর ফাঁকে-ফাঁকে অপাঙ্গে শারিনা ও হাদীদের দিকে তাকাচ্ছে।

শারিনার সন্দেহ পোক্ত হতে চলল।

অবশেষে দুই সিপাই উঠল এবং শারিনা-হাদীদের দিকে না এসে অন্য আরেক দিকে চলে গেল। শারিনার মনে বিস্ময় জাগল, ওরা ওদিকে যাচ্ছে কেন! শারিনা দেখেছে,

উঠবার সময় ওদের হাতে তরবারি ছিল। দুজনই কাছের ছোট্ট টিলাটার আড়ালে চলে গেছে আর কেলাশ শুয়ে পড়েছে।

শারিনা আরও সতর্ক হয়ে গেল। পাশাপাশি মনে এই প্রশান্তিও এল যে, ওরা বোধহয় অন্য কোনো কাজে কোথাও চলে গেছে। আবার এই চিন্তাও এল, হয়ত ঘোড়ায় যিন কষতে গেছে– ঘোড়াগুলোকে আগে প্রস্তুত রেখে আমাকে তুলে নিয়ে চম্পট দেবে। মধ্যরাতে এই গভীর অরণ্যে ওদের কাজইবা কী থাকতে পারে!

এতক্ষণ পর্যন্ত শারিনা কাত হয়ে শুয়ে-শুয়ে দেখছিল। এবার সে পার্শ্ব বদল করার প্রয়োজন অনুভব করল এবং চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। ততক্ষণে আকাশের চাঁদটা অনেকখানি সামনে এগিয়ে গেছে এবং গাছের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে গেছে। শারিনা অনুভব করল, তার গায়ের উপর কিছু একটার ছায়া পতিত হচ্ছে, যেটা আগে ছিল না। দুটা ছায়া, যার একটা তার উপর, অপরটা হাদীদের উপর হাঁটা-চলা করছে।

শারিনা তার মস্তিষ্কটা সজাগ রাখল এবং ততক্ষণাৎ পেছনের দিকে তাকাল না। সে বুঝে ফেলেছে, সিপাই দুজন তাদের মাথার দিক থেকে বিড়ালের মতো পা টিপে-টিপে ধীরে-ধীরে এদিকে এগিয়ে আসছে।

লোকগুলোকে শারিনার কাঁচা বুদ্ধির মানুষ বলে মনে হলো। তাদের পিঠের দিকে থাকা চাঁদটাকে তারা কোনো আমলেই নিল না। এ-ও দেখল না, এখনও তারা বেশ দূরে; কিন্তু এতক্ষণে তাদের ছায়াদুটো শারিনা ও হাদীদের গায়ে এসে পড়তে শুরু করেছে।

শারিনা চিত হয়েই শুয়ে থাকল এবং পাশ পরিবর্তন করল না। চোখদুটো বন্ধ করে নিল। মেয়েটা ভীতা হয়ে পড়েছে নিশ্চয়। কিন্তু ভয়টা বেশি হাদীদের জন্য যে, পাছে ওরা এর উপর আক্রমণ করে বসে কিনা। তার হৃদপিণ্ডটা ভীষণ ধুক্‌পুক্‌ করতে লাগল।

শারিনা ও হাদীদের মাঝে দু-তিন পায়ের ব্যবধান। এক সিপাই তাদের মধ্যখানে এসে দাঁড়াল। পরক্ষণেই লোকটা শারিনার পানে মুখ করে বসে পড়ল এবং নিজের চেহারাটা শারিনার চেহারার কাছে নিয়ে গেল। শারিনা চোখদুটো আগেই বন্ধ করে রেখেছিল। এবার এমনভাবে শব্দ করে শ্বাস টানতে লাগল, যেন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

সিপাই উঠে দাঁড়াল। শারিনা আড়চোখে তাকাল। আরেক সিপাই হাদীদের অপর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াল। শারিনা দেখল, দুজনেরই হাতে তলোয়ার। রাতটা এত নিস্তব্ধ যে, নিঃশ্বাসের শব্দটাও শোনা যাচ্ছে। শারিনা এক সিপাইর ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠ শুনতে পেল– 'বিলম্ব করো না'।

শারিনার মনে এখন আর কোনো সংশয় নেই।

দুই সিপাই হাদীদের পাশঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজনের মুখ অপরজনের দিকে। শারিনার বুঝতে বাকি রইল না, এরা হাদীদকে হত্যা করতে এসেছে।

এখন আর হাতে কোনো সময় নেই।

তরবারিটা হাদীদের কাছে তার কোমরের সঙ্গে বাঁধা। শারিনার কাছে খঞ্জর, যেটা তার পোশাকের তলে লুকিয়ে রাখা। এক সিপাই নুয়ে হাদীদের প্রতি হাত বাড়াল। শারিনা দেখল, সে হাদীদের তরবারিটা তুলে নিতে হাত বাড়িয়েছে।

শারিনা ধীরে-ধীরে তার ডান হাতটা পোশাকের তলে ঢুকিয়ে দিল। হাদীদের পাঁজরের কাছে দাঁড়ানো অপর সিপাই শারিনার এই নড়চড় দেখল না। কারণ, তার সম্মুখে তার সঙ্গী দাঁড়ানো। প্রথম সিপাই যেইমাত্র হাদীদের তরবারিটা তুলতে অবনত হলো, অমনি শারিনা তড়িতগতিতে উঠে দাঁড়াল। খঞ্জরটা বের করল এবং নুয়ে-থাকা-সিপাইর পিঠে সেই জায়গাটাতে পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানল, যেখানে হৃদপিণ্ড থাকে। সিপাই সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই শারিনা তার পিঠে আবারও একটা আঘাত হানল।

হাদীদের চোখ এখনও খোলেনি। অপর সিপাই দেখল, তার সঙ্গীর পিঠে পরপর দুবার খঞ্জর বিদ্ধ হয়েছে। সে ঝটপট এই সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলো যে, শারিনার উপর তরবারির আঘাত হানবে, নাকি আগে হাদীদকে হত্যা করবে। কিন্তু শারিনার দেমাগ খুব ধারালো ও পরিষ্কার। যে-সিপাইকে সে খঞ্জর বিদ্ধ করেছিল, সে একটুখানি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই এক দিকে পড়ে যেতে লাগল। কিন্তু শারিনা তাকে পড়তে না দিয়ে নিজের হাতদুটো তার পেছনে রাখল এবং পূর্ণ শক্তিতে তাকে সামনের দিকে ঠেলা দিল। এই সিপাই তার সামনের সিপাইর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঘুমন্ত হাদীদের গায়ের উপর গিয়ে পতিত হলো।

হাদীদ ধড়মড় করে উঠে বসল। আহত সিপাইর তরবারি পড়ে গিয়েছিল। শারিনা সেটা তুলে হাতে নিল এবং হাদীদের উঠে দাঁড়ানোর আগে-আগেই সামনের দিকে একটা লাফ দিল এবং অপর সিপাই ঘাড়ে তরবারির আঘাত হানল। সিপাইর গলাটা অর্ধেক কেটে গেল।

ইতিমধ্যে হাদীদ পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না, এসব কী হচ্ছে। শারিনা যে-সিপাইর উপর তরবারির আঘাত হেনেছিল, সে এখনও ধরাশায়ী হয়নি। শারিনা তরবারিটা বর্শার মতো ছুড়ে মারল। অস্ত্রটা তার পেটে ঢুকে গেল। শারিনা সজোরে টান দিয়ে তরবারিটা বের করে ফেলল। সিপাই দুজনই মরে গেল।

হাদীদ শারিনাকে জিজ্ঞেস করল, এ কী কাণ্ডটা ঘটে গেল?

'আমার সঙ্গে আসো'– শারিনা কেলাশের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বলল– 'ওকে জিজ্ঞেস করব, ঘটনাটা আসলে কী।'

পুরোটা ঘটনা যেন চোখের পলকের মধ্যে ঘটে গেল। শারিনা ও হাদীদ কেলাশের দিকে এগিয়ে গেল। কেলাশ শুয়ে পড়েছিল; কিন্তু এখন বসে আছে। দাঁড়াবার শক্তি তো তার নেই।

'বদমাশ কোথাকার!'– শারিনা কেলাশের পাঁজরে তরবারির আগাটা ঠেকিয়ে ধরে বলল– 'তুমি কি এভাবে আমাকে নিতে পারতে?'

কেলাশ মুখটা হা করে বিস্ফারিত চোখে শারিনার প্রতি তাকিয়ে রইল। সে বুঝে ফেলেছে, শারিনা এখন আর সেই মেয়ে নেই, যার সঙ্গে তার ভালবাসা ছিল। বরং এই মেয়েটা এখন তার জন্য আপাদমস্তক যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'সত্য বলো; তা হলে হয়ত আমি তোমাকে ক্ষমাও করে দিতে পারি'– হাদীদ বলল– 'তুমি কি শুধু আমাকে হত্যা করাতে চেয়েছিলে, নাকি আমাদের দুজনকেই। বলো; তোমার ইচ্ছাটা কী ছিল?

'সত্য কথা বলে দাও।' শারিনা এবার তরবারিটা কেলাশের পাঁজর থেকে সরিয়ে এনে তার বুকে ঠেকিয়ে ধরল।

'আমাকে ক্ষমা করে দাও শারিনা!'– কেলাশ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল– 'আমি তোমাকে ভালবাসি শারিনা! যেখানেই চলে যাও, তুমি আমার হৃদয় থেকে তোমার ভালবাসা বের করতে পারবে না।'

'তুমি এর সঙ্গে কথা বলো। এর প্রশ্নের উত্তর দাও'– শারিনা পুনরায় তরবারির আগাটা কেলাশের বুকে ঠেকিয়ে ধরে বলল– 'এ তোমাকে যে-কথাটা জিজ্ঞেস করেছে, তার ঠিকঠিক উত্তর দাও। এখনই তোমার দেহ থেকে প্রাণটা বের হয়ে যাবে। আর তখন তোমার মৃত হৃদয় থেকে আমার ভালবাসাও উধাও হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি বলো, তোমার পরিকল্পনা কী ছিল।'

কেলাশের মুখে কোনো কথা নেই।

'হাদীদ!'– শারিনা শরাহতা বাঘিনীর মতো গর্জে উঠে বলল– 'এর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। এ তোমাকে হত্যা করাতে চেয়েছিল। তোমার অধিকার আছে; একে তুমি হত্যা করে ফেলো।'

'আমি তোমাদের দুজনেরই কাছে অনুনয় করছি'– কেলাশ ভিখিরীর মতো বিনীত স্বরে বলল– 'আমার মৃত্যুর দায় তোমরা নিজেদের মাথায় তুলে নিচ্ছ কেন! আমি মরে তো যাচ্ছিই। দুজনে ধরে আমাকে ঘোড়ার উপর বসিয়ে দাও। জীবন থাকলে গন্তব্যে পৌঁছে যাব আর না থাকলে পথেই কোথাও মরে পড়ে থাকব। অবশ্য গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। ঘটবে এটাই যে, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে পথেই ঘোড়ার পিঠে মরে থাকব। আমি না ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে পারি, না হাঁটতে পারি। আর কোনোমতে অবতরণ করিও যদি, পরে কারও সাহায্য ছাড়া উঠতে পারি না।'

'হাদীদ!'– শারিনা ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল– 'তুমি ভাবছ কী? একে তো আমি-ই হত্যা করতে পারি। কিন্তু এ তোমাকে তার শত্রু মনে করে। তাই আমি চাই, তুমিই একে হত্যা করো।'

'আমার একটা কথা বোধহয় তোমার ভালো লাগবে না শারিনা!'– হাদীদ তার বিশেষ ধরনের একটা মুচকি হাসি উপহার দিয়ে বলল– 'যারা আমাকে খুন করতে এসেছিল, তাদের তুমি হত্যা করেছ। আমার ধর্ম আমাকে এই অক্ষম মানুষটার গায়ে হাত তুলতে বারণ করছে। লোকটা নিজপায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে না এবং সেই অক্ষমতারই কারণে আমাদের কাছে করুণা ভিক্ষা চাচ্ছে। আরেকটা কথা হলো, এই সমগ্র ভূখণ্ডে আমার ও তার বাহিনী পরস্পর লড়াই করছে। সেজন্য এই গোটা অঞ্চল একটা রণক্ষেত্র। এই লোকটা যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করত আর আমি এর মোকাবেলা করতাম, তা হলে হয় এ আমাকে হত্যা করত, নাহয় আমি একে হত্যা করতাম। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে এ তোমার খাতিরে হত্যা করাতে চেয়েছিল। আমি একটি আদর্শ ও বিশ্বাস বুকে ধারণ করে এই রণাঙ্গনে এসেছি। সেই আদর্শে এর মতো অক্ষম মানুষকে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ। একে তুমি এর অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আসো, গিয়ে শুয়ে পড়ি আর বাকি রাতটা আরামের সঙ্গে কাটিয়ে দিই। সকালে উঠে এখান থেকে রওনা হয়ে যাব।'

শারিনা হাদীদের কথার কোনো উত্তর দিল না বটে; কিন্তু তার মুখের চেহারা বলছিল, হাদীদের এই সিদ্ধান্তে তার সম্মতি নেই।

শারিনা হাদীদের প্রতি তির্যক চোখে তাকাল।

'ঠিক আছে; একে ঘোড়ার উপরই বসিয়ে দিচ্ছি'– শারিনা বলল– 'তুমি গিয়ে এর ঘোড়াটার পিঠে যিন বেঁধে নিয়ে আসো।'

কেলাশ শারিনাকে ধন্যবাদ জানাল।

খানিক দূরে একটা গাছের সঙ্গে তিনটা ঘোড়া বাঁধা আছে। একটা কেলাশের, দুটা তার নিহত দুই সঙ্গীর। হাদীদ গিয়ে একটা ঘোড়ায় ভালোভাবে যিন কষে কেলাশের কাছে নিয়ে এল।

এসে হাদীদ কেলাশের প্রতি তাকাল। যাওয়ার সময় কেলাশ বসা ছিল। কিন্তু এখন কাত হয়ে শোওয়া। ফকফকা জোৎস্নালোকে হাদীদ কেলাশের শরীর থেকে রক্তের প্রবাহ দেখল। এবার সে প্রত্যক্ষ করল, কেলাশের মাথাটা দেহ থেকে খানিক আলগা হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু গলাটা পুরোপুরি কর্তিত নয়।

হাদীদ অবাক চোখে শারিনার পানে তাকাল।

'তুমি কি এজন্য আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলে?' হাদীদ অনুযোগের সুরে শারিনাকে জিজ্ঞেস করল।

নীতি, আদর্শ, বিশ্বাস সেখানে চলে, যেখানে প্রতিপক্ষ আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী ও নীতিবান মানুষ হয়'– শারিনা বলল– 'তোমার ধর্ম আছে, যার তুমি অনুসরণ কর। আমার কোনো ধর্ম নেই। আমার উপর কোনো ধর্মের বাধ্যবাধকতা নেই। আমি ওর গলাটা কেটে দিয়েছি। ওকে হত্যা করে আমি ওর উপকার করেছি। ওর কথা অনুসারে যদি আমরা ওকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিতাম, তা হলে ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে খুব ধীরে-ধীরে এবং বেজায় কষ্টের মৃত্যু মরত। ওর শাস্তি এটা-ই হওয়া দরকার ছিল।'

'কিন্তু তারপরও ওকে হত্যা করার কী দরকার ছিল?' হাদীদ জানতে চাইল।

'এমন সোজা বিষয়টা তোমার বুঝে এল না হাদীদ!'– শারিনা বলল– 'ওকে যদি আমরা এখানেই জীবিত রেখে যেতাম কিংবা ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিতাম, তা হলে ও আমাদের জন্য অনেক বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াত। রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা তার মতো অনেক রোমান সৈনিককে সে পেয়ে যেত। তখন প্রথম কাজটা এই করত যে, ওদেরকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিত। কাজেই অভাগাকে হত্যা করা-ই সঙ্গত ছিল।'

হাদীদ ও শারিনা সেই জায়গাটাতে গেল, যেখানে রোমান সিপাইদের মরদেহদুটো পড়ে আছে। নিজেরা যে-কম্বলটা বিছিয়ে শয়ন করেছিল, সেটা ওখান থেকে তুলে খানিক দূরে আরেক জায়গায় বিছিয়ে দুজনে শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে গেল।

রাতের শেষ প্রহর। আলো-আঁধারির পরিবেশ। তারা ঘুম থেকে জাগ্রত হলো এবং হালকা কিছু পানাহার করল। তারপর কেলাশ ও তার সঙ্গীদের ঘোড়াগুলো নিজেদের ঘোড়ার সাথে বেঁধে নিয়ে রওনা হলো।

* * *

রুহায় হেরাক্ল-এর রাজপরিবারের এতগুলো সদস্য! কিন্তু কারও মনে কোনো কষ্ট নেই, কোনো দুঃখ নেই। কারও চেহারায় বিষণ্নতার এতটুকু ছাপ নেই। শুধু একজনমাত্র নারী যারপরনাই বিচলিত ও অস্থির। শারিনার মা। শারিনার মা কন্যা হারানোর বেদনায় কাঁদছেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। তার এতটুকু বিশ্বাস আছে, শারিনা অপহৃতা হয়নি, কেউ তাকে হত্যাও করেনি। আপন গর্ভজাত কন্যার চিন্তা-চেতনা তার জানা আছে। তিনি নিশ্চিতভাবেই বুঝে ফেলেছেন, কোনো মুসলমান কয়েদিকে শারিনার ভালো লেগে গিয়েছিল এবং তাকে মুক্ত করিয়ে তার সঙ্গে চলে গেছে। কিন্তু শারিনা জীবিত থাকেও যদি মা তো আর তাকে পাচ্ছেন না।

হেরাক্ল শারিনার জনক নন বটে; কিন্তু তার মায়ের স্বামী তো নিশ্চয়। কিন্তু তিনি এমন নির্লিপ্ততা দেখালেন, যেন শারিনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না। তদ্রূপ শারিনার মা-ও এখন তার কোনো কাজের নারী নন। যৌবনটা হেরাক্ল-এর জন্য উৎসর্গ করে দিয়ে এখন অকেজো হয়ে পড়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে হেরাক্‌ল-এর হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে প্রবেশ করা শারিনার পক্ষে সম্ভব নয়। পরাজয়ের গ্লানি সম্রাট হেরাক্‌ল-এর চিন্তা-চেতনা ও শরীরের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চেপে ধরে রেখেছে। তিনি ভাবতে-ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পরাজয়ের এই ধারা তিনি কীভাবে রোধ করবেন, অধঃপতনের এই পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেবেন, এই পরাজয়কে কীভাবে বিজয়ে পরিণত করবেন এসব ভাবনা তাকে অস্থির ও বেচইন করে তুলেছে। সামনে তিনি কোনো পথ দেখতে পাচ্ছেন না।

শারিনার মা যখন হেরাক্‌লকে শারিনার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ দিলেন, তখন হেরাক্‌ল বিষয়টাকে এড়ানোর জন্য চরম উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন। সে-সময় তিনি বলেছিলেন, বিগতদের নিয়ে আমার কোনো ভাবনা নেই। আমি আগতদের অপেক্ষায় আছি। তার এই উক্তি শুনে শারিনার মা ক্ষুণ্ন মনে কক্ষ থেকে বের হয়েছিলেন।

সেই লোকগুলো কারা ছিল, সম্রাট হেরাক্‌ল যাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, আমি আগতদের অপেক্ষায় আছি?

এই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত আছে। ঐতিহাসিকরা সম্রাট হেরাক্‌ল-এর সে-সময়কার পুরো পরিস্থিতি লিখে রেখেছেন। আবার কিছু-কিছু ঘটনা বক্ষে-বক্ষে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

আগেই বলেছি, হেরাক্‌ল-এর বিপুলসংখ্যক সৈন্য প্রতিটা ময়দানে গুটিকতক মুসলিম সৈনিকের হাতে পরাজয় স্বীকার করে-করে পেছনে সরে আসছিল। এমনকি তারা গোটা শাম রাজ্যকে শূন্য করে দিল এবং রোম উপসাগরের তীরে এসে দম ফেলল। কিন্তু বড়-বড় কয়েকটা দুর্গঘেরা নগরী তখনও রোমানদের কাছে রয়ে গিয়েছিল। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা হলো আন্তাকিয়া, হালব, মারআশ ও বৈরুত। এ ছাড়া আরও কয়েকটা শহরও তখনও পর্যন্ত রোমানদের হাতে ছিল।

হেরাক্‌ল তার বাহিনীকে এই অঞ্চলগুলোতে বন্টন করে দিলেন এবং আদেশ জারি করলেন, ফৌজ এখন ঐক্যবদ্ধভাবে নয়, বরং বিক্ষিপ্তভাবে খণ্ড-খণ্ড হয়ে লড়াই করবে। তাদের কৌশলটা ছিল, এভাবে মুসলমানদের সৈন্যরা বন্টিত হয়ে যাবে এবং সংখ্যায় তারা আরও নগণ্য হয়ে যাবে।

এখন তিনি নিজে রুহায় অবস্থান করছেন। পরিকল্পনা হলো, সমগ্র বাহিনীকে প্রথমে একস্থানে একত্রিত করে নেবেন এবং তারপর মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত সৈনিকদের উপর খণ্ডিতভাবে আক্রমণ চালাবেন। কৌশল তার খুবই ভালো ছিল। কিন্তু সৈন্যদের একত্রিত করা তার জন্য কঠিক বলে মনে হচ্ছিল। তিনি সব কটা অঞ্চলে বার্তা পাঠিয়ে দিলেন, সকল সৈন্য রুহায় এসে সমবেত হও। এখনও পর্যন্ত কোনো

দূত ফিরে আসেনি। এরাই সেসব লোক, যাদের সম্পর্কে সম্রাট হেরাক্ল বলেছিলেন, আমি আগতদের অপেক্ষায় আছি।

সম্রাট হেরাক্ল কৌশলটা বেশ ভালোই চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, মুসলমানদের সিপাহসালার ও অন্যান্য সালারগণের মাথায়ও কিছু বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে। তিনি এখনও জানতে পারেননি, আরবের সেনানায়করা তার এই কৌশল আগেই ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এভাবে যে, সম্রাট হেরাক্ল তার বাহিনীকে যেসব অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, মুসলিম সালারগণ তাঁদের সৈনিকদের সে অনুসারেই বণ্টন করে সেসব অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হেরাক্ল-এর এই চাল এ-পর্যন্ত সফল ছিল যে, মুসলিম সৈনিকরা তার ভাবনা অনুসারে ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাকে একথা বলবার মতো কেউ ছিল না যে, মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত সৈন্যরা রোমান বাহিনীকে সেই অঞ্চলগুলোতে আটকে দিয়েছে, যেখানে হেরাক্ল তাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিটা অঞ্চলে মুসলমানরা রোমান সৈন্যদের পথ আটকে দিয়েছে।

এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় অঞ্চল ছিল আন্তাকিয়া। দুর্গঘেরা এই শহরটা নিয়ে রোমান সম্রাট হেরাক্ল-এর বেজায় দম্ভ ছিল। থাকারই কথা। তার অবস্থানটাই-ই এমন ছিল যে, তার জন্য অতিরিক্ত কোনো প্রতিরক্ষার প্রয়োজনই ছিল না। তথাপি তার চারদিকে বেশ চওড়া, অত্যন্ত মজবুত ও উঁচু প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইতিহাস লিখেছে, তার প্রাচীরগুলোর উচ্চতা দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিত।

অঞ্চলটা ছিল পাহাড়ি। নগরীটা এমন জায়গায় আবাদ করা হয়েছিল যে, তার চারদিক পর্বতঘেরা। দেখলে মনে হতো, পাহাড়গুলো এই শহরটা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শহরে পৌঁছতে এই পার্বত্য এলাকার আঁকা-বাঁকা সরু পথ অতিক্রম করতে হতো।

এক কথায় আন্তাকিয়া শহর যারপরনাই শক্ত ও দুর্জয় ছিল। আর সেজন্যই হেরাক্ল-এর যেসব সৈনিক মুসলমানদের তাকবীরধ্বনি ও তরবারি থেকে রক্ষা পেত, তারা সবাই আন্তাকিয়ার দিকে মুখ করত। আন্তাকিয়াকেই তারা এমন একটা আশ্রয়স্থল মনে করত, যার ব্যাপারে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এই শহর মুসলমানরা কোনোক্রমেই জয় করতে পারবে না।

এভাবে আন্তাকিয়ায় সাধারণ অবস্থায় যে-পরিমাণ সৈন্য রাখা হতো, এখন সেখানে তার চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক সৈন্য সমবেত হয়ে গেল। ইসলামি বাহিনীর সিপাহসার ছিলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.)। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) তাঁর ডান হাত।

আমরা কাহিনী তো শোনাচ্ছি অন্য কিছুর; কিন্তু ইসলামের এক মহান সিপাহসালার খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর নামটি উল্লেখিত হওয়ার পর তাঁর ব্যাপারে কিছু বলব না এমন তো হতে পারে না ।

খালিদ ইবনে অলীদ শাম থেকে রোমান বাহিনীর পা উপড়ে দিয়েছিলেন । এটি ইসলামের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় । তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর অধীন ছিলেন । কিন্তু যখন রোমান সৈন্যদের পা উপড়ে গেল এবং তাদের বাহিনী নগরীর-পর-নগরী খালি করে পেছনে সরে যেতে লাগল, তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)কে সিপাহসালার নিযুক্ত করে খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)কে তাঁর অধীন বানিয়ে দিলেন ।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) এক কবিকে দশ হাজার দেরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন । এই সংবাদ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর কানে পৌঁছে গেল । তিনি তৎক্ষণাৎ দূত পাঠালেন যে, খালিদ ইবনে অলীদকে যথারীতি গ্রেফতার করে মদীনা নিয়ে আসো ।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ সেই ব্যক্তিত্ব, যার সামরিক দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও অনুপম বীরত্বের বদৌলতে শাম রাজ্য মুসলমানদের করায়ত্তে এসেছিল এবং রোমান সৈন্যরা কোনো-না-কোনো একটা অঞ্চলে সমবেত হয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হচ্ছিল । লড়াই এতই তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল এবং পরিস্থিতি এমনই নাজুক রূপ ধারণ করেছিল যে, সামান্য একটু ভুলে বা খানিক অদূরদর্শিতার ফলে সব ওলট-পালট হয়ে যেতে পারত ।

সমরবিষয়ক অমুসলিম বিশ্লেষকরা লিখেছেন, এমন একটা স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে খালিদ ইবনে অলীদ-এর মতো সুযোগ্য সেনানায়ককে সাধারণ একটা ত্রুটির জন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া মারাত্মক সামরিক পদস্খলন ছিল । কিন্তু হযরত ওমর জাতির মাঝে শৃঙ্খলা অটুট রাখার পক্ষপাতী ছিলেন । ফলে তিনি এই ঝুঁকি বরণ করে নিলেন যে, খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)কে পদচ্যুৎ করে মদীনায় ডেকে নিলেন এবং তাঁর স্থলে হযরত আবু উবায়দা (রা.)কে সিপাহসালার নিযুক্ত করলেন । তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, আজ একজন সিপাহসালার দীনপরিপন্থী আচরণ করেছে তো কাল এই বিদ'আত নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়বে আর তার ফলে ইসলামের ক্রমবিকাশমান সাম্রাজ্য গুটিয়ে আসতে শুরু করবে ।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)কে বললেন, তুমি সেই সময়টার কথা ভুলে গেছ, যখন আমরা অনেক কষ্টে দু-বেলার রুটির ব্যবস্থা করতাম । আজ তুমি একজন কবিকে দশ হাজার দেরহাম পুরস্কার দিয়েছ । আর তাও এজন্য যে, সে তোমার প্রশংসায় কবিতা গেয়েছে ।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে বললেন, এই অর্থ আমি নিজের পকেট থেকে দিয়েছি।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, যদি নিজের পকেট থেকে দিয়ে থাক, তা হলে এটা অপব্যয় হয়েছে। আর যদি গনিমতের সম্পদ থেকে দিয়ে থাক, তা হলে দুর্নীতি হয়েছে।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর চারিত্রিক মাহাত্ম্য দেখুন। এত বড় শক্তি অর্জন করেছিলেন যে, শাম ফিরে গিয়ে বিজিত অঞ্চলগুলোতে নিজের একাধিপত্য ঘোষণা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এমন কোনো চিন্তা-ই করেননি এবং আমীরুল মুমিনীন তাঁকে পদচ্যুতির যে-শাস্তির ঘোষণা শোনালেন, তাকে অম্লান বদনে মেনে নিলেন। খলীফার নির্দেশে তিনি রণাঙ্গনে ফিরে গেলেন। কিন্তু এখন আর তিনি আপন বাহিনীর সিপাহসালার নন। এখন সিপাহসালার হলেন হযরত আবু উবায়দা (রা.) আর তিনি তাঁর অধীন।

ঐতিহাসিকগণ বিষয়টিকে এভাবে মূল্যায়ন করেছেন, মুসলমানদের এতসব বিজয়ের এটি-ই আসল রহস্য ছিল যে, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা, সততা ও নৈতিকতা ছিল। তারা আল্লাহর নামে লড়াই করত এবং আল্লাহর দেখানো পথেই চলত। শাস্তি, পুরস্কার ও ন্যায় বিচারে তারা কোনো পদমর্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করত না।

* * *

আন্তাকিয়ায় রোমানদের সেনাসংখ্যা বিপুল হয়ে গেল। নগরীর প্রতিরক্ষাও অস্বাভাবিক মজবুত ছিল। এদিকে মুসলমান মুজাহিদদের সংখ্যা নিতান্তই কম। তদুপরি যে-কজন আছে, অনবরত অভিযান ও একের-পর-এক লড়াইয়ের কারণে তারাও ছিল ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) ও অন্য সালারদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমরা আন্তাকিয়া অবরোধ করব এবং রোমান বাহিনীকে অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য করব।

বাহ্যত এটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁর সৈনিকদের সমবেত করে বললেন, এই বিষাক্ত নাগটাকে যদি আমরা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার সামান্যতম সুযোগও দেই, তা হলে এটা তরতাজা হয়ে এমন জবাবি আক্রমণ চালাবে যে, নিজেদের পশ্চাদপদতাকে অগ্রযাত্রায় পরিণত করে নেবে।

'ইসলামের মোহাফেযগণ!'– সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) তাঁর সৈনিকদের উদ্দেশ করে বললেন– 'এটি নবী-রাসূলগণের ভূখণ্ড। এই ভূখণ্ডের উপর মহান আল্লাহর অনেক রহমত নাযিল হয়েছে এবং হতে থাকবে। কিন্তু শর্ত হলো, আল্লাহপাকের এই পবিত্র মাটি থেকে অপবিত্র মানুষগুলোকে উৎখাত করতে হবে। ওদিকে তোমাদের ভাইয়েরা অগ্নিপুজারিদের নির্মূল করে দিয়েছে। এদিকে আমরা এখনও আমাদের কর্তব্য পালনে সমর্থ হইনি। তোমরা নিজেদের বিবেকগুলোকে

জিজ্ঞেস করে সিদ্ধান্ত নাও, আল্লাহর রাজত্ব ভালো, নাকি আল্লাহর অবাধ্য মানুষের পারিবারিক রাজত্ব ভালো। আমাদের বিশ্বাস হলো, আমরা আমরা আল্লাহর রাজত্ব কামনা করি। এটি-ই একমাত্র উপায়, যেটি মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে।

'তোমরা একথা চিন্তা করো না যে, এই রোমানরা খ্রিস্টান; ফলে এরা কিতাবের অনুসারী। এদের প্রকৃতি হলো, এরা দাবি করে, এরা হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী। কিন্তু চলে তাঁর শিক্ষামালার সম্পূর্ণ বিপরীত। রোমের একটি রাজপরিবার আছে, যারা আল্লাহর এই পবিত্র ভূখণ্ডটিকে তাদের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত বানিয়ে রেখেছে। এরা আল্লাহর দীনের সবচেয়ে বড় শত্রু। এ যাবত আমরা তাদের একের-পর-এক পরাজয় উপহার দিয়ে আসছি। কিন্তু এখন তারা এমন একটা জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে, যেটা বাহ্যত অজেয়। এত বড় ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক অভিযানে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশ আমি তোমাদের দিতে পারি না। কারণ, এই অভিযান রক্ত ও জীবনের অপরিমেয় নযরানা দাবি করে। আজ তোমরা ধরে নাও, আল্লাহপাক তোমাদের সরাসরি আদেশ করছেন, সেই পাহাড়গুলোকে তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও, যেগুলো আল্লাহর দীনের শত্রুদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে।'

এই ঐতিহাসিক ভাষণে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর আরও অনেক কথা বলবার ছিল। ইসলামের সৈনিকগণ এমন চেতনা-উদ্দীপক ভাষণ-বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা কমই অনুভব করতেন। তাঁরা পরিপক্ক ঈমানের অধিকারী ও নবুওত-প্রদীপের যথাযথ প্রতিভূ ছিলেন। তাঁদের অন্তরে কোনো সংশয়-সন্দেহ ছিল না। তাঁরা আজকালকার মুসলমানদের মতো ছিলেন না যে, নবীজির নাম শুনে আঙুলে চুমো খেয়ে চোখে লাগাবেন; কিন্তু নবীর আদেশে জীবন কুরবান করতে প্রস্তুত হবেন না। তাঁরা সব সময় আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকতেন এবং জীবন কুরবান করে দিতেন।

এখন তো নবীজি (সা.) তাঁদের সঙ্গে নেই। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর অবর্তমান আযাদির সৈনিকদের উপর এই ক্রিয়া করল যে, এখন তাঁরা আগের চেয়েও অধিক দীনদার হয়ে গেছেন এবং ইসলামি শিক্ষামালার অনুসরণে এখন আগের চেয়ে বেশি তৎপর হয়ে গেছেন।

আন্তাকিয়ার উপর আক্রমণ করার আগে হযরত আবু উবায়দা ও হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) জরুরি মনে করলেন, মুজাহিদদের জানিয়ে দিতে হবে, এ যাত্রায় আমরা এমন একটা দুর্গ জয় করতে যাচ্ছি, যেটা সেই দুর্গগুলোর মতো নয়, যেগুলো ইতিপূর্বে আমরা পদানত করে এসেছি। এবার আমরা এক সুবিশাল পর্বতের সঙ্গে টক্কর লাগাতে যাচ্ছি। এ-কারণেই মুজাহিদদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া

আবশ্যক হয়ে পড়ল যে, আমরা আল্লাহর আদেশে তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে লড়াই করছি আর এখন আল্লাহ আমাদের থেকে আরও বেশি কুরবানি দাবি করছেন।

ইসলামের সৈনিকগণ জীবন ও মৃত্যুর যুদ্ধ লড়তে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

সেদিনই কিংবা তার পরদিন। আবু উবায়দা (রা.) নিজতাঁবুতে বসে সালারদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন এবং আন্তাকিয়া নগরী অবরোধের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। এমন সময় দারোয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করে সংবাদ জানাল, আপনার এক কমাণ্ডার হাদীদ ইবনে মুমিন খাযরাজ রোমসম্রাটের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং তার সঙ্গে একটা রোমান মেয়ে আছে। দারোয়ান আরও জানাল, এরা দুজন রুহা থেকে এসেছে।

আবু উবায়দা (রা.) সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, ওদের তাঁবুতে পাঠিয়ে দাও।

হাদীদ শারিনাকে নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করল এবং সব কজন সালারের সঙ্গে মুসাফাহা করল।

'আমার সফর-কাহিনী অনেক লম্বা'– হাদীদ বলল– 'আপনার হাতে যখন অতটা সময় থাকবে, তখন আমাকে ডেকে পাঠাবেন। এখন কিছু জরুরি কথা আপনাকে বলতে হবে। আপনি আমার কথাগুলো শুনুন।'

শুধু সিপাহসালার আবু উবায়দা-ই নন– ওখানে যেকজন সালার উপস্থিত ছিলেন, সবাই হাদীদকে খুব ভালো করে চেনেন। হাদীদ গেরিলা অভিযানে বেশ দক্ষতার অধিকারী সৈনিক। এ-কাজের জন্য সাহসিকতা ও শারীরিক উদ্যমতা আবশ্যক বটে; কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি। এই সবগুলো গুণ আল্লাহপাক হাদীদের মাঝে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ভরে দিয়েছেন।

শত্রুর আস্তানায় কোনো-না-কোনোভাবে পৌঁছে যাওয়া এবং সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্যাদি বের করে আনা হাদীদের দ্বিতীয় আরেকটি গুণ। এসব গুণ ও যোগ্যতার সুবাদে হাদীদ সব কজন সালারের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় যোদ্ধা। শত্রুর হাতে আটক হওয়ার মতো মুজাহিদ তিনি নন। কিন্তু এমন এক অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে তিনি গেরিলা আক্রমণ চালাতেন যে, শত্রুর পেটের মধ্যে ঢুকে যেতেন। এমনই একটি অভিযানে তিনি ধরা পড়েছিলেন। রোম অফিসাররা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলল, তখন তারা বুঝতে পারল, এ তো অনেক দামি মানুষ। তাঁকে হেরাক্‌ল-এর কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো এবং হেরাক্‌ল সঙ্গে করে তাঁকে রুহায় নিয়ে এলেন যে, এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করতে হবে। হেরাক্‌ল অতিশয় অত্যাচারী ও কসাই চরিত্রের রাজা ছিলেন। কিন্তু হাদীদ ও তার মতো আরও তিনজন মুসলিম বন্দির সঙ্গে নিপীড়নমূলক কোনো আচরণ করলেন না। রেখেছেন তাদের কারাগারে বটে; কিন্তু রেখেছেন অতিথির মতো। তাদের সব

ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলো এবং উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছিল।

'এই মেয়েটা কে?'- আবু উবায়দা জিজ্ঞেস করলেন- 'এ তোমার সঙ্গে কেন এসেছে?'

হাদীদ ঘটনাটা বিস্তারিত শোনালেন।

সঙ্গত কারণেই শারিনাকে সন্দেহের চোখে দেখা হলো। এক তো মেয়েটা রাজপরিবারের সদস্যা; দ্বিতীয়ত সে অতিশয় রূপসী। তার আরও একটি গুণ সামনে এল যে, ও অত্যন্ত সাহসিনী ও বুদ্ধিমতী। কাজেই এই সন্দেহ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, এ শত্রুপক্ষের কোনো পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। নাশকতা চালানোর জন্য হেরাক্‌ল একে কৌশলে আমাদের মাঝে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকতে পারে।

শারিনা তার সেই চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতির কথা ব্যক্ত করল, যা সে পথে হাদীদের কাছে ব্যক্ত করেছিল। সে এই তথ্যও জানাল যে, আমি মূলত রাজপরিবারের সদস্যা নই- আমার মাকে এক কাফেলা থেকে অপহরণ করা হয়েছিল।

'একটু থামো!'- সিপাহসালার আবু উবায়দা হঠাৎ বলে উঠলেন- 'তোমরা কী বলছ? হেরাক্‌ল কি রুহায়?'

কথাটা তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল এবং শারিনাকে থামিয়ে দিয়ে হেরাক্‌ল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হাদীদ তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, হ্যাঁ; তিনি সেখানেই আছেন।

তথ্য শুনে আবু উবায়দা ও অন্যান্য সালারগণ অবাক্ হলেন যে, এ-সময়ে রোমসম্রাটের আন্তাকিয়া থাকার কথা। কিন্তু তিনি সেখান থেকে অনেক দূরে রুহায় বসে আছেন! তাঁরা আনন্দিত হলেন যে, হেরাক্‌ল আন্তাকিয়ায় নেই।

প্রায় সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, সম্রাট হেরাক্‌লকে তার বাহিনীর সঙ্গে থাকা আবশ্যক ছিল। সে-সময় তার অধিকাংশ সৈনিক আন্তাকিয়ায় সমবেত হয়ে গিয়েছিল। আন্তাকিয়া-ই এমন একটা মজবুত জায়গা ছিল, যেখানে তিনি এমন কার্যকর পন্থায় মুসলমানদের মোকাবেলা করতে পারতেন যে, মুসলমানরা আন্তাকিয়ার প্রাচীরগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে নিঃশেষ নাও যদি হতো, তবু এতটুকু দুর্বল অবশ্যই হতো যে, তারা পিছুহটার পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হতো। তারপর হেরাক্‌ল তাদের ধাওয়া করে চিরতরে নির্মূল করে দিতেন।

ঐতিহাসিক ও সামরিক বিশ্লেষকগণ লিখেছেন, হেরাক্‌ল একজন শক্তিধর ও অভিজ্ঞ সেনানায়ক ছিলেন। তিনি যেদিকেই মুখ করতেন, বিজয় তার পায়ে চুমো খেত এবং প্রতিটা লড়াইয়ে তিনি বিজয়ের প্রত্যাশা রাখতেন। কিন্তু মুসলমানরা তাকে একের-পর-এক এতগুলো পরাজয় দান করল যে, তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে

গেলেন। কঠিন-থেকে-কঠিনতর পরিস্থিতিতেও তিনি উপযুক্ত ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হতেন। এটি তার একটি বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু এখন তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না, কী করবেন। একটি-ইমাত্র বুঝ তার মাথায় এসেছে; তিনি তার বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের রুহায় সমবেত করার চেষ্টা করছেন।

হযরত আবু উবায়দা, খালিদ ইবনে অলীদ ও অন্যান্য সালারদের জন্য এটি একটি উৎসাহব্যঞ্জক খবর যে, হেরাক্‌ল আন্তাকিয়ায় নেই। তার অর্থ হলো, আন্তাকিয়ায় রোমান সেনাপতি যারা আছে, তারা মধ্যম সারির সেনাধিপতি। হযরত আবু উবায়দা ও খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) অত্যন্ত দূরদর্শী সেনানায়ক। তাঁদের চোখ অনেক দূর ও অনেক গভীর পর্যন্ত দেখতে সক্ষম ছিল। আবু উবায়দা (রা.) হাদীদকে জিজ্ঞেস করলেন, হেরাক্‌ল-এর মানসিক ও চেতনাগত অবস্থা কেমন?

'একথাটি আমাকে জিজ্ঞেস করুন'– শারিনা বলল– 'যেলোক গণক আর একজন জ্যোতিষীকে সব সময় সঙ্গে রাখে এবং তাদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুপাতে নিজের কর্মসূচি প্রণয়ন করে, তার মানসিক ও চেতনাগত অবস্থা বোঝা কঠিক কিছু নয়।'

হেরাক্‌ল কীভাবে তার গণককে নিজহাতে হত্যা করলেন এবং জ্যোতিষী কীভাবে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে তিক্ত সত্য শুনিয়েছিল, শারিনা তার সবিস্তার বিবরণ দিল। শুনে সবাই থ বনে গেলেন যে, এমন অপ্রীতিকর বক্তব্য দেওয়ার পরও হেরাক্‌ল তাকে হত্যা করল না! তারপর তিনি হাদীদকে বন্দিদশা থেকে বের করিয়ে এনে বললেন, তুমি আমাদের দুর্বলতা ও তোমাদের গুণগুলো আমাকে শোনাও, যার উপর ভিত্তি করে তোমরা একের-পর-এক জয়লাভ করে যাচ্ছ।

এসব শুনিয়ে শারিনা বলল, 'মানসিকভাবে হেরাক্‌ল-এর পা উপড়ে গেছে এবং তিনি পরাজয় মেনে নিয়েছেন। এখন তিনি অসহায়ের মতো হাত-পা ছুড়ছেন মাত্র। সম্ভবত তিনি কোনো অলৌকিক ঘটনার প্রত্যাশা বুকে ধারণ করে সময় অতিবাহিত করছেন।

সিপাহসালার আবু উবায়দার জন্য হেরাক্‌ল-এর মানসিক অবস্থার এই তথ্য খুবই মূল্যবান ও কাজে আসার মতো। মুসলিম সিপাহসালার যে-সময়টিতে আন্তাকিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা ঠিক করছেন, ঠিক তখন হাদীদ ও শারিনার এসে পৌঁছা একটি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা। কিন্তু এটি মূলত আল্লাহপাকের মদদ ছিল যে, তিনি এই দুজনকে একান্ত উপযুক্ত সময়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।

আবু উবায়দা শারিনাকে বুঝতে দেননি, তাকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখছেন। মেয়েটার সঙ্গে তিনি স্নেহসুলভ আচরণই করলেন। অবশেষে তাকে জানানো হলো, আমাদের সালারগণ ও কিছু মুজাহিদের স্ত্রী-কন্যা ও বোন প্রমুখ বাহিনীর সঙ্গে আছে। তোমাকে তাদের সঙ্গে থাকতে হবে। তাকে এ-ও অবহিত করা হলো,

তোমার মান-সম্ভ্রম ও যেকোনো প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রাখা হবে। এখানে অবস্থান করে তোমাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না।

শারিনাকে নারীক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আর হাদীদকে আবু উবায়দা নিজের সঙ্গে রাখলেন। এসব নতুন তথ্য অনুযায়ী সিপাহসালার আবু উবায়দা আন্তাকিয়া আক্রমণের পরিকল্পনায় নতুন করে চোখ বোলাতে শুরু করলেন। সে-সময় তিনি আন্তাকিয়ারই কাছাকাছি একস্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন।

সিপাহসালার আবু উবায়দা অন্যান্য সালারদের জানালেন, আগামি কাল সকালে আমরা আন্তাকিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাব।

* * *

দিনের পর রাত, রাতের পর দিন অতিবাহিত হচ্ছে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেরাক্‌ল-এর অস্থিরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি যাদের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন যে, ওরা আসবে, এখনও তাদের একজনও আসেনি।

হেরাক্‌ল রাগে-ক্ষোভে পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছেন।

বোধহয় আরও সাত-আটদিন চলে গেছে। তাকে সংবাদ জানানো হলো, আন্তাকিয়া থেকে তার এক সেনাপতি রাস্তিন এসেছে। হেরাক্‌ল তখন উপবিষ্ট ছিলেন। সংবাদটা শুনে তিনি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'তাকে এক্ষুনি ভেতরে পাঠিয়ে দাও' বলার পরিবর্তে তিনি নিজেই হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তার সম্মুখে তারই এক সেনাপতি দণ্ডায়মান, যার নাম রাস্তিন। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে বটে; কিন্তু তার অবস্থা বলছে, দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি তার গায়ে নেই। হেরাক্‌লকে দেখে সে রোমান কায়দায় অভিবাদন জানাল। কিন্তু তার জন্য বাহুটা উপরে তুলতে তার খুব কষ্ট হলো। তার চেহারার রং হলুদ-ফ্যাকাশে, যেন তার গায়ে এক ফোঁটা রক্তও নেই।

'তুমি কি আহত রাস্তিন!' হেরাকল তার একেবারে কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন।

'না রোমসম্রাট!'– রাস্তিন ক্লান্তিজনিত দুর্বলতার কারণে অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিল– 'শরীরে কোনো জখম নেই। কিন্তু হৃদয়টা আমার গুরুতর আহত মহারাজ!'

হেরাক্‌ল দারোয়ানকে আদেশ করলেন, রাস্তিনকে ধরে ভেতরে নিয়ে বসিয়ে দাও।

ওখানে নিরাপত্তা বাহিনীর কিছু সদস্য দাঁড়ানো ছিল। ওরা ছুটে এল এবং রাস্তিনকে ঠেক দিতে লাগল। কিন্তু রাস্তিন তাদের হাতগুলো সরিয়ে দিয়ে ঢুলুঢুলু পায়ে হেরাক্‌ল-এর কক্ষের দিকে এগুতে শুরু করল। লোকটা এমনভাবে হাঁটছে, যেন তার দুই পায়ের গোঁড়ালিতে ভারী কিছু বাঁধা আছে। সে মাথাটা অবনত করে পা টেনে-টেনে কক্ষে ঢুকে গেল এবং পড়ে যাওয়ার মতো করে বসে পড়ল।

হেরাক্‌ল সর্বাগ্রে তাকে মদ পেশ করলেন। পরে দারোয়ানকে ডেকে বললেন, এর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসো। হেরাক্‌ল বসে-বসে চুপচাপ লোকটাকে দেখছেন, যেন তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছেন। তিনি অনুমান করে নিয়েছেন, রাস্তিন কোনো ভালো সংবাদ নিয়ে আসেনি।

'রোমসম্রাট!'– রাস্তিন কয়েক চুমুক মদ পান করে বলল– 'আন্তাকিয়া আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।'

হেরাক্‌ল তার প্রতিক্রিয়াটা এভাবে দেখালেন যে, তিনি মুখটা খুলে হা করে রাস্তিনের প্রতি তাকিয়ে রইলেন।

'এই পরাজয়ের দায় আমার উপর কিংবা আমার সহকর্মী সেনানায়কদের উপর চাপানোর আগে আপনি আমার বক্তব্য পুরোপুরি শুনুন'– রাস্তিন বলল– 'মুসলমানদের বীরত্ব স্বীকার করতে আমি বাধ্য মহারাজ! তাদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে অনেক কম ছিল। আর আমাদের সৈন্য এত বেশি ছিল যে, তার সঠিক সংখ্যা আমি আপনাকে বলতে পারব না। কারণ, সব দিক থেকে আমাদের সৈন্যরা পালিয়ে-পালিয়ে আন্তাকিয়া এসে সমবেত হচ্ছিল। আমি একথা মানতে পারব না যে, মুসলমানদের জানা ছিল না, আন্তাকিয়ায় আমাদের এত অধিক সৈন্য আছে এবং এই নগরীটা প্রতিরক্ষার দিক থেকে এত শক্ত যে, বাইরে থেকে আক্রমণ করে কারও পক্ষে একে জয় করা সম্ভব নয়। সব কিছু জেনে-বুঝেই মুসলমানরা অভিযানটা পরিচালনা করেছে।

'কেন; তোমরা কি আমার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করনি?'– হেরাক্‌ল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমি তোমাদের বলেছিলাম, মুসলমানরা যদি আন্তাকিয়া অভিমুখে অগ্রযাত্রা করে, তা হলে তাদের আন্তাকিয়া পৌঁছতে দেবে না এবং ফৌজকে বাইরে বের করে দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালাবে আর পাহাড়-পর্বতগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাবে।'

'হ্যাঁ, কায়সারে রোম!'– রাস্তিন বলল– 'আমরা আপনার নির্দেশনা পুরোপুরিই অনুসরণ করেছি। আমরা যেইমাত্র সংবাদ পেলাম, মুসলমানরা আন্তাকিয়ার দিকে আসছে, অমনি বাহিনীকে প্রস্তুত করলাম এবং তাদের নগরীর বাইরে নিয়ে এলাম। আপনার তো জানা আছে, পর্বতরাশির মধ্যখানে একটা খোলা মাঠ আছে। আমরা আমাদের সৈন্যদের সামরিক বিন্যাসে সেই মাঠটাতে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। আন্তাকিয়া যেতে হলে এই ময়দান অতিক্রম করেই তবে যেতে হয়। তার আশপাশে উঁচু-নিচু পাহাড় আছে।

'মুসলমানরা যখন এই ময়দানে আমাদের সম্মুখে চলে এল, তখন দেখে আমরা খুব খুশি হলাম যে, তাদের সংখ্যা তার চেয়েও কম, আমরা যা ধারণা করেছিলাম। আমার সঙ্গী সেনাপতিরা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, আরব মুসলমানরা আসলেই অজ্ঞ।

ওরা জানেই না, আন্তাকিয়ায় আমরা কী পরিমাণ সৈন্য সমবেত করেছি। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের অজ্ঞ মনে করতাম না। তবে এই ভেবে আমিও খুব উৎফুল্ল হয়েছিলাম যে, তারা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে আমাদের সম্মুখে এসে পড়েছে। এই ময়দানে তাদের পিষে ফেলা আমাদের পক্ষে কঠিন কোনো কাজ ছিল না।

'আমরা কৌশল অবলম্বন করলাম যে, মধ্যবর্তী দুটি ইউনিটকে আক্রমণের আদেশ দিলাম এবং সঙ্গে উভয় পার্শ্বের ইউনিটগুলোর কাছে নির্দেশনা পাঠালাম, তারা যেন ডান ও বাম দিক থেকে মুসলমানদের পেছনে চলে যায় এবং তাদের ঘিরে ফেলে।

'পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ হলো। মুসলমানরা আমাদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পেছনে সরে যেতে লাগল। আমরা তাদের উপর চাপ আরও বাড়িয়ে দিলাম এবং তাদের পেছনে লেগে থাকলাম। তারা পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢুকে গেল। কিন্তু আমাদের ইউনিটগুলো তাদের পেছনে আঁঠার মতো লেগে থাকল। আমাদের বিশ্বাস ছিল, মুসলমানরা পলায়নের চেষ্টায় করছে।

'যখন আমাদের অধিকতর ইউনিট পর্বতমালার অভ্যন্তরে ঢুকে গেল, তখন আমরা বুঝলাম, মুসলমানরা আমাদের একটা জালে আটকে ফেলেছে, যেখান থেকে আমরা সহজে বের হতে পারব না। তারা কৌশলটা এই অবলম্বন করেছিল যে, স্বল্পসংখ্যক সৈনিকের তিন-চারটা ইউনিট আমাদের সামনে উপস্থাপন করল। আমরা অধিক-থেকে-অধিকতর সৈনিক তাদের পেছনে পর্বতমালার ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম এবং স্লোগান তুললাম, একজন মুসলমানকেও এখান থেকে জীবিত বের হতে দেব না। মুসলমানরা পর্বতমালার ঢালু ও ঘন গাছ-গাছালির আড়ালে আগে থেকেই তিরন্দাজ ও বল্লমধারী লোক বসিয়ে রেখেছিল। আমাদের সম্মুখে পাহাড়ে প্রবেশকারী মুসলিম সৈনিকরা তো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু আমাদের তির-বর্শার যে-বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তা আমাদের একজন সৈনিককেও পাহাড়ের উদর থেকে বাইরে বের হতে দিল না।

'আমাদের এক সেনাপতি ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে এই বোকামিটা করল যে, আমাদের অবশিষ্ট ফৌজকেও মুসলমানদের পেছনে পর্বতমালার অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা অনেক কষ্টে ওখানে থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাদের বিন্যাস ও শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং সৈনিকরা আপন-আপন উদ্যোগে সেখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছিল।

'এই লড়াইয়ে আমরা পরাজিত হয়েছি। কিন্তু আমরা আন্তাকিয়া নগরীটা কোনো মূল্যেই মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছিলাম না। যে-পরিমাণ সৈন্য সমবেত করা সম্ভব ছিল, আমরা তাদের সমবেত করলাম। কিন্তু সংখ্যায় তারা খুবই নগণ্য। এই যুদ্ধে আমাদের বিপুলসংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে এবং তার চেয়েও অধিক আহত হয়েছে।

'আমরা সমবেত সৈনিকদের নিয়ে আন্তাকিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কিন্তু দুর্গের ফটকে পৌঁছে দেখলাম, সবগুলো ফটক বন্ধ। ব্যাপারটা কী! আমরা অনেক হাঁক-চিৎকার দিলাম যে, ফটক খুলে দাও। কিন্তু ফটক খোলার পরিবর্তে প্রাচীরের উপর থেকে আমাদের উপর তিরবৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম, মুসলমানরা নগরীতে ঢুকে পড়েছে এবং ফটক তারা-ই বন্ধ করেছে।'

'তার মানে আন্তাকিয়াও আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল, না?'– হেরাক্‌ল বিস্ময়াবিষ্ট ও অনুতাপদগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন এবং রাস্তিনের কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন– 'এই একটা শক্ত দুর্গই আমাদের হাতে অবশিষ্ট ছিল। এ তোমাদের অযোগ্যতার প্রতিফল। তোমর কাপুরুষ হয়ে গেছ।'

'আমার দুজন সহকর্মী জেনারেল মারা গেছে'– রাস্তিন বলল– 'আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছে। আমি জানতাম, এই পরাজয়ের দায় আপনি আমাদেরই ঘাড়ে চাপাবেন। সেজন্যই আমি বলেছি, আগে আমার বক্তব্য পুরোপুরি শুনুন। আপনার রোষ ও শাস্তির খড়গ আমার উপর কীভাবে আপতিত হবে, তাও আমার জানা আছে। কিন্তু তার আগে আমি আপনাকে পরাজয়ের কারণগুলো জানাতে চাই।

'আপনার নির্দেশনা অনুসারে আমরা শহরের বাইরে এসে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রোধ করলাম। আপনি বলতেন, মুসলমানরা যেন আন্তাকিয়া অবরোধ করতে না পারে। তার কারণ এই বর্ণনা করেছিলেন যে, যদি নগরী অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তা হলে আন্তাকিয়ার সমস্ত বাহিনী ভেতরেই আবদ্ধ হয়ে যাবে। আর অবরোধ কত দিনের জন্য দীর্ঘায়িত হয়, তা তো বলা যায় না। আপনি বলেছিলেন, আমাদের হাতে অত সময় নেই। এত শক্ত একটা দুর্গের বাইরে এসে লড়াই করা আমাদের বোকামি ছিল। তার মস্ত সাজা আমরা পেয়েছি।

'কায়সারে রোম!'– আরও একটা দিক আছে, যাকে আমরা উপেক্ষা করেছি। আমি শহরের নাগরিকদের সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি। আপনি তাদের উপর এত ভারী করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন, যেটা বহন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। তারপর আপনি ধর্মের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করলেন। এত বিশাল একটা রাজ্য আমাদের হাত থেকে চলে গেল! আমি জানি, এর জন্য আপনি কতটা ব্যথিত। কিন্তু আমি আপনাকে সেই কারণগুলো জানানো আবশ্যক মনে করছি, যার পরিণতিতে আজ আমাদেরকে এই দুর্দিনটা দেখতে হলো।

'এক তো হলো, এসব কর ইত্যাদি, যার ফলে নাগরিকদের মাঝে এই প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে যে, সম্রাট, তার সেনা-অফিসারবৃন্দ ও রাজপরিবারের সদস্যরা জনসাধারণকে ভুখা রেখে নিজেরা বিলাসিতার জীবন যাপন করছে। এখানকার স্থানীয় লোকেরা বলছে, আমাদের দেশের সম্পদ রোম চলে যাচ্ছে। তা ছাড়া আমি

দেখেছি, রোমের যেসব লোক এখানে এসে ব্যবসা কিংবা চাকুরি করছে, তারা নিজেদের রাজা মনে করে থাকে।'

'তোমার কথা আমি বুঝে ফেলেছি'– হেরাক্ল ঝাঁজালো কণ্ঠে বললেন– 'তুমি বলতে চাচ্ছ, তোমরা আন্তাকিয়ার নাগরিকদের থেকে কোনো সহায়তা পাওনি। কথা দ্রুত শেষ করো। অত দীর্ঘ কথা শোনার সময় আমার নেই। এখন আমরা কী করব, সেই ভাবনা আমাকে ভাবতে হবে।'

'ব্যাপার শুধু এটুকু নয় যে, আমরা নাগরিকদের থেকে কোনো সাহায্য পাইনি'– রাস্তিন বলল– 'নগরবাসী আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। আমরা যদি দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে লড়াই করতাম, তা হলে এই নাগরিকরা আমাদের সঙ্গে বিদ্রোহ করে শহরের ফটক খুলে দিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তো নগরীর বাইরেই ছিলাম– ভেতরের পরিস্থিতি আমি নিজচোখে দেখিনি। কিন্তু আপনাকে আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলছি, আন্তাকিয়ার জনসাধারণ পরম সাদরে ও পুরোপুরি ব্যাকুলতার সঙ্গে মুসলমানদের স্বাগত জানিয়ে থাকবে। অথচ তাদের মাঝে মুসলমান হয়ত একজনও নয়– সবাই আমাদেরই ধর্মের লোক।'

'আমাকে আর একটিমাত্র সুযোগ পেতে দাও'– 'হেরাক্ল বললেন– 'এরা কর আর রাজপরিবারের বিলাসিতার কথা বলছে, না? আমি এদের শিরা থেকে রক্তও নিংড়ে নেব।'

শাহেনশাহে রোম!'– রাস্তিন বলল– 'আজ যদি আপনি আমার শিরা থেকেও রক্ত নিংড়ে নেন আর আমাকে একটা হাড়ের কঙ্কালে পরিণত করে বাইরে ফেলে দেন, তবু আমি সেই কথাটি বলতে দ্বিধা করব না, যেটি অন্য কেউ আপন রাজার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে সাহস করে না। মানুষ রাজা-বাদশাদের সম্মুখে তাদের প্রশংসা-ই করে যায় শুধু, যাতে তারা খুশি হয় এবং পুরস্কার দিয়ে ধন্য করে। আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হোন বা রুষ্ট, আমি আপনার একজন সেনাপতি। আপনি আমাকে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছেন এবং বেতন-ভাতাও হাত খুলে প্রদান করছেন। আমার দায়িত্ব রোমসাম্রাজ্যের সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ। কিন্তু আমি পরাজিত হয়ে এসেছি। এতে আমি ব্যক্তিগতভাবেও লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করছি। আপনার মর্যাদাও আমার একটি প্রিয় বিষয়। আমার জন্য নিমকহারামি হবে যদি বাস্তবতার উপর পর্দা ফেলে আমি আপনাকে সুদর্শন কল্পনার মাঝে আটকে রাখি।'

'তুমি আসল কথাটা ঝটপট বলে ফেলতে পার না নাকি?' হেরাক্ল বিরক্ত কণ্ঠে বললেন।

'আসল কথাটা শুনুন'– রাস্তিন বলল– 'শত্রুকে শুধু এজন্য মন্দ বলা যাবে না যে, সে শত্রু। শত্রুরা আমাদের উপর জয়লাভ করেছে এবং তাদের অগ্রযাত্রা আর আমাদের পিছুহটা অব্যাহত রয়েছে। আপনি দেখুন ও চিন্তা করুন যে, শত্রুদের মাঝে এমন

কোন শক্তিটি আছে, যার বলে তারা এভাবে জয় ছিনিয়ে নিচ্ছে আর আমাদের মাঝে সেটি নেই। আমরা জনগণের শিরা থেকে রক্ত নিংড়ে বের করার প্রত্যয় গ্রহণ করছি। কিন্তু আমাদের শত্রুরা সঙ্গে করে একটি আদর্শ ও বিশ্বাস নিয়ে এসেছে, যারা জনতার শিরা থেকে রক্ত নিংড়ায় না। আমাদের শত্রুদের আদর্শ হলো মানুষকে মানবতার মর্যাদা প্রদান করা।'

'তার মানে আমরাও ইসলাম গ্রহণ করে নেব নাকি!– হেরাক্‌ল অবজ্ঞামিশ্রিত কণ্ঠে মুখ বিকৃত করে বললেন– 'তুমি ইসলামকে খ্রিস্টধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করছ বুঝি?

'মহামান্য সম্রাট!'– রাস্তিন বলল– 'এখানে প্রশ্নটা এই নয় যে, শ্রেষ্ঠ ইসলাম, নাকি খ্রিস্টবাদ। আসল প্রশ্নটা হলো, সেই লোকগুলো কারা, যারা মানবতাকে পুরোপুরি মর্যাদা দেয়? আপনি যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এর উত্তর খুঁজে বের করেন, তা হলে বলতে বাধ্য হবেন, এ-সময়ে সেই লোকগুলো হলো একমাত্র মুসলমান। শুধু মুসলমানই মানুষকে মানুষ মনে করে। শামের এক শহর থেকে যখন মানুষ আরেক শহরে যায়, তখন তারা ওখানকার মানুষদের বলে, তোমরা মুসলমানদের পুরোপুরি আনুগত্য মেনে নাও। কারণ, তারা মানুষকে মানবতার অধিকার প্রদান করে। আর তারা রোমানদের মতো রাজা নয়। মানুষ এও প্রচার করে বেড়াচ্ছে এবং সত্য বলছে যে, মুসলিম সেনারা কোনো অঞ্চল বা জনবসিত জয় করলে সেখানে তারা লুটপাট করে না এবং কোনো নারীর গায়ে হাত তোলে না। মহারাজ! এ-যাবত মুসলমানরা আমাদের যে-কটা অঞ্চল জয় করেছে, সবগুলো অঞ্চলের নাগরিকদের সঙ্গে তারা সম্মানজনক আচরণ করেছে এবং জনতাও তাদের মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছে। বিপরীতে আমরা যেখানেই যাই, সবার আগে জনগণের বাড়ি-ঘরে হানা দিয়ে তাদের সম্পদ ও সুন্দরী নারীদের হাত করি। তারপর তার কিছু রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দিই আর বাদ বাকিগুলো নিজেদের মালিকানায় রেখে দিই। আন্তাকিয়ায় আমার গোয়েন্দারা আমাকে অবহিত করেছে, এখানকার জনতা শুধু মুসলমানদের সমর্থনই করছে না, বরং তাদের অপেক্ষায় প্রহরও গুণছে। আমাদের পরাজয়ের আসল কারণ এটি-ই।'

* * *

হেরাক্‌ল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে-আসা তার এক সেনাপতির বক্তব্য শুনলেন। কিন্তু তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না। তার উপর নীরবতা ছেয়ে গিয়েছিল। তবে তার মুখের ভাব, বসা থেকে উঠে দাঁড়ানো, কক্ষে পায়চারি করা, তারপর আবার বসে পড়া, আবার উঠে ইতস্তত পদচারণা শুরু করা এমন কতগুলো লক্ষণ ছিল, যেগুলো তার মনের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার প্রমাণ দিচ্ছিল। তার ব্যাপারে এমন আশা পোষণ করার কোনো সুযোগ ছিল না যে, তিনি ইসলামের নীতি-

আদর্শের বাস্তবতা ও উপকারিতা নিয়ে একটু ভেবে দেখবেন এবং নিজের চিন্তাধারায় পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করবেন।

আমাদের এই উপাখ্যান মিসর-জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেজন্য আমাদেরকে আন্তাকিয়ার কাহিনী আর বিলম্বিত না করে এখানেই ইতি টানতে হবে। তার আগে একথাটা বলে রাখা আবশ্যক যে, মুসলমানদের আন্তাকিয়াজয় ইসলামের নীতি-আদর্শেরই জয় ছিল। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) নাগরিকদের উপর জিযিয়া আরোপ করে দিলেন। এ ছাড়া অন্য সকল কর ও আর্থিক দায়ের বোঝা জনগণের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলেন। শহরে যারা খ্রিস্টান ছিল, তারা রোমের পক্ষে তলে-তলে জনতাকে এই মর্মে উস্‌কানি দিতে শুরু করেছিল যে, তোমরা মুসলমানদের জিযিয়া দিয়ো না এবং তাদের শাসন মেনে নিয়ো না। তাদের তালে পড়ে কিছুলোক জিযিয়া দিতে অস্বীকৃতি জানাল। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর নির্দেশে এই লোকগুলোকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

এখন মুসলিম বিজেতাদের হাতে দুটি কাজ। একদিকে নগরীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে শাসনভার বুঝে নিতে হবে, অপর দিকে পেছনে সরে যাওয়া রোমান সৈন্যরা যাতে কোথাও গিয়ে স্থির ও পুনর্গঠিত হতে না পারে, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মুসলিম সেনাপতিদের জন্য এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

গুপ্তচররা সংবাদ নিয়ে এসেছে, আন্তাকিয়া থেকে পালিয়ে-যাওয়া রোমান সৈন্যরা হালব গিয়ে সমবেত হচ্ছে। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) কিছু সৈন্য নিয়ে হাল্‌বের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)কে তিনি অন্য একদিকে পাঠিয়ে দিলেন, যেখানে রোমান সৈন্যরা গা ঝাড়া দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে থেমে গিয়েছিল।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন হালব গিয়ে পৌঁছলেন, তখন আন্তাকিয়া থেকে এক দূত এই বার্তা নিয়ে তাঁর কাছে এসে হাজির হলো যে, আন্তাকিয়ার জনসাধণ অবাধ্যতা শুরু করে দিয়েছে এবং পরিস্থিতি বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) নায়েবে সালার ইয়াষ ইবনে গানামকে এই দায়িত্ব দিয়ে আন্তাকিয়া পাঠিয়ে দিলেন যে, আপনি গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করুন। কিন্তু সাবধান! বিনা কারণে ও বিনা প্রয়োজনে যেন কারও প্রতি কোনো প্রকার অবিচার না করা হয়।

সেইসঙ্গে আবু উবায়দা (রা.) একটি বার্তা মদীনায় আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকটও প্রেরণ করলেন। তাতে তিনি একদিকে আন্তাকিয়ার বিজয়ের সুসংবাদ শোনালেন, অপরদিকে এই তথ্যটিও জানালেন যে, এখানকার নাগরিকরা জিযিয়ার ব্যাপারে বিদ্রোহ করে বসেছে।

এই বার্তাটি পাওয়ামাত্র আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) তার উত্তর লিখলেন। তাতে তিনি লিখেছেন, নাগরিকদের তাদের ন্যায্য পাওনা ও সুযোগ-সুবিধা যথাযথভাবে প্রদান করো। কিছু লোকের জন্য যদি ভাতা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, তা হলে সেগুলো যথাসময়ে ঠিক-ঠিকমতো পরিশোধ করো। পত্রে তিনি একথাও লিখেছেন, নগরীতে মুজাহিদদের দু-তিনটি ইউনিট যেন সব সময় বিদ্যমান থাকে, যাতে মানুষ এমন ধারণা করার সুযোগ না পায় যে, মুসলমানদের কাছে বিজিত অঞ্চলসমূহ ধরে রাখার মতো সৈনিক নেই।

অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে বিদ্রোহ দমন করা হলো। আরও কিছু অঞ্চলেও বিদ্রোহ হয়েছিল। সেগুলোরও উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হলো। এখানে আমরা সেসবের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করব না। এখানে শুধু এতটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, হেরাক্ল শেষ পর্যন্ত কোন পরিণতিতে পৌঁছেছিলেন এবং সে পর্যন্ত তাকে কীভাবে পৌঁছানো হয়েছিল। কৌশল হিসেবে তিনি তার বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার প্রত্যাশা ছিল, মুসলমানরাও সেই অনুসারে বিভক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মুসলমানরা তার সেই চাল নস্যাৎ করে দিয়েছিল। আল্লাহর পথের সৈনিকদের আল্লাহপাক সাহায্য করেছিলেন, পথের দিশা দিয়েছিলেন। অন্যথায় এত অল্পসংখ্যক লোকের এত অধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়া মুসলমানদের জন্য খুবই ধ্বংসাত্মক ও বিপজ্জনক পদক্ষেপ ছিল।

* * *

হেরাক্ল-এর সেনাপতি রাস্তিন তাকে আন্তাকিয়ার সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে পুনরায় রণাঙ্গনে চলে গিয়েছিল। হেরাক্ল এখন অন্যান্য অঞ্চলের দূতদের আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। কিন্তু কোথাও থেকে একজন দূতও আসছে না। তার জীবনটা এখন আপাদমস্তক অপেক্ষায় পরিণত হয়ে গেছে।

সেই অঞ্চলগুলো সবই ছিল সীমান্তবর্তী। তার অর্থ এই যে, রোমের ফৌজ শাম থেকে পুরোপুরি উৎখাত হয়ে গেছে। এখন তারা সীমান্তে পা জমানোর চেষ্টা করছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অলফ্রেড বাটলার লিখেছেন, হেরাক্ল হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার সহচর ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা বলতেন, তার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে, তিনি বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছিলেন এবং তার রাজত্বের যে-তারকাটি শামের আকাশে চমকাচ্ছিল, সেটি কক্ষচ্যুত হয়ে শামেরই দিগন্তের কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে একদিন হাল্ব থেকে তার এক অফিসার এল। লোকটা আহত। সে হেরাক্লকে ঠিক তেমন কাহিনী শোনাল, যেমনটা রাস্তিন আন্তাকিয়ার কাহিনী শুনিয়েছিল। সে জানাল, প্রাণে বেঁচে-যাওয়া অল্প কিছু সৈনিক এদিক-ওদিক থেকে হাল্ব আসছিল। এই অবস্থায় মুসলমানদের ক্ষুদ্র একটি সেনাদল এখানে এসে

পৌঁছল। আমাদের সৈন্যদের উপর মুসলমানদের এমন ভীতি ভর করে ছিল যে, আমরা জমে লড়াই করতে পারলামই না।

'ওখানকার জনগণের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?' হেরাক্ল জিজ্ঞেস করলেন।

আমাদের পক্ষে ভালো ছিল না'– অফিসার উত্তর দিল– 'আমার ধারণা, কিছুলোক উলটো মুসলমানদের কোনো-না-কোনোভাবে সহায়তাও করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে তারা গোয়েন্দাগিরি করত তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।'

'তুমি কি এর কোনো কারণ বলতে পার?' হেরাক্ল জিজ্ঞেস করলেন।

রাস্তিন সেনাপতি ছিল। সেজন্য সে হেরাক্লকে স্পষ্ট ভাষায় ও সাহসিকতার সঙ্গে কারণ বর্ণনা করেছিল। কিন্তু এই লোকটা একজন সাধারণ অফিসার। তাই সে সত্য বলতে সাহস করল না। হেরাক্ল তার রাজকীয় ক্ষোভ ঝেড়ে আবারও কথাটা জিজ্ঞেস করলেন। এবার অফিসার অস্থির হয়ে উঠল এবং ফ্যালফ্যাল চোখে হেরাক্ল-এর মুখের পানে তাকিয়ে থাকল। হেরাক্ল তাকে অভয় দিয়ে বললেন, তুমি নির্ভাবনায় কারণটা ব্যক্ত করো, যাতে ভবিষ্যতে এমন কারণ আর তৈরি হতে না পারে।

'মহান সম্রাট!'– অবশেষে অফিসার সভয়ে মুখ খুলল– 'আমাদের পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণটা হলো, আমরা যারা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করি, আহত হই ও জীবন বিলাই, আমরা এতটুকু সাহসের অধিকারী নই যে, শাহেনশাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে সত্য উচ্চারণ করব। আপনি আমাকে সত্য বলার আদেশ করেছেন। আমি কয়েকটা শব্দে কারণটা বর্ণনা করব। মানুষ বলছে, আমরা রাজার নয়– জনগণের শাসন চাই। আমি শুনেছি, মুসলমান এমন একটি ধর্মের অনুসারী, যে-ধর্মে রাজত্বের কোনো অবকাশ নেই। বরং তারা নিজেরা কোনো একজন বান্দাকে শাসক বানিয়ে নেয়। আর তাদের শাসকরা প্রজাদের পেট কাটে না; বরং পেট পূর্ণ করে।'

হেরাক্ল মাথাটা নত করে ফেললেন। মনে হলো, তিনি অফিসারের বক্তব্যের তলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। হেরাক্ল মস্তক অবনত করার মতো রাজা ছিলেন না। কিন্তু এখন তার মাথাটা নোয়ানো। তাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে, পরাজয় তিনি বরণ করে নিয়েছেন।

আরও এক দিন কি দুদিন পর। অপর এক অঞ্চল মারআশ থেকে এক রোমান দূত এল। মারআশ দুর্গঘেরা মজবুত একটা শহর। হেরাক্ল তার বাহিনীর একটা অংশ সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দূত বলল, মুসলমানদের একটি বাহিনী এল এবং তারা মারআশকে অবরুদ্ধ করতে শুরু করল। কিন্তু ওখানকার সেনাপতি আদেশ জারি করলেন, এরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য; তাই এদেরকে শহর অবরোধ করতে দেওয়া যাবে না। বরং আমরা দুর্গ থেকে বের হয়ে বাইরেই ওদের ঘিরে ফেলব এবং নিঃশেষ করে ফেলব। সেনাপতির আদেশে ফৌজ বাইরে বের হয়ে এল।

কিন্তু মুসলমানরা কৌশল অবলম্বন করল যে, তারা লড়াই করতে-করতে পেছনে সরতে লাগল এবং ডানে-বাঁয়ে ছড়িয়ে যেতে লাগল। তারপর হলো এই, আমাদের ঘেরাওয়ে আসবার স্থলে তারা তাদের উভয় বাহুকে ছড়িয়ে দিয়ে উলটো আমাদের বাহিনীকে ঘিরে ফেলল। অপরদিকে যেসব মুসলমান রোমান ফৌজের পেছনে চলে গিয়েছিল, তারা দুর্গে ঢুকে গেল।

দূত আরও জানাল, রোমান ফৌজ যখন পেছনে সরে যেতে শুরু করল, দুর্গের প্রাচীরের উপর থেকে তাদের উপর তির ও বর্শা বর্ষিত হতে শুরু করল। তার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, রোমান সৈন্যরা না বাইরে লড়াই করার যোগ্য রইল, না দুর্গে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো। ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটল। বহু সৈন্য গুরুতর আহত হলো। যারা রণাঙ্গন থেকে প্যালিয়ে গিয়েছিল, শুধু তারা-ই প্রাণে রক্ষা পেয়েছে।

ইতিহাসে লিখিত আছে, হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) মারআশ আক্রমণ করে নগরীটা দখল করে নিয়েছিলেন এবং রোমান ফৌজের যেসব সৈন্য সেখানে ছিল, তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

তারপার রুহায় বসে হেরাক্‌ল এই সংবাদ পেলেন যে, বৈরুতেরও উপর মুসলমানদের কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল থেকে মুসলমানরা রোমান সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়েছে। সীমান্ত এলাকায় শামের প্রতিরক্ষার জন্য কয়েকটা দুর্গ স্থাপন করা হয়েছিল। সেগুলোরও উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

বৈরুত দখলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান। সে-সময় তিনি দামেশকে ছিলেন। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর আদেশে তিনি দামেশক ত্যাগ করে বৈরুত চলে যান।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুসলমানদের এসব কীর্তি অলৌকিকতার চেয়ে কম ছিল না। বৈরুত ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার অর্থ ছিল, সমুদ্রের দিক থেকে রোমানরা আর কোনো সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা রইল না। সে-সময় মিসরেরও উপর রোমানদের শাসন ছিল। হেরাক্‌ল মিসর থেকে/সাহায্য চেয়ে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু মুসলমানরা সেই পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।

* * *

হেরাক্‌ল অত্যন্ত দক্ষ, দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ সেনানায়ক ছিলেন। কিন্তু মুসলিম সেনাদের বিক্ষিপ্ত করে দিতে তিনি যে-কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, তার জন্য সেটা বুমেরাং হয়েছিল। মুসলিম সেনাপতিরা তার সেই কৌশলটাকে তার বিপক্ষে ব্যবহার করেছিলেন। মুসলিম সেনাপতিরা হেরাক্‌ল-এর বাহিনীকে রক্তসাগরে

গোসল করিয়েছিলেন। তারপর যে-কজন প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল, তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। হেরাক্ল মহান আল্লাহর এই বিধান সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন যে, তিনি যাকে খুশি সম্মান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু আল্লাহপাক কাউকে মর্যাদাও অকারণে দান করেন না, আবার লাঞ্ছিতও বিনা কারণে করেন না। তার জন্য আল্লাহপাক কিছু শর্তও ঠিক করে রেখেছেন। আল্লাহ তাকেই ভালবাসেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কামনা করে এবং ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে।

হেরাক্ল তার উপদেষ্টামণ্ডলি ও পারিষদবর্গকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। সভায় পরিস্থিতির যথাযথ চিত্র তুলে ধরে তিনি তাদের পরামর্শ চাইলেন, আপনারা বলুন, এই অবস্থায় বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের কোথায় একত্রিত করা যায় এবং সমবেত হওয়ার পর ফৌজ আর যুদ্ধ করার উপযুক্ত থাকবে কি-না।

এক উপদেষ্টা সঙ্গে-সঙ্গে বক্তব্য শুরু করল। সর্বাগ্রে হেরাক্ল-এর স্তুতি জ্ঞাপন করল। তারপর মুসলমানদের গালমন্দ করল। তারপর যা বলল, তার সার হলো, জগতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে রোমান বাহিনীকে পরাজিত করতে পারে।

'তুমি ওঠো'– হেরাক্ল গর্জে উঠলেন এবং উক্ত উপদেষ্টাকে বললেন– 'এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এরপর যেন আমি তোমাকে কোথাও না দেখি।'

হেরাক্ল অন্যান্য উপদেষ্টাদের প্রতি মুখ করলেন। বললেন, আমি আপনাদের কাছে ঠিক-ঠিক পরামর্শ চাই। পরিস্থিতি আপনাদের সবারই জানা আছে।

উপদেষ্টা ও পারিষদবর্গের উপর নীরবতা ছেয়ে গেছে, যেন এই মুহূর্তে এখানে কোনো মানুষই নেই– আগে থেকেই ছিল না কিংবা যারা ছিল, হঠাৎ সবাই একসঙ্গে মারা গেছে। সম্রাট হেরাক্ল তাদের প্রতি তাকিয়ে আছেন। সবারই ধারণা, হেরাক্ল আবারও গর্জে উঠবেন এবং আদেশ করবেন, আপনারা আমাকে সঠিক পরামর্শ দিন। কিন্তু একটা সভার একজন সদস্যেরও সত্য বলার সাহস নেই। একজন মানুষও সত্য উচ্চারণের হিম্মত রাখে না। সম্ভবত হেরাক্ল বুঝে ফেলেছিলেন এরা কোন মানসিক অবস্থার শিকার হয়ে আছে। বোধহয় তার মনে এই অনুভূতিও জাগ্রত হয়েছিল যে, এই লোকগুলোর মাঝে স্তুতি কীর্তন আর চাটুকারিতার অভ্যাস আমিই তৈরি করেছি। এখন তার সম্মুখে অতিশয় তিক্ত ও বেদনাদায়ক বাস্তবতা, যা তাকে সত্য বলতে ও সত্য শুনতে বাধ্য করছে।

'আমরা এখন কোথাও দাঁড়াতে পারব না'– হেরাক্ল নিজেই সিদ্ধান্ত শুনিয়ে উপদেষ্টদের মানসিক যাতনা থেকে বের করে আনলেন– 'আমাদের সম্মুখে একটামাত্র পথ খোলা আছে– আমরা শাম থেকে বেরিয়ে মিসর গিয়ে বাহিনীকে পুনর্গঠিত করব এবং পরে শামে আক্রমণ চালাব।'

'এমন অভিজ্ঞতা আমাদের আগে থেকেই আছে'– এক প্রবীণ উপদেষ্টা মুখ খুলল– 'ইরানিরা আমাদের থেকে শুধু শামই নয়– মিসরও ছিনিয়ে নিয়েছিল। আপনি তখন রাজা ছিলেন না। কিন্তু রাজাকে ক্ষমতাহীন করে রাজ্যের সকল শক্তি ও ক্ষমতা নিজের মুঠোয় নিয়ে রেখেছিলেন। আপনি বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং মিসর ও শাম আক্রমণ করে ইরানিদের চূড়ান্তরূপে পরাজিত করে রাজ্যদুটো থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, শামের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মিসর আমাদের হাতে আছে। তাই ভালো ও সঠিক সিদ্ধান্ত এটিই হবে যে, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব।'

তারপর সকল উপদেষ্টা পালাক্রমে কথা বলল। সবাই এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করল যে, আমাদেরকে শাম থেকে বেরিয়ে যাওয়াই উচিত হবে। আমরা যদি এই আশা নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাই যে, একটি জোরালো আক্রমণ দ্বারা মুসলমানদের পেছনে সরিয়ে দেব, তা হলে অর্জন কিছুই হবে না। উলটো যে-কজন সৈন্য অবশিষ্ট আছে, তারাও জীবন হারাবে।

হেরাক্‌ল আদেশ জারি করলেন, আমি কুস্তুন্তুনিয়া যেতে চাই। আপনারা দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

সে-সময় কুস্তুন্তুনিয়াও রোমান সাম্রাজ্যের বড় একটা শহর ছিল এবং যুদ্ধ থেকে নিরাপদ ছিল। হেরাক্‌ল-এর দৃষ্টি এখন এই শহরটার উপর নিবদ্ধ।

জোরে-শোরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

হেরাক্‌ল সে-সময়কার সর্ববৃহৎ ও ভয়ানক একটি সামরিক শক্তির সেনানায়ক ও রাজা ছিলেন। তার অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার শেষ ছিল না। প্রজাপীড়নে তার কোনো জুড়ি ছিল না। কিন্তু তার এই চরিত্রটার উপযুক্ত ফলাফলও তিনি দেখতে পেলেন। তার সৈন্যরা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে আর যে যার-যার মতো পালাবার পথ খুঁজছে। তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তার বিখ্যাত-বিখ্যাত সেনাপতিরা মারা গেছে। সর্বত্র তার সৈন্যদের মরদেহ পঁচে-গলে ছড়িয়ে রয়েছে। আহত সৈনিকরা নিজেদের টেনে-হেঁচড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও সম্রাট একটা মূর্তিমান আক্ষেপ ও হতাশায় পরিণত হয়ে এমন এক গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন, যেটা তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ অঞ্চল। কিন্তু ভালোয়-ভালোয় সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবেন কিনা সেই ভরসাও তিনি পাচ্ছেন না।

ইতিহাসে শুধু সেই ঘটনাগুলো পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলো প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সেই ঘটনাবলিতে দেখা যাচ্ছে, মানুষ হাঁটছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, পালাচ্ছে, একজন অপরজনের রক্ত ঝরাচ্ছে এবং ভূপৃষ্ঠে ভালো-মন্দ আচরণ করে ফিরছে। কোনো ঐতিহাসিক লিখেননি, অমুক পরিস্থিতিতে

অমুক ব্যক্তির অন্তরে কী ছিল এবং তার মাঝে কীরূপ ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কেউ যদি লিখেও থাকেন, লিখেছেন অনুমানের উপর ভিত্তি করে।

হেরাক্ল সম্পর্কে একাধিক ঐতিহাসিক লিখেছেন, তিনি হতাশা ও ব্যর্থতার মাঝে ডুবে গিয়েছিলেন এবং এতটা অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন যে, সাধারণ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বিজয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার মাঝে ধারণা জন্মে গিয়েছিল, আমাকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। এই আত্মপ্রবঞ্চনা প্রজাদের জন্য তাকে ফেরাউনে পরিণত করে তুলেছিল।

আমরা কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি সে-সময় তার হৃদয়ের উপর দিয়ে কীসব বয়ে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে তার বিখ্যাত এক সেনাপতি তাজারুক-এর কথা মনে পড়ে গিয়ে থাকবে নিশ্চয়। এটি হযরত আবুবকর (রা.)-এর খেলাফত আমলের ঘটনা। ইসলামের সৈনিকরা তাদের দুজন সিপাহসালার মুছান্না ইবনে হারেছা ও সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে ইরানিদের বিরুদ্ধে ইরাকে যুদ্ধরত। অগ্নিপুজারি ইরানিরা পিছপা হতে চলছে। সে-সময় শাম রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং শাসনক্ষমতা হেরাক্ল-এর হাতে ছিল।

তখনও হেরাক্ল মুসলমানদের আরবের বদ্দু আর মরুতস্কর মনে করতেন। তিনি মুসলমানদের বোঝাতে চাইলেন, তোমরা শামের সীমানার বাইরেই থাকো; অন্যথায় একদম হারিয়ে যাবে। এ-লক্ষ্যে তিনি বিপুলসংখ্যক সৈন্যের একটা বাহিনী ইয়ারমুক নামক স্থানে প্রেরণ করলেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়লেন। এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ইতিহাসের এক বিখ্যাত যোদ্ধা তাজারুক। হেরাক্ল-এর প্রত্যাশা ছিল, তাজারুক একটিমাত্র লড়াইয়ে মুসলমানদের চিরতরে নিঃশেষ করে দেবে। কিন্তু সেই যুদ্ধের পরিণতি এই দাঁড়িয়েছিল যে, তাজারুক মারা পড়ল। তার প্রায় অর্ধেক সৈন্য প্রাণ হারাল। যারা জীবনে রক্ষা পেল, তারা বিক্ষিপ্তভাবে কোনোমতে প্রাণটা নিয়ে বিহ্বল চিত্তে ফিরে গিয়েছিল।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, তাজারুক পরাজিত ও নিহত হওয়ার পর হেরাক্ল-এর নিজেরই এগিয়ে যাওয়া আবশ্যক ছিল, যাতে মুসলমানদের উপর তার প্রভাব ও প্রতাপ অটুট থাকে। কিন্তু তিনি এই ভয়ে বেরই হলেন না যে, তা হলে আমাকেও পরাজয়বরণ করতে হবে এবং ইয়ারমুকেরই মাটিতে আমার কবর রচিত হবে।

আজ যখন তিনি পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে কুস্তুন্তুনিয়া যাচ্ছেন, তখন তার নিশ্চয় সেই ইয়ারমুক যুদ্ধের কথা মনে পড়ে থাকবে এবং তিনি এইমর্মে আক্ষেপও করে থাকবেন যে, আমি শিক্ষা গ্রহণ করলাম না এবং মুসলমানদের দুর্বলই ভাবতে থাকলাম!

তারপর রাসূলে আকরাম (সা.)-এর একটি পত্রের কথা তার স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠে থাকবে। সেই চিঠিতে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ইরানিরা রোমানদের থেকে শাম ও মিসর ছিনিয়ে নিয়েছিল। সে-সময় রোমের রাজা ছিলেন ফোকাস। ইরানিরা বাইতুল মুকাদ্দাসও জয় করেছিল এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর (কাল্পনিক) কবর থেকে বড় ক্রুশটা তুলে নিয়ে গিয়েছিল। পরে হেরাক্‌ল ফোকাস-এর সিংহাসন উলটে দিলেন। নিজে রাজার আসনে বসলেন এবং ইরানিদের পরাজিত করে তাদের থেকে ক্রুশটা ফিরিয়ে আনলেন।

হেরাক্‌ল ক্রুশটা পুনরায় হযরত ঈসা (আ.)-এর সেই কবরে রাখতে যাচ্ছিলেন। সে-সময় আল্লাহর রাসূল (সা.) তার নামে একখানা পত্র পাঠালেন। সেই পত্রে নবীজি (সা.) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। দিহ্ইয়া ইবনে খালীফা কালবি নামক এক সাহাবী সেই পত্রখানা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথেই হেরাক্‌ল-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। সেখানেই তিনি নবীজির পত্রখানা তাকে হস্তান্তর করলেন এবং উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আজ যখন পরাজিত হেরাক্‌ল মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে শামের সীমান্ত ঘেঁষে পথ অতিক্রম করছেন, তখন নিশ্চয় মুসলমানদের রাসূলের সেই পত্রটির কথা তার মনে পড়ে থাকবে। সেই দৃশ্যটাও তার মনের পর্দায় ভেসে উঠে থাকবে যে, তিনি কীভাবে আল্লাহর রাসূলকে অবজ্ঞা করেছিলেন, পত্রবাহক দূতের সঙ্গে কীরূপ অসদাচরণ করেছিলেন, নবীজির শানে কীরূপ বে-আদবিমূলক বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন এবং শেষে পত্রখানা নবীজির সেই মহান সাহাবীর মুখের উপর ছুড়ে মেরে কেমন অভদ্রতার সঙ্গে তাঁকে বিদায় করে দিয়েছিলেন। অসম্ভব কী যে, আজ হেরাক্‌ল মনে-মনে আক্ষেপ করছেন, আহ! সেদিন আমি কেন মুসলমান হয়ে গেলাম না! তবে তো আজ আমিও বিজয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম এবং এই লাঞ্ছনাকর জীবন থেকে মুক্ত থাকতাম।

ইতিহাস হেরাক্‌ল-এর সে-সময়কার অবস্থা শুধু এটুকু লিপিবদ্ধ করেছে, তার চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং মাথাটা নত হয়ে গিয়েছিল। একটি কল্পনা তার মনকে প্রবোধ দিয়ে রেখেছিল যে, এখনও সম্পূর্ণ মিসর তোমার দখলে আছে। ওখানে গিয়ে তুমি বাহিনী প্রস্তুত করো। তারপর শাম আক্রমণ করে মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো।

* * *

সম্রাট হেরাক্‌ল-এর কাফেলা জনাকতক লোকের কোনো বহর ছিল না, যারা কুস্তুনতুনিয়া যাচ্ছিল। মিসর ও শামের অগণিত সুন্দরী নারীর হেরেমও সঙ্গে ছিল।

সম্রাটের রক্ষীবাহিনীও ছিল। রুহায় অল্প যে-কজন সৈন্য ছিল, তারাও সঙ্গে যাচ্ছিল।

এই কাফেলা সাধারণ পথ এড়িয়ে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। একটা সতর্কতা এই ছিল যে, পথে মুসলমানদের কোনো সেনাদল যেন তাদের দেখতে না পায়। হেরাক্ল যুদ্ধকে ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি আরও একটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা এই গ্রহণ করেছিলেন যে, সাধারণ পথচারী ও গরিব মানুষের বেশে কিছু লোককে তিনি অনেক সম্মুখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিল, দূরে বা কাছে কোথাও মুসলমানদের কোনো সেনাদল চোখে পড়লে সঙ্গে-সঙ্গে পেছনে এসে সংবাদ জানাবে, যাতে আগে থেকেই পথ পরিবর্তন করে নেওয়া যায়।

পথে এমনই একটা ঝুঁকি সামনে এসে হাজির হলো। তিন-চারজন অশ্বারোহী মুসলমানকে মারআশ থেকে অপর এক অঞ্চল দালুকের দিকে যেতে দেখা গেল। অতক্ষণে হেরাক্ল বিখ্যাত নগরী শামশাতের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তিনি ওখানেই রাতযাপন করবেন বলে মনস্থির করেছেন। এক গোয়েন্দা ছুটে এল এবং তাকে সংবাদ জানাল, মুসলমানদের এক অশ্বারোহী সেনাদল শামশাতের দিকে আসছে। হেরাক্ল তৎক্ষণাৎ বিরতি প্রত্যাহার করে এগিয়ে যেতে আদেশ করলেন এবং কাফেলাকে পার্শ্ববর্তী পর্বতমালার অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। তারপর সফর না শুধু অব্যাহত রাখলেন; বরং চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন।

হেরাক্ল-এর কপালটা ভালো ছিল যে, ওখান থেকে তিনি চলে গিয়েছিলে এবং পর্বতমালার মধ্যে লুকিয়ে গিয়েছিলেন। তার গোয়েন্দারা যে-সেনাদলটি দেখেছিল, তার সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)। তিনি তাঁর সৈন্যদের নিয়ে দালুক যাচ্ছিলেন। কারণ, ওখান থেকে সংবাদ এসেছে, রোমান ফৌজের কিছু সদস্য ও ওখানকার জনসাধারণ বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ইতিহাসের ভাষ্যমতে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) ওখানে পৌঁছে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আগেই বিদ্রোহের মস্তকটা চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের এই মহান সিপাহসালার জানতেই পারলেন না, বেশ মোটাসোটা একটা শিকার তাঁর চোখ এড়িয়ে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।

প্রখ্যাত মিসরি ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকেল একাধিক ঐতিহাসিকের বরাতে লিখেছেন, ওই পাহাড়ি অঞ্চল অতিক্রম করে উঁচু এক জায়গায় পৌঁছে হেরাক্ল পেছনের দিকে তাকালেন। ছোট-বড় অনেকগুলো জনবসতি তার চোখে পড়ল। আদিগন্ত বিস্তৃত শাম রাজ্যটাও তিনি দেখতে পেলেন। তিনি অনুশোচনার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন এবং বললেন, 'আমার শেষ অভিবাদন গ্রহণ করো হে শাম! এখন আর কোনো রোমান তোমার মাটিতে পা রাখার দুঃসাহস দেখাবে না। কোনো

রোমান আর তোমার বুকের উপর হাঁটা-চলা করবে না। তোমাকে বিদায় হে শামের মাটি! হে শামের মাটি, তোমাকে বিদায়!'

হেরাক্‌ল-এর জন্য কুস্তুন্তুনিয়ার পথ নিরাপদ থাকল না। শামের সীমান্ত থেকে খানিক দূরে অখ্যাত একটা অঞ্চল বাজিন্তিয়া। সম্রাট হেরাক্‌ল সেদিকে মুখ করে এগুতে থাকলেন।

আল-মুকরিযি সম্রাট হেরাক্‌ল-এর সে-সময়কার অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হেরাক্‌ল বাজিন্তিয়া এমনভাবে প্রবেশ করলেন, যেন তিনি নিজের মরদেহের সঙ্গে আপন জীবনের শেষকৃত্য পালন করতে এসেছেন।

* * *

নিভার আগে বাতিটা কিছুক্ষণ টিমটিম করে জ্বলে। তারপর হঠাৎ দপ করে নিভে যায়। হেরাক্‌ল-এর ক্ষমতার প্রদীপ টিমটিম করছিল। যেকোনো সময় নিভে যেতে পারে এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছিল। এই দীপে তেলের বদলে তার রক্ত জ্বলছিল, তার দুঃশাসন জ্বলছিল, তার অহমিকা জ্বলছিল। শাম তার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু সীমান্ত অঞ্চলের উপর তখনও মুসলমানরা কব্জা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। হেরাক্‌ল-এর আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ নিঃশ্বাস ফেলছিল।

হেরাক্‌ল কি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন? ইতিহাস এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না। মানুষের স্বভাব হলো, ক্ষমতার চেয়ারে একবার বসতে পারলে আর শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করে না। ক্ষমতার মোহে অন্ধরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। ইতিহাস আমাদের সেই সময়টা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যখন মুসলমানরা হযরত আবু উবায়দা, খালিদ ইবনে অলীদ, শুরাহবিল ইবনে হাসানা ও আমর ইবনে আস (রা.)-এর নেতৃত্বে শামের উপর সেনা-অভিযান পরিচালনা করেছিল। ইসলামের সৈনিকরা দামেশক জয় করে নিয়েছিলেন। হেরাক্‌ল তখনও পর্যন্ত আন্তাকিয়া ছিলেন। দামেশককে মুসলমানদের থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি বাহিনীও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা পৌঁছানোর আগেই মুসলমানরা দামেশক পদানত করে নিয়েছিল।

আজ যখন তিনি পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে বাজিন্তিয়া গিয়ে পৌঁছলেন এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ টিমটিম করছে, তার কিছুদিন আগের একটা ঘটনা। মুসলমানরা শামে প্রথম বিজয়টি এই অর্জন করেছিল যে, তারা দামেশক নগরী পদানত করে নিয়েছিল। তখন হেরাক্‌ল আন্তাকিয়া থেকে বেরই হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আবরের এই 'বদ্দু'রা তার এত বড় সামরিক শক্তির একটা চুলও বাঁকা করতে পারবে না।

হেরাক্‌ল-এর প্রেরিত বাহিনী গিয়ে পৌঁছলে এবার রোমান সৈন্যদের সংখ্যা কম-বেশি পঞ্চাশ হাজার হয়ে গেল, যাদের অধিকাংশই অশ্বারোহী। এরা দামেশক

থেকে কিছু দূরে বায়সান নামক স্থানে সমবেত হলো। এখানে তারা মুসলমানদের মোকাবেলা করতে চাচ্ছিল।

এখানে আমরা সেসব লড়াইয়ের বিস্তারিত কাহিনী লিখব না। শুধু রোমানদের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার একটা ঘটনা শোনাব। দামেশকের মতো বিশাল একটা শহর হাতছাড়া করেও রোমান সেনাপতি মুসলমানদের দস্যু ও লুটেরা বাহিনী-ই মনে করছিল। উক্ত সেনাপতির নাম সাকার। অতিশয় বীর ও অভিজ্ঞ এই রোমান সেনাপতি রাজবংশের সদস্য ছিল।

অঞ্চলটা খুবই উর্বর ছিল। পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা ছিল। বেশ কটা নদ-নদী প্রবহমান ছিল। সেনাপতি সাকারের আদেশে নদীগুলোর দু-কূলের বাঁধ ভেঙে দেওয়া হলো, যার ফলে নদীর পানি উপচে সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। এ-কাজটা সে মুসলমানদের অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা তৈরির লক্ষ্যে করেছিল।

কিন্তু ইসলামের সৈনিকরা সব জায়গায় পানি দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। রোমানদের নিয়ে তাঁরা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করলেন। তাঁরা মোটেও ভয় পেলেন না বা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন না। তাঁরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন।

মুসলমানদের এহেন মনোবল, সাহসিকতা ও ডেমকেয়ার ভাব দেখে রোমান বাহিনী প্রভাবিতও হলো, সন্ত্রস্তও হলো।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রোমান সেনাপতি সাকার মুসলমানদের দুর্বল ও হীনই ভাবতে থাকল। মুসলমানদের কাছে প্রস্তাব পাঠাল, তোমরা একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করো; আলাপ-আলোচনা করে দেখি, সন্ধি-শান্তির কোনো পথ বের করা যায় কি-না।

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)কে দূত বানিয়ে রোমানদের কাছে প্রেরণ করলেন।

আল্লামা শিবলি নু'মানি তাবারি ও বালাযুরির বরাতে লিখেছেন, মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) ঘোড়ায় চড়ে রোমানদের সেনাক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলেন। তাকে সেনাপতি সাকারের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলে এক রক্ষীসেনা তাঁর ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল। বলল, আপনি ভেতরে চলে যান।

ইতিহাসে আছে, মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) একজন প্রবীণ সাহাবী ছিলেন। বয়স ও পদমর্যাদার কারণে রোমান খ্রিস্টানরা তাঁকে খুব সম্মানের সঙ্গে বরণ করে নিয়েছিল।

মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) তাঁবুতে ঢুকতে গিয়ে সহসা দরজায় থেমে গেলেন। তাঁবু বটে; কিন্তু ভেতর থেকে মনে হচ্ছিল, যেন এটি কোনো রাজার বিশেষ একটি কক্ষ। এমন-এমন মূল্যবান জিনিসপত্র দ্বারা সাজানো যে, তাঁবু বলে মনেই হচ্ছিল না। যে-বিষয়টি বিশেষ করে হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে বিস্মিত ও বিচলিত

করে তুলেছিল, সেটি হলো তাঁবুর ভেতরে বিছানো গালিচা। এত মূল্যবান, উন্নত ও মনোহারী যে, সাহাবী হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) তাতে পা রাখতে ইতস্তত করছিলেন।

রোমান সেনাপতি সাকার তাঁকে ভেতরে ঢুকে এগিয়ে বসতে বলল। সাকারসহ ওখানকার সবাই গালিচার উপরে বসা। মু'আয ইবনে জাবাল এই গালিচায় বসবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। কথাবার্তা একজন দোভাষীর মাধ্যমে হচ্ছিল। সাকার যেহেতু রোমান নাগরিক, তাই সে এখানকার ভাষা না বলতে পারছিল, না বুঝতে পারছিল।

'আপনি এই গালিচার উপর বসতে পারেন'– দোভাষীর মাধ্যমে সাকার বলল– 'এর উপর শুধু গোলামদের পা রাখার অনুমতি নেই।'

'মুসলমান হয়ে আমি এই গালিচার উপর বসব না'– মু'আয (রা.) বললেন– 'এই গালিচা থেকে আমার নাকে গরিব প্রজাদের রক্তের ঘ্রাণ আসছে। ছাপোষা দিনমজুর ও গরিব কৃষকদের অধিকার কেড়ে এনে এই গালিচা তৈরি করানো হয়েছে।'

গালিচাটা তাঁবুর সমান চওড়া ছিল না। মেঝেতে কিছু জায়গা ফাঁকা ছিল। মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) তাঁবুর ফাঁকা মেঝেতে বসে পড়লেন।

'আমরা আপনাকে সম্মান দিতে চাচ্ছিলাম'– সাকার বলল– 'কিন্তু আপনি যখন নিতে প্রস্তুত নন, তখন তো আমরা অপারগ।'

আল্লামা শিবলি নু'মানি ঐতিহাসিকদের বরাতে লিখেছেন, সাকারের এই উক্তিতে হযরত মু'আয (রা.) ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি বসা থেকে উঠে হাঁটুতে ভর করে দাঁড়ালেন। মানে পুরোপুরি দাঁড়ালেন না।

'তোমার এই সেনাপতিটার মাথায় আমার কথাটা ঢুকিয়ে দাও'– মু'আয (রা.) দোভাষীকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তাকে বলো, তুমি যদি গালিচায় উপবেশন করাকে সম্মান মনে করে থাক, তা হলে আমার কিছুই করবার নেই। আমাদের কাছে সম্মান অন্য কিছু। মাটিতে বসা যদি গোলামদের বৈশিষ্ট্য হয়, তা হলে আমি গোলামই– আমি আল্লাহর গোলাম।'

একথা বলেই হযরত মু'আয (রা.) আবারও মাটিতে বসে পড়লেন। রোমান সেনাপতি সাকার ও উপস্থিত অন্যান্য অফিসারগণ বিস্ময়ে থ হয়ে গেল।

'আপনার এই বাহিনীতে আপনার চেয়ে বড় আর কেউ আছে কি?' সেনাপতি সাকার জিজ্ঞেস করল।

'আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটুকুই যথেষ্ট যে, আমি কারও চেয়ে মন্দ নই।' মু'আয ইবনে জাবাল উত্তর দিলেন।

বৈঠকে উপস্থিত সবাই নীরব হয়ে গেল এবং পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল কথাটি এমন বুদ্ধিমত্তা ও পরিপূর্ণ আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন যে, সবাই তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়ল। কিন্তু তারা বিষয়টি তাঁকে বুঝতে দিতে চাচ্ছিল না। হযরত মু'আয (রা.) চোখ ঘুরিয়ে পুরো মজলিসটা একবার ভালো করে দেখে নিলেন। কিন্তু কেউ আর কোনো কথা বলল না। সবাই নির্বাক বসে রইল।

'ওদেরকে বলো, কেউ কথা বলুক'– মু'আয (রা.) দোভাষীকে বললেন– 'কোনো কথা না থাকলে বলুক; আমি ফিরে যাই।'

দোভাষী কথাটা রোমান ভাষায় বুঝিয়ে বললে এবার সেনাপতি মুখ খুলল।

'আপনার কাছে আমি একটিমাত্র কথা জিজ্ঞেস করতে চাই'– সাকার বলল– 'হাবশা আপনাদের কাছাকাছি রাষ্ট্র। অন্যান্য দেশও আছে। কিন্তু আপনারা এমুখো হলেন কেন? আপনাদের কি জানা নেই, আমাদের রাজা বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্রাট? আমাদের সৈন্যসংখ্যা আকাশের তারকা আর পৃথিবীর অণুর সমান। বলুন তো আপনারা কি এই ভেবে এদিকে এসেছেন যে, আপনারা আমাদের পরাজিত করতে পারবেন? অসম্ভব!'

'আমরা একটি আহ্বান নিয়ে এসেছি, যেটি মূলত আল্লাহর বার্তা'– হযরত মু'আয (রা.) বললেন– 'আপনারা ইসলাম গ্রহণ করে নিন। আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে আমাদের মতো ইবাদাত করুন। মদ ও শূকরের গোশত ছেড়ে দিন। আর সব ধরনের হারাম কাজ ও রাজকীয় বিলাসিতা পরিহার করুন।'

'আমরা যদি আপনার এই আহ্বান গ্রহণ না করি, তা হলে কী হবে?' সাকার অহমিকার সুরে জিজ্ঞেস করল।

'তা হলে জিযিয়া দিন'– মু'আয (রা.) উত্তর দিলেন– 'আর যদি এটিও মেনে নিতে না পারেন, তা হলে সিদ্ধান্ত নেবে তলোয়ার। আপনাদের সংখ্যা যদি তারকার সমান হয়, তা হলে আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা আছে। আল্লাহপাক বলেছেন, অনেক সময় এমনও ঘটেছে যে, ক্ষুদ্র একটা দল বড় একটা দলের উপর জয়লাভ করেছে। আপনারা আপনাদের রাজাকে নিয়ে বেশ গর্ব করছেন, অহংকার দেখাচ্ছেন। কিন্তু এটা দেখছেন না, তিনি নিজেকে প্রতিটি আইনের ঊর্ধ্বে মনে করছেন এবং আপনাদের সকলের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তিনি আপন মুঠোয় নিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমরা যাকে আমাদের রাজা বানিয়েছি, তিনি নিজেকে রাজা মনে করেন না। আমরা তাঁকে খলীফা বলি। তিনিও যদি কোনো অপরাধ করেন, তা হলে তাঁকেও একজন সাধারণ নাগরিকেরই মতো শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

রোমান সেনাপতি আসলে চাচ্ছিল, মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু দান-দক্ষিণা গ্রহণ করুক এবং এখান থেকে ফিরে যাক। সে হযরত মু'আয ইবনে

জাবাল (রা.)কে প্রস্তাব করল, আপনারা শামের একটা জেলা ও উর্দুনের একটা অংশ নিয়ে নিন এবং ফিরে চলে যান।

উত্তরে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং আর কোনো কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফিরে এলেন।

রোমান সেনাপতি সাকার তখনও পর্যন্ত আশা করছিল, এই গরিব মুসলমানরা– যাদের বড় মাপের একজন নেতা আমাদের গালিচার উপর বসতে ইতস্তত করে– কিছু দক্ষিণা নিয়ে ফিরে যেতে সম্মত হয়ে যাবে। সে মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে এই বার্তা দিয়ে একজন দূত প্রেরণ করলেন যে, রোমান সেনাপতি আপনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য একজন দূত পাঠাতে চাচ্ছেন। এর জন্য আপনার অনুমতির প্রয়োজন।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) অনুমতি দিয়ে দিলেন।

সেদিনই সাকারের প্রেরিত একজন দূত হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে এসে পৌঁছল।

তাবারি ও বলাযুরির সূত্রে ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে, রোমান দূতের এই ধারণা থাকা-ই স্বাভাবিক ছিল যে, ইসলামি বাহিনীর সিপাহসালার একজন প্রতাপশালী ব্যক্তি হবেন, তাঁর শান অন্যদের থেকে আলাদা হবে এবং তাঁর কাছে ঘেঁষা খুব সহজ হবে না।

দূত আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে এল। সে-সময় তিনি মাটিতে বসে একটা তির হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। রোমান দূত একজনকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের নেতা কোথায়? উত্তরে আবু উবায়দাকে দেখিয়ে দিলে সে বিস্মিত চোখে তাঁর প্রতি তাকিয়ে রইল। অবশেষে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

'তুমি-ই কি এই বাহিনীর সিপাহসালার?' দূত খানিক অহমিকা প্রকাশ করল।

'হ্যাঁ, আমি-ই।' হযরত আবু উবায়দা (রা.) শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

'তা হলে আমার একটি কথা শুনে নাও'– দূত অফিসারি ভাব ফুটিয়ে বলল– 'আমরা তোমাদের সকল সৈনিককে জনপ্রতি দুটি করে স্বর্ণমুদ্রা দান করব। তোমরা এখান থেকে ফিরে চলে যাও।'

সে-সময় স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল কি-না জানা নেই। দূতের উদ্দেশ্য ছিল, তারা প্রতিজন মুজাহিদকে দুটি করে সোনার চাকা প্রদান করবে আর তারা এর বিনিময়ে মিশন গুটিয়ে এখান থেকে ফিরে যাবে।

'তোমার কি আর কোনো কথা বলবার আছে?' আবু উবায়দা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন।

'না; আমি এই প্রস্তাব নিয়েই এসেছি।' দূত উত্তর দিল।

'তা হলে তুমি চলে যাও।' আবু উবায়দা (রা.) বললেন।

রোমান দূত ক্ষুব্ধ মনে ফিরে গেল।

আবু উবায়দা (রা.) তখনই আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর নামে পত্র পাঠালেন। তাতে তিনি এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখে জানালেন। দূরত্ব অনেক বেশি ছিল। কয়েকজন দ্রুতগামী দূতের ব্যবস্থা করা হলো। তারা চার-পাঁচ দিন পর আমীরুল মুমিনীনের উত্তরপত্র নিয়ে ফিরে এলেন। আমীরুল মুমিনীন লিখেছেন, তোমরা আল্লাহর পথে দৃঢ়পদ থাকো। তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন।

* * *

হেরাক্‌ল– প্রজাসাধারণ ও সেনাপতিরা যাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাজা মনে করত, যার বাহিনীর সেনাসংখ্যা আকাশের তারকা ও পৃথিবীর অণুর সমান ছিল– এমন এক অবস্থায় বাজিন্তিয়া এসে পৌঁছলেন যে, তারকা-অণুর সমান বাহিনীটা একজন-একজন সৈনিকে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল। অর্ধেক সৈন্য প্রাণ হারিয়ে হাড়ের কংকালে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শাম রাজ্যের উপর মুসলমানদের কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। আকাশের তারকাগুলো কক্ষচ্যুৎ হয়ে-হয়ে মাটির অণুর সঙ্গে মিশে মাটি হয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে কাদেসিয়ার যুদ্ধের পর ইরানসম্রাট অত্যন্ত শোচনীয় পরাজয় বরণ করে পলায়ন করেছিলেন এবং আপন রাজধানী মাদায়েনকে বিপুল ধনভাণ্ডারসহ মুসলমানদের জন্য রেখে কোথাও আত্মগোপন করে ছিলেন। এদিকে ইরান ও ইরাক মুসলমানদের ঝুড়িতে এসে পড়েছে, ওদিকে শাম রাজ্য মুসলমানদের পায়ের উপর এসে লুটিয়ে পড়েছে।

মোটের উপর পরিস্থিতিটা এমনই ছিল যে, তাতে হেরাক্‌ল-এর মন ভেঙে যাচ্ছিল। কিন্তু মানুষটা তো ছিলেন সাহসী। তিনি ধীরে-সুস্থে পরিস্থিতি ও নিজের সামরিক শক্তির পরিসংখান নিলেন। এবার আস্তে-আস্তে তার সাহস ফিরে আসতে শুরু করল। তার উপদেষ্টারাও বলল, আপনার অর্ধেক ফৌজ প্রাণ হারানোর ফলে এবং শাম হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে রোমের রাজত্বের জন্য যতখানি ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে, ক্ষতিটা কিন্তু অত নয়।

মিসর তখনও তার হাতে ছিল। সেখানে বিপুলসংখ্যক সৈন্য ছিল। উপদেষ্টারা তাকে পরামর্শ দিল, আপনি মিসর থেকে সৈন্য তলব করুন। তারপর প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর জবাবি আক্রমণ চালান।

হেরাক্‌ল-এর সে-সময়কার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বাজিন্তিয়া পৌঁছে যখন তিনি এই নিরাপদ আশ্রয়টি পেয়ে গেলেন এবং খানিক স্বস্তি লাভ করলেন, তখন উপদেষ্টাদের এই পরামর্শ তার খুবই ভালো লাগল। তিনি

তখনই মিসরে দূত পাঠালেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমপক্ষে চল্লিশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দাও।

এদিকে তার কাছে আরও একটি সাহায্য এসে পৌঁছল, যা কিনা তার একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। এই সাহায্য তার মনোবল আগের মতো শক্ত করে দিল।

একদিন তাকে সংবাদ জানানো হলো, ইরাক ও শামের বিভিন্ন গোত্রের পঁচিশজন নেতা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এরা সবাই কতগুলো যুদ্ধবাজ গোত্র ছিল। তাদের সঙ্গে নিষ্পাপ চেহারার অতিশয় রূপসী বিশ-পঁচিশটা যুবতী মেয়ে ছিল, যারা কিনা উক্ত নেতাদেরই বংশের সন্তান। হেরাক্ল তাদের ভেতরে ডেকে পাঠালেন। নেতাদের সঙ্গে শাদা দাড়িওয়ালা একজন প্রবীণ লোক ছিল। আকারে, গঠনে ও পোশাকে লোকটাকে বিজ্ঞ ও ধর্মনেতা বলে মনে হচ্ছিল।

ইরাক, শাম ও আরও কিছু অঞ্চলে– যেগুলো যুদ্ধের আওতায় এসে পড়েছিল– অনেকগুলো গোত্র বাস করত। বনু তামার, বনু গাস্সান, বনু তাগলিব, বনু ইয়াদ, বনু মুযাম ও বনু উদ্ওয়ান ছিল সেই গোত্রগুলোর মধ্যে বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য। সেগুলো ছাড়া আরও অনেকগুলো গোত্র ছিল। এসব অঞ্চলের বসতি গোত্রের আদলে বণ্টিত ছিল। হেরাক্ল-এর কাছে এই যে-গোত্রনেতারা এল, এরা সবাই অমুসলিম। কতিপয় পারস্য, তথা ইরাক ও ইরানের অগ্নিপূজারি। বাকিরা খ্রিস্টান।

'তোমরা কি এই মেয়েগুলোকে আমার জন্য উপহার এনেছ?'– হেরাক্ল তাচ্ছিল্যের সুরে জিজ্ঞেস করলেন– 'তোমরা কি আমাকে বিজয়ী মনে করে এসেছ? এ-সময় তো আমার প্রয়োজন অন্যকিছু। এই রূপবতী মেয়েগুলোকে আমার চাই না। এই মুহূর্তে আমার কতগুলো তাগড়া যুবক পুরুষ দরকার, যারা আমার বাহুতে শক্তি জোগাবে আর আমি আরবের ওই বদ্দুদের এখান থেকে ঠেলে সেখানে পৌঁছিয়ে দেব, যেখান থেকে এরা এসেছে।'

'আমরা আপনার বাহু শক্ত করতেই এসেছি'– এক প্রবীণ নেতা বলল– 'এই মেয়েগুলোকে আমরা উপহার হিসেবে আনিনি। এরা আমাদের নিজেদের কন্যা। আপনার কাছে এদের আমরা শুধু এটা দেখাতে এনেছি যে, এরা আমাদের সম্ভ্রম, যা কিনা যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। আমরা এই নিষ্পাপ মেয়েগুলোর এবং এদের মতো হাজার-হাজার নারীর ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। আপনি আমাদের সাহায্য করুন– আমরা আপনাকে সাহায্য করব। আপনার যে-যুবক পুরুষদের আবশ্যক, তেমন লোক আমরা আপনাকে হাজারে-হাজারে দান করব।'

'আমাকে সাহায্য করার চিন্তা তোমাদের মাথায় এখন এল কেন?'– হেরাক্ল অভিযোগের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন– 'এই চিন্তাটা তখন কেন এল না, যখন

পারস্যের বাহিনী মুসলমানদের সামনে-সামনে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল আর এদিকে আমার ফৌজ বিক্ষিপ্ত হয়ে পেছনে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছিল?'

এ-ঘটনা বর্ণনা করে আমার একথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, হেরাক্ল-এর ক্ষমতার প্রদীপ শেষবারের মতো কীভাবে জ্বলে উঠেছিল এবং যখন নিভে গেল, তখন তিনি মিসর পর্যন্ত কেন ও কীভাবে গিয়ে পৌঁছলেন।

প্রবীণ কাবায়েলি নেতা হেরাকলকে জানাল, মুসলমানরা যখন ইরানিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করল এবং এদিকে শামেরও উপর আক্রমণ চালাল, তখন এই দুটি যুদ্ধে আমাদেরকে অনেক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হতে হয়েছে। আমাদের ফসলাদি ধ্বংস হয়ে গেছে যে, সৈন্যদের উট-ঘোড়া-ষাড় ইত্যাদি পশুরা সেগুলো খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে। বৃদ্ধ নেতা আরও জানাল, খোদ আমাদের নিজস্ব বাহিনীর সৈন্যরা আমাদের মেয়েদের হয় তুলে নিয়ে গেছে, নতুবা তাদের সম্ভ্রম বিনষ্ট করে ফেলে রেখে গেছে।

'মুসলমানরা কি তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে এমন আচরণ করেনি?' হেরাক্ল জিজ্ঞেস করলেন।

'না'– কাবায়েলি নেতা উত্তর দিল– 'মুসলমানরা যখন কোনো বসতিতে কিংবা নগরীতে প্রবেশ করে, তখন না তারা মানুষের ঘর-বাড়ি লুণ্ঠন করে, না নারীর গায়ে হাত তোলে। কিছু-কিছু মেয়েকে তারা দাসি বানিয়ে নিয়ে যায় বটে; কিন্তু তারা বিবাহ ছাড়া কোনো নারীর সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত হয় না। কিন্তু শাহেনশাহে রোম! একজন মুসলমানও যদি আমাদের একটা মেয়েকেও নিয়ে যায় আর তাকে তাদের নিয়ম অনুযায়ী বিবাহ করে নেয়, তবুও আমরা একে আমাদের অপমান মনে করি। সেজন্যই এই মেয়েগুলোকে আমরা আপনার সমীপে নিয়ে এসেছি যে, এই ফুলগুলো যেন মুসলমানদের হাতে না যায় এবং আমাদের নিজেদের সৈন্যরাও যেন এদেরকে নিজস্ব সম্পদ মনে না করে।'

প্রবীণ কাবায়েলি নেতা হেরাক্লকে জানাল, আমি অগ্নিপূজক। আমি এই খ্রিস্টান নেতাদের সঙ্গে এসেছি। ধর্ম যার যেটিই হোক, সম্মান সবারই সমান থাকে।

এই কাবায়েলি নেতা আসল যে-কথাটা হেরাকলকে অবহিত করল, তা হলো, মুসলমানরা আমাদের বড়-বড় অনেকগুলো জনবসতি ধ্বংস করে দিয়েছে। তার কারণ ছিল, আমরা তাদের বিরুদ্ধে আপনার সৈন্যদের সাহায্য করেছিলাম এবং মুসলমানদের ধোঁকা দিয়েছিলাম।

কাবায়েলি নেতারা এখন সম্রাট হেরাক্লকে বলতে এসেছে, মুসলমানরা শাম রাজ্যটাও দখল করে নিয়েছে। এখন তো তারা আরও অনেক জনবসতি ধ্বংস করে দেবে। সেজন্য তারা হেরাক্লকে তাদের গোত্রগুলো থেকে বিপুলসংখ্যক সৈন্য দিতে চাচ্ছে।

'শাহেনশাহে রোম!'– প্রবীণ নেতা বলল– 'আপনি আমার বয়স দেখুন। ইতিহাসের কত উত্থান-পতন, কত চড়াই-উতরাই, কত ভাঙা-গড়া আমি দেখেছি। আপনার চেহারায় আমি হতাশা ও উৎকণ্ঠা দেখতে পাচ্ছি। আপনি নিজেকে পরাজিত ভাববেন না। আজ পরাজয় বরণ করেছেন, তো কাল জয়ও লাভ করতে পারেন। মিসর থেকে অতিরিক্ত সৈন্য তলব করুন। আমরাও সৈন্য দিচ্ছি। আর একটা কথা সম্ভবত আপনার জানা নেই যে, এই আরব মুসলমানরা সমুদ্রের দিক থেকে আসা যেকোনো বিষয়কে ভয় করে। আমরা তাদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে দেব, সমুদ্র থেকে ফৌজ আসছে।'

এই বৃদ্ধ কাবায়েলি নেতা ঠিকই বলছিল। দু-তিনজন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকও লিখেছেন, সে-সময় অবধি মুসলমানরা সমুদ্রে অবতরণ করেনি। তাদের কোনো নৌবহর ছিল না। নৌযুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতাও তাদের ছিল না। তারা মরুবাসী মানুষ ছিলেন। কিন্তু পরে তারা নৌযুদ্ধে এত সুনাম অর্জন করেছিলেন যে, মুসলমানদের নৌশক্তি একটি প্রবাদে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

কাবায়েলিদের প্রস্তাব শুনে হেরাক্ল সর্বপ্রথম যে-কথাটা বললেন, তা হলো, মিসর থেকে ফৌজ আসছে। তোমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রস্তুতি নিয়ে এসে পড়ো।

এরা বিদায় নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় হেরাক্ল নিজে বা রাজপরিবারের কোনো একজন সদস্য কিংবা কোনো এক উপদেষ্টা পরামর্শ দিয়েছিল, এমন রূপসী মেয়েগুলোকে সফরে না পাঠিয়ে রাজমহলে রেখে দেওয়া হোক। এখানে এরা নিরাপদ থাকবে।

* * *

মুসলিম বাহিনীর সব কজন সালার বিজিত শহর ও অঞ্চলগুলোর প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত। বিজয়ের পর এমন কিছু সমস্যা-বিশৃঙ্খলাও দেখা দেয় যে, সেগুলোর প্রতি যথাসময়ে নজর দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। এখনও এই শঙ্কা বিদ্যমান আছে যে, কোথাও বিদ্রোহ হয়ে যেতে পারে। রোমান সৈন্যরা কোথাও-কোথাও আত্মগোপন করে আছে। এদিককার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সালারগণ এখনও জানতে পারেননি, হেরাক্ল পুনরায় বাহিনী সুসংহত করছেন, মিসরের বন্দর নগরী ইস্কান্দারিয়া থেকে অতিরিক্ত সৈন্য আসছে এবং অমুসলিম গোত্রগুলো একটা ফৌজের আদলে সংগঠিত হয়ে হেরাক্ল-এর কাছে বাজিন্তিয়া পৌঁছাচ্ছে।

হেরাক্ল পুনরায় মানসিক ও শারীরিকভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। কিছু দিন পর মিসর থেকে রওনা-হওয়া-ফৌজ নৌযানে করে কূলে এসে ভিড়ল। হেরাক্ল ওখানে লোক পাঠিয়ে রেখেছিলেন। তারা বাহিনীটাকে সেই জায়গাটায় নিয়ে গেল, যেখানে নিতে হেরাক্ল তাদের বলে দিয়েছিলেন।

এই জায়গাটার অবস্থান ছিল সে-সময়কার বিখ্যাত নগরী হেম্‌সের সন্নিকটে। কাবায়েলিদের যে-বাহিনীটা আসছিল, তাদেরও হেরাক্‌ল উক্ত স্থানে পাঠিয়ে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন। এই পুরো বাহিনীর কমাণ্ডার সম্রাট হেরাক্‌ল-এরই পুত্র কুস্তুন্তিন। ইতিহাসে আছে, কুস্তুন্তিন এমন উত্তেজিত জোশ ও জযবার সঙ্গে এসেছিল যে, পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েই তবে ক্ষান্ত হবে এবং পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করে দেবে।

মিসর থেকে আসা হেরাক্‌ল বাহিনী ও কাবায়েলি লশকর এমন ধারায় ও এমন বিন্যাসে হেমসের চারদিকে একত্র হয়ে গেল যে, হেম্‌সের মতো বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ নগরী তাদের অবরোধে এসে পড়ল। কিন্তু কাছাকাছি নয়– এই অবরোধ এতটা দূরে ছিল যে, মুসলমানরা জানতেই পারল না, শত্রুবাহিনী তাদের নগরী অবরোধ করে ফেলেছে। অঞ্চলটা পাহাড়ি ছিল এবং কিছু বনবাদাড়ও ছিল, যেগুলোকে রোমানরা এভাবে কাজে লাগল যে, তাতে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখল। কাবায়েলিদের আরও কিছু সৈন্য আসবার কথা আছে। তাই তারা এখনও অবরোধ সংকীর্ণ করছে না।

মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার হযরত আবু উবায়দা (রা.) হেম্‌সেই ছিলেন এবং এটিই মুজাহিদদের হেডকোয়ার্টার ছিল। অন্যান্য সালারগণ অপরাপর নগরীতে প্রশাসন গোছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আবু ওবায়দা (রা.) নগরীর বাইরে গোয়েন্দা পাঠানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ, রোমানদের পক্ষ থেকে আক্রমণের শঙ্কা দূর হয়ে গিয়েছিল। তিনি হেরাক্‌ল সম্পর্কে জেনেছেন, তিনি বাজিন্তিয়ায় আছেন এবং সেখান থেকেও বেরিয়ে যাবেন।

একদিন আবু উবায়দা জানতে পারলেন, রোমানরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে হেম্‌সের কাছাকাছি চলে আসছে কিংবা আসবার ইচ্ছা পোষণ করছে। কিন্তু এটি কোনো সমর্থিত সংবাদ ছিল না; বরং উড়োভাবে কানে এসেছিল। আবু উবায়দা (রা.) হাদীদকে তলব করলেন। আমরা আগেই জেনেছি, হাদীদ গুপ্তচরবৃত্তি ও গেরিলা লড়াইয়ে বিশেষ দক্ষতা ও সাহসিকতার অধিকারী যুবক।

হাদীদ ইবনে মু'মিন খাযরাজ সংবাদ পাওয়ামাত্র সিপাহসালারের সম্মুখে এসে হাজির হলেন। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) তাকে বললেন, তুমি শহরের বাইরে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত গিয়ে দেখো, রোমান বাহিনী কোথাও আছে কি-না। আমার কানে একটা সংবাদ এসেছে, ওরা নাকি আসছে।

সিপাহসালারের এই আদেশ নিয়ে হাদীদ ওখান থেকে বিদায় হয়ে গেলেন এবং একজন সাধারণ কাবায়েলি কৃষকের বেশ ধারণ করে ঘোড়ায় চড়ে মিশনে বেরিয়ে পড়লেন।

হাদীদ ও শারিনা যখন সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে এসে পৌঁছেছিলেন, তখন শারিনাকে নারীক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই তথ্য আপনারা আগেই জেনেছেন। শারিনা হাদীদের প্রেমের শেকলে আটকে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে আসবার পর থেকে এ-যাবত আর সে হাদীদের দেখা পায়নি। সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত হয়ে ছিল, হাদীদ-শারিনা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতি তখনও পর্যন্ত কাজটি সমাধা করার অনুমতি দিচ্ছিল না। শারিনার মন হাদীদকে একনজর দেখার জন্য ছটফট করছিল।

হাদীদ যখন ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো, তখন শারিনা তাকে দূর থেকে দেখে ফেলেছিল। আরবের মুসলমান মেয়ে হলে অবশ্য সে এমনটি করত না। কিন্তু শারিনা স্বাধীনচেতা ও রাজপরিবারের কন্যা ছিল। তা ছাড়া মনটা তার হাদীদের প্রেমে উথালপাথাল করছিল। মেয়েটা হাদীদের দিকে দৌড়ে আসতে লাগল এবং হাদীদ! হাদীদ! বলে চিৎকার করতে শুরু করল। হাদীদ মোড় ঘুরিয়ে তাকিয়েই ঘোড়া থামিয়ে ফেললেন। শারিনা দৌড়ে তার কাছে চলে এল এবং হাঁফাতে-হাঁফাতে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

ওখানে এমন কোনো বিষয় ছিল না যে, এভাবে একজন নারী আর একজন পুরুষকে একসঙ্গে দেখে তাদের কেউ সন্দেহ করবে। সেটি চারিত্রিক পবিত্রতার যুগ ছিল। বয়স্কা নারী ও যুবতী-তরুণী মেয়েরাও যুদ্ধের ময়দানে চলে আসত। তারা আহত মুজাহিদদের তুলে আনত ও পানি পান করাত। কোনো-কোনো মেয়ে রাতভর এক-একজন আহত মুজাহিদের কাছে বসে তাদের শুশ্রুষা করত। তা ছাড়া হাদীদ-শারিনা সম্পর্কে সবাই জানত এরা দুজন কোথা থেকে এসেছেন এবং কীভাবে এসেছেন।

হাদীদ উত্তর দিলেন, আমি একটা কাজে যাচ্ছি; তুমি ফিরে যাও। কিন্তু শারিনা হাদীদের পথ আগলে রাখল। মেয়েটা অনুনয়-বিনয় শুরু করে দিল। অশ্রুগলা কণ্ঠে বলল, আজ কতটা দিন হলো, তোমার কোনো দেখা পাচ্ছি না! এখানে এসে পৌঁছানোর পর আজ অবধি তুমি একটাবারের জন্য আমার কোনো খোঁজ নিলে না, দেখতে গেলে না! এই বিরহযন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না!

শারিনার কণ্ঠ থেকে ভালবাসার মদিরতা ঝরে পড়ল।

হাদীদ শারিনাকে বোঝালেন, আজকাল আমি সকাল-সাঁঝ সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকি। ফলে এতটুকুও ফোরসত পাই না যে, গিয়ে তোমার খোঁজ জানব।

কিন্তু এই উত্তরে শারিনার মন প্রবোদ মানল না। মেয়েটা কোনো সান্ত্বনা পেল না। তার ব্যাকুলতার আরও একটা কারণ হলো, মেয়েটা রাজপ্রাসাদে জন্ম নিয়েছে, রাজপরিবারে লালিতা-পালিতা ও বড় হয়েছে। আর এখানকার পরিবেশ তার একেবারে বিপরীত।

শারিনা হাদীদের ঘোড়ার সামনে চলে গিয়ে লাগামটা হাতে নিয়ে নিল এবং শিশুসুলভ জিদ ধরল যে, আমাকে বলতে হবে, তুমি কোথায় যাচ্ছ। অন্যথায় আমি তোমার পথ ছাড়ব না।

শারিনার চোখে অশ্রু টলমল করছে।

হাদীদ শারিনার এই প্রেমসুলভ হঠকারিতায় প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। তার হৃদয়েও তো শারিনার ভালবাসা আছে। তিনি সহসা মোমের মতো গলে গেলেন। বললেন, আমাদের সিপাহসালারের কাছে একটা উড়ো সংবাদ এসেছে, রোমানরা নাকি আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে। খবরটা গুজব, নাকি বাস্তব যাচাই করার জন্য তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

শারিনা এবার আব্দার করে বসল, আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

কিন্তু হাদীদ তাকে নিতে পারেন না। তিনি চরবৃত্তি করতে যাচ্ছেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ মিশনে একটা মেয়েকে সঙ্গে রাখা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া সিপাহসালারের আয়ত্তাধীন থাকা একটা মেয়েকে এভাবে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন না। হাদীদ তাকে নিতে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করলেন।

শারিনা অতিশয় বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ মেয়ে। বলল, তুমি আমাকে নিয়ে চলো। আমার বা তোমার তাতে কোনো সমস্যা হবে না। রোমানরা যদি কোথাও এসেও পড়ে, আমাকে তাদের কেউ চিনবে না। কারণ, এখন আমি এমন পোশাকে আছি যে, আমাকে একটা সাধারণ পরিবারের মেয়ে বলে মনে হবে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বসে, তোমরা পরস্পর কী হও, তা হলে বলব, আমি এর বউ। বউ তো আমি তোমার হতে যাচ্ছিই।

হাদীদ শারিনাকে খুব বোঝালেন। কিন্তু শারিনা অনড়– কোনো কথাই শুনছে না– সে যাবেই। হাদীদ এবার ঘোড়া থেকে নামলেন। শারিনার চিবুক স্পর্শ করে মমতার ডালি মেলে ধরে বললেন, তুমি চলে যাও বোন!– আমার কর্তব্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করো না।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে অবশেষে হাদীদ শারিনাকে সম্মত করাতে সক্ষম হলেন, শারিনা ফিরে যাবে।

কথা ছিল, শারিনা ওখান থেকে ভগ্ন মনে ধীরপায়ে ফিরে যাবে। কিন্তু সে পেছন ফিরে দৌড় দিল। হাদীদ আল্লাহর শোকর আদায় করল যে, মেয়েটা ফিরে গিয়ে তাকে ঝামেলা থেকে রক্ষা করেছে। তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন এবং সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। শারিনা তার উপর প্রীতি-ভালবাসার মাদকতা ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি ইসলামের সৈনিক। ফলে তিনি আবেগকে পরাজিত করে শারিনার প্রেমের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছেন।

হাদীদ মধ্যম গতিতে এগিয়ে চলছেন।

এখনও তিনি বেশি পথ অগ্রসর হননি। এখানে কোনো একটা ঘোড়ার পদশব্দ তার কানে এল। এখন তিনি একটা টিলার আড়ালে পথ চলছেন। পেছন থেকে একটা ঘোড়া দ্রুতগতিতে এদিকে এগিয়ে আসছে। হাদীদ মনে করলেন, সিপাহসালার হয়ত আরও কোনো বার্তা দিয়ে অন্য কোনো অশ্বারোহীকে তার পেছনে পাঠিয়েছেন। এখানে শত্রুর কোনো আশঙ্কা নেই।

হাদীদ ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন এবং টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে সামনে এসে তাকালেন, লোকটা কে আসছে। ঘোড়াটা কাছাকাছি চলে এসেছে। আরোহীর মুখ ও মাথা কাপড় দ্বারা ঢাকা। নিকটে এসেই ঘোড়া থেমে গেলে হাদীদ তাকিয়ে দেখলেন, আরে, এ তো শারিনা!

হাদীদ বিচলিত হয়ে উঠলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, তুমি আবার এসেছ শারিনা! এবার ঘোড়ায় চড়ে এসেছ! দয়া করে ফিরে যাও বোনটি আমার!

শারিনা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, এবার আমি ফিরে যেতে আসিনি। আমি পূর্ণ আশাবাদী, তোমার জন্য আমি একজন সহায়িকা বলে প্রমাণিত হব। এই সফরে, এই মিশনে আমি তোমার উপকারে আসব।

হাদীদ দেখেছেন, এই মেয়েটা কত সাহসিনী আর কত কিছু করতে পারে। সাধারণ কোনো প্রেমপাগলিনী মেয়ে হলে হাদীদ কোনোক্রমেই শারিনাকে সঙ্গে নিতে রাজি হতেন না। কিন্তু তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, ঠিক আছে, ওকে নিয়েই যাব।

'আচ্ছা; চলো।' হাদীদ পরাজিত কণ্ঠে বললেন।

দুজন পাশাপাশি এগিয়ে চলছে। হাদীদ দেখলেন, শারিনা এমন একটা পোশাক পরিধান করে এসেছে, যেটা তার মাথা ও চেহারা এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে, একান্ত কাছে এসেই বোঝা সম্ভব, মানুষটা নারী।

'এই অঞ্চল আমার জন্য নতুন বা অদেখা নয়'– শারিনা বলল– 'এখানে আমি নিজেকে অপরিচিত মনে করি না। এই দেশ আমরা শাসন করেছি। ভ্রমণ-বিহারের উদ্দেশ্যে আমি একাধিকবার এখানে এসেছি। সামনে একটা নদী আসবে। জায়গাটা খুবই সুন্দর ও মনোরম। আমরা ঘোড়াদুটোকে নদী থেকে পানি পান করাব আর নিজেরা কিছু সময় ওখানে বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি দূর করে নেব। দেখবে, শরীরটা অল্প সময়েই কেমন ঝরঝরা হয়ে যায়।

মনোহারী সবুজ-শ্যামল এলাকা। ভূমি কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। সুন্দর-সুন্দর ঝোপঝাড় ও সবুজ ঘাসে ঠাসা অনেকগুলো ঠিলা-টিপি। দুজন এগিয়ে চলছেন। একটা টিলার কোলঘেঁষে মোড় ঘোরাতেই সামনে ছোট্ট একটি নদী এসে পড়ল– শারিনা যে-নদীর কথা বলেছিল, সেটা। শারিনার কথায় হাদীদ ঘোড়া থামিয়ে

দিলেন। দুজনই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং ঘোড়াদুটোকে ছেড়ে দিলেন। পশুদুটো নদীর কূলে চলে গেল এবং পানি পান করতে লাগল।

শারিনা মাথার কাপড়টা খুলে ফেলল। মুখের আবরণটাও সরিয়ে নিল। এখানে তাকে দেখবার মতো কেউ নেই। এই আশঙ্কাও নেই যে, কোনো রোমান এদিকে এসে পড়বে আর তাকে দেখে চিনে ফেলবে। তার ধারণা, এখানে দূর-দূরান্তেও কোনো রোমান নাগরিক বা সেনার চিহ্নও নেই।

হাদীদ ও শারিনা যেখানে অবতরণ করেছে, সেখান থেকে কয়েক পা দূরে নদীটা একদিকে মোড় নিয়েছে। ওখানে একটা টিলাও আছে আর ওদিকে গিয়ে নদীটা টিলার পেছন চলে গেছে।

তারা দুজন বসে পড়ল। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের হৃদয়ে রোমাঞ্চ নেই। দুজনে মিশন নিয়ে আলাপ জুড়ে দিল। শারিনা হাদীদকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে, আমি তোমাকে একজন পুরুষের মতো সঙ্গ দেব এবং কোথাও কোনো পরিস্থিতিতে তোমার বোঝা হব না বা তোমার ঘাড়ে এমন কোনো দায়িত্ব চাপাব না, যেমনটা সাধারণত মেয়েরা পুরুষদের উপর চাপিয়ে থাকে।

দুজন আলাপচারিতায় নিমগ্ন। হঠাৎ তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কথার শব্দ তাদের কানে আসতে শুরু করল। শব্দটা টিলার আড়াল থেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। শব্দটা আরও কাছে চলে এলে তারা কথা বন্ধ করে নীরব হয়ে গেল। শারিনা হাদীদের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস কণ্ঠে বলল, লোকটা তো রোমান ভাষায় কথা বলছে!

শারিনার কাছে অস্ত্র আছে। আসবার সময় তরবারি ও খঞ্জর সঙ্গে করে এনেছে সে। হাদীদ তো সশস্ত্র আছেনই। তার কাছেও তরবারি-খঞ্জর আছে।

শব্দটা মাথার উপর এসে পৌঁছলে তারা উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তারা নিজেদের সামলে নেওয়ার আগেই তিনজন লোক টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। হাদীদের বুঝতে বিলম্ব হলো না, এরা রোমান সৈন্য। অথচ তারা রোমান উর্দিতে নেই। হাদীদের মতো তারাও সাধারণ পোশাক পরিহিত, যেমনটা এই অঞ্চলের লোকেরা পরে থাকে।

তাদের একজন গৌরবর্ণ যুবক, যার চোখদুটো কিছুটা নীল আর কিছুটা সবুজ। এই লোকটা শারিনাকে দেখে সহসা চকিত হয়ে খানিক পেছনে সরে গেল।

'আমি তোমার নামটা জানি না'– শারিনা যুবককে বলল– 'এতটুকু মনে আছে, তুমি সম্রাট হেরাক্ল-এর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ছিলে।'

'হ্যাঁ রাজকুমারী শারিনা!'– লোকটা বলল– 'আমার নাম রাওতাস। আমি রাজমহলের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ছিলাম। তা আপনি এখানে কীভাবে এলেন?' তারপর হাদীদের প্রতি ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটা কে?'

'ইনি একজন মুসলমান'– শারিনা বলল– 'আমি একে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার বোধহয় জানা নেই, আমি রুহা থেকে বেড়াতে বের হয়েছিলাম। তখন দুজন মুসলমান আমাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তবে তারা আমার সঙ্গে কোনো প্রকার অসদাচরণ করেনি। মুসলমান শত্রুর নারীদের সঙ্গে সেই আচরণ করে না, যেমনটা আমাদের সৈনিকরা করে থাকে। আমি তাদের হাতে বন্দি ছিলাম। কিন্তু এই লোকটি আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছে। তোমাকে পুরো কাহিনী শোনানোর সুযোগ আমার নেই। তুমি একজন যুবক এবং যৌবনের চেতনা সম্পর্কে অবহিত। এই লোকটি আমার প্রেমে এমনভাবে মজে গেল যে, আমার খাতিরে আপন ধর্ম পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। এখন সুযোগ হাতে এসেছে এবং দুজন ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু জানি না, আমরা কোথায় যাব। ভালই হলো যে, তোমাকে পেয়ে গেছি। এখন তুমিই বলতে পার, আমাদের ফৌজ কোথায় আছে। আমি একে ওখানে নিয়ে খ্রিস্টান বানিয়ে নেব। এমন আকাঙ্ক্ষা ইনি ব্যক্তও করেছেন।'

হাদীদ চুপচাপ বসে আছেন। তিনি জানেনই না, শারিনা এই রোমান অফিসারের সঙ্গে কী কথা বলছে। শারিনা শামের ভাষা, তথা আরবি বুঝতে ও বলতে পারে। সেই ভাষায় হাদীদকে জানাল, এই যুবক রোমান লোকটার সঙ্গে কীসব মিথ্যা কথা বলেছে। রাওতাস বলল, আমি তো জানি-ই না, আপনি অপহৃতা হয়েছেন। লোকটা আনন্দ প্রকাশ করল যে, শারিনা শুধু মুসলমানদের বন্দিদশা থেকে মুক্তই হয়ে আসেনি, বরং একজন মুসলমানকেও খ্রিস্টান বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে।

রাওতাসের সঙ্গে আরও যে-দুজন লোক আছে, তারা রোমান ফৌজের সৈনিক।

শারিনা তাদের ওখানে বসিয়ে দিল এবং রাওতাসকে জিজ্ঞেস করল, সম্রাট হেরাক্ল এখন কোথায় আছেন এবং আমাদের ফৌজ কোথায়? শারিনা রাজকন্যা। এই সুবাদে রাওতাস তার প্রতি শুধু প্রভাবিতই নয়, বরং তাকে সমীহও করতে বাধ্য। সে শারিনাকে জানিয়ে দিল, সম্রাট হেরাক্ল এখন কোথায় অবস্থান করছেন এবং আমাদের ফৌজ ও কতগুলো কাবায়েলি বাহিনী এই পর্বতমালার পেছনে সমবেত হয়ে অবস্থান নিয়েছে। আমরা হেম্স নগরী অবরোধ করে শহরটা দখল করে নেব।

শারিনা তথ্যগুলো হাদীদের ভাষায় তার কানে দিল এবং কিছু একটা ইঙ্গিতও করল। কথা বলতে-বলতে রাওতাস এও জানাল, এই বেশে আমি হেম্স যাচ্ছি। আমাকে জানতে হবে, হেম্সের মুসলমানদের সংখ্যা কত, দুর্গঘেরা এই নগরীটা কীভাবে দখল করা যাবে এবং মুসলমানদের কোনো দিক থেকে সাহায্য আসবার সম্ভাবনা আছে কি-না।

শারিনা এমনভাবে উঠে দাঁড়াল, যেন বসে-বসে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং এখন উঠে দাঁড়িয়ে পাদুটো সোজা করতে চাচ্ছে। সে কথা বলতে-বলতে রোমান

লোকগুলোর পেছনে চলে গেল এবং রাওতাস ও তার সঙ্গীদের চোখ এড়িয়ে ঝটপট তরবারিটা বের করে হাতে নিল। পরক্ষণেই এক সিপাইর ঘাড়ে এমন জোরদার আঘাত হানল যে, গলাটা তার অর্ধেক কেটে গেল। রাওতাস এই দৃশ্য দেখল বটে; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। এবার শারিনা তরবারিটা রাওতাসের অপর সঙ্গীর পাঁজরে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিল, যেন বর্শার আঘাত হেনেছে।

রাওতাস এবার কিছু একটা আঁচ করে দ্রুতবেগে উঠে দাঁড়াল এবং তরবারি হাতে নিয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে হাদীদের তরবারির আগা তার বুকের সঙ্গে ঠেকে গেছে। শারিনা ঘোষণা দিয়ে বসল, তুমি মোকাবেলার চেষ্টা করো না; আমরা তোমাকে প্রাণে মারব না।

শারিনার তরবারির আগাও রাওতাসের এক পাঁজরের সঙ্গে ঠেকে রইল। রাওতাস তরবারির হাতল থেকে হাতটা সরিয়ে নিল।

শারিনা যে-কাপড় দ্বারা মুখ-মাথা আবৃত করেছিল, হাদীদ সেটা খুলে নিয়ে রাওতাসের হাতদুটো পিঠমোড়া করে বাঁধলেন। তারপর দুজনে মিলে ধরে তাকে একটা ঘোড়ার পিঠে তুলে বসিয়ে দিলেন। হাদীদ তার পেছনে বসলেন আর শারিনা নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসল। তারা সেখান থেকে রওনা হলো।

হাদীদ ও শারিনা রুহা থেকে পালিয়ে আসবার সময় পথে একস্থানে এক রোমান অফিসার তাদের দেখে ফেলেছিল। সে-সময় উক্ত অফিসার তার দুজন সিপাই দ্বারা হাদীদকে হত্যা করাবার চেষ্টা করেছিল। তখন হাদীদ ও শারিনা একটা কূপের কিনারায় ঘুমিয়ে ছিল। এখনও আবার সেই একই ঘটনা ঘটল। কাজেই এই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়ার মতো ছিল না যে, এরাও সুযোগমতো তেমন কোনো অঘটন ঘটানোর চেষ্টা করত। পরিবেশ ও পরিস্থিতি এমনই ছিল যে, মনে এরূপ আশঙ্কা জাগ্রত হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক ছিল। সেজন্য শারিনা আগে-ভাগেই সেই শঙ্কাটা দূর করে ফেলল। শারিনা জানে, সাপ আর শত্রুকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই।

হাদীদ ও শারিনা রাওতাসকে হেম্‌স নিয়ে এলেন এবং তাকে সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর সামনে হাজির করলেন। আবু উবায়দা (রা.) ততক্ষণে এতটুকু তথ্য লাভ করেছেন যে, কতিপয় কাবায়েলি লোক নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীর আদলে সংগঠিত হয়ে কোথাও যাচ্ছে। কিন্তু তারা কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, সেই তথ্য তিনি পাননি। আবু উবায়দা (রা.) সেদিকেও গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং শাম রাজ্যে তাঁর যেসব মুসলিম সালার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন, তাঁদের কাছে বার্তা প্রেরণ করেছেন, আপনারা খোঁজ নিন, অগ্নিপূজক কাবায়েলিরা কোথায় যাচ্ছে এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ তৎপরতা কী।

এ এক কুদরতি মদদ ছিল যে, শারিনা হাদীদের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। হাদীদও এমন আনাড়ী ছিলেন না যে, তিনি গিয়ে কোনো তথ্য বের করে আনতে সফল হতেন না। কিন্তু রাওতাসকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার ফলে আসল পরিস্থিতিটা ভালো করে জানা গেল।

রাওতাসকে বলা হলো, তুমি যদি সম্রাট হেরাক্ল-এর প্রত্যয় ও পরিকল্পনা ঠিকঠিক ও পুরোপুরি বলে দাও, তা হলে তোমায় প্রাণে রক্ষা করা হবে এবং যুদ্ধের পর গোলাম না বানিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হবে।

রাওতাস চিন্তা করল, আমার সম্রাট হেরাক্ল পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছেন। তার বাহিনীর দম নাকের ডগায় এসে পড়েছে। এমতাবস্থায় জীবন বাঁচানোর পথ অবলম্বন করা-ই উত্তম হবে। সে সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)কে হেরাক্ল-এর পরিকল্পনার সব তথ্য ফাঁস করে দিল এবং জানিয়ে দিল, রোমান ফৌজ ও কাবায়েলি বাহিনী হেম্স অবরোধ করে ফেলেছে। আরও কিছু কাবায়েলি সৈন্য এসে পৌঁছলেই তারা হেম্সের উপর জোরদার আক্রমণ চালাবে।

তাবারি, বালাযুরি ও জাওযি এই ঘটনাটিকে ইতিহাসের পাতায় এভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে, রোমান ফৌজ ও কাবায়েলি সৈন্যদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ছিল। অপর দিকে মুসলমানদের যে-কজন মুজাহিদ হেম্সে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে ছিল। তাঁরা লিখেছেন, এটাই প্রথম ঘটনা ছিল, যার ফলে সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর মুখের বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যাটা এই ছিল যে, অবশিষ্ট সব কজন সালার– খালিদ ইবনে অলীদ (রা.), শুরাহবিল ইবনে হাসানা (রা.) ও আমর ইবনে আস (রা.)-এর মতো ইতিহাসনির্মাতা সেনানায়কগণ তাঁর থেকে অনেক দূরে ছিলেন। বিশাল-বিশাল অঞ্চলের শাসন ও সুরক্ষার ভার তাঁদের সব কজনের দায়িত্বে অর্পিত ছিল, যাকে উপেক্ষা করার কোনোই সুযোগ ছিল না।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁর অধীন সালারদের ডাকলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে হেম্সে ছিলেন। তাঁদের তিনি প্রাপ্ত তথ্যাদি অবহিত করলেন এবং সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন করলেন। তার পর পত্র লিখে একজন দ্রুতগামী দূতকে মদীনায় আমীরুল মুমিনীন-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পত্রে তিনি হেমসে কেমন এক সমস্যা ও ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত হয়ে আছেন, তার বিবরণ দিলেন। পত্রে তিনি খলীফার কাছে আবেদন জানালেন, আপনি আমাকে নির্দেশনা দিন এবং যতটুকু সাহায্য পাঠানো সম্ভব হবে দ্রুত পাঠিয়ে দিন।

সমস্ত ঐতিহাসিক লিখেছেন, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, হেরাক্ল হেম্স দখল করে নিয়ে যাবেন এবং এই পরাজয় মুসলমানদের জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। আবু উবায়দা (রা.)-এর বাইরের সাহায্যের খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে-সময়

পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না যে, কোথাও থেকে সাহায্য অত দ্রুত এসে পৌছানো সম্ভব হবে কি-না, যত দ্রুততার সঙ্গে রোমান ও কাবায়েলি বাহিনী হেম্‌সের দিকে ধেয়ে আসছে।

চার

শুধু হেম্‌সই নয়– গোটা শাম রাজ্যই মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সামনে এসে দাঁড়াল। রোমান বাহিনীর ধৃত অফিসার রাওতাস তথ্য দিয়েছিল, এ যাবত সমবেত রোমান ফৌজ ও অমুসলিম কাবায়েলি সৈন্যদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এদের সঙ্গে যুক্ত হতে কাবায়েলিদের আরও সৈন্য আসছে। এই প্রথমবারের মতো সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর মতো শক্ত ধাতুওয়ালা ব্যক্তিত্বের চেহারায় উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠল। উদ্বিগ্ন তাঁর হওয়ারই কথা ছিল। তাঁর কাছে ছিলইবা কী! মুজাহিদদের সর্বসাকুল্য সংখ্যা মাত্র তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে।

রাওতাস থেকে সম্রাট হেরাক্‌ল-এর তথ্য সংগ্রহের সময় সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) শারিনাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজ যা করবার ছিল, শারিনা করে দিয়েছে। এ তার বিরাট এক কীর্তি। কিন্তু সমর-বিষয়ক আলোচনায়– যার সম্পর্ক সেনাপতি পর্যায়ের পুরুষদের সঙ্গে– একজন নারীর উপস্থিতি অনাবশ্যক ও অসঙ্গত।

আবু উবায়দা (রা.) রাওতাসের পুরো বক্তব্য শুনে দু-তিনজন রক্ষীসেনাকে ডেকে বললেন, একে কারাগারে নিয়ে আটকে রাখো।

আদেশ শুনে রাওতাস প্রতিবাদের সুরে বলল, আমি আপনাকে সব তথ্য বলে দিয়েছি– আপনার প্রয়োজনীয় কোনো তথ্যই আমি গোপন রাখিনি। আপনি ওয়াদা করেছেন, আমাকে মুক্ত করে দেবেন। তারপরও কারাগারে পাঠাচ্ছেন কেন?

'আমি আন্তরিকভাবে তোমাকে সম্মান করি'– আবু উবায়দা (রা.) বললেন– 'আমি যুদ্ধবন্দি হিসেবে তোমাকে কয়েদখানায় আটক করছি না। যখনই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, ওয়াদা অনুযায়ী আমি যথাযথ সম্মানের সঙ্গে তোমাকে মুক্ত করে দেব।'

আবু উবায়দা (রা.) রক্ষীদের ইঙ্গিত করলেন। রক্ষীরা রাওতাসকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। হাদীদও তাদের সঙ্গে এলেন এবং শারিনার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' শারিনা রাওতাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

'কারাগারে।' হাদীদ উত্তর দিলেন।

কারাগারে কেন?'– শারিনা বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল– 'ওকে এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখো।'

সিপাহসালারের আদেশ-নিষেধে হস্তক্ষেপ করো না শারিনা!' হাদীদ বললেন– 'তোমার জ্ঞান সে পর্যন্ত পৌঁছবে না। অত বিচক্ষণতা তোমার নেই।'

'আমি সিপাহসালারের সঙ্গে দেখা করতে চাই'– শারিনা বলল– 'তুমিও সঙ্গে আসো। আমার মাঝে সিপাহসালারের সমান জ্ঞান নেই বটে; কিন্তু আমার মাথায় একটা বিষয় এসেছে।'

হাদীদের আর কোনো কথা না শুনেই শারিনা ভেতরে চলে গেল। হাদীদও তার পেছনে-পেছনে ঢুকে পড়ল– না জানি মেয়েটা কী থেকে কী বলে ফেলে আর সিপাহসালার তাতে অসন্তুষ্ট হন।

'মুহতারাম সালারে আজম!'– শারিনা ভেতরে প্রবেশ করেই বলল– 'আমি আপনার সিদ্ধান্ত ও আদেশ-নিষেধে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি জানতে চাই, রোমান অফিসারকে আপনি কারাগারে আটক করার আদেশ দিলেন কেন? আপনি তো তাকে মুক্ত করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন!'

'শোনো মেয়ে!'– সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) মিটিমিটি হেসে বললেন– 'কৃতিত্বটি যদি তোমার না হতো, তা হলে এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিতাম না। আমি আন্তরিকভাবে তোমার এই চেতনার প্রশংসা করছি। কিন্তু তোমার বয়স এখনও কম। সেজন্য তুমি বুঝতে পারবে না, চেতনার লাগাম যদি বিবেকের হাতে না থাকে, তা হলে সেই চেতনা ক্ষতিও করতে পারে। আমি রোমান অফিসারকে কেন কারাগারে আটক রাখছি, এই প্রশ্ন করার অধিকার তোমার আছে। আমি যদি এখনই তাকে মুক্ত করে দেই, তা হলে সে সোজা হেরাক্‌ল-এর কাছে পৌঁছে যাবে এবং তাকে বলে দেবে, আমি মুসলমানদের হাতে পড়ে গিয়েছিলাম এবং সমস্ত গোপন তথ্য উগড়ে দিয়েছি। তখন সঙ্গে-সঙ্গে হেরাক্‌ল তার আক্রমণ ও অবরোধের পরিকল্পনা বদল করে ফেলবেন। হতে পারে, তখন তিনি হেম্‌সের পরিবর্তে আমাদের দখলে আসা অন্য কোনো নগরীতে অভিযান চালাবেন।

'আবার এমনও হতে পারে, সে আমাদের ভুল তথ্য দিয়েছে। আমি আগেই তথ্য পেয়েছি, হেম্‌স থেকে দূরে পাহাড়ি অঞ্চলে হেরাক্‌ল-এর ফৌজ ও কাবায়েলি বাহিনী এমনভাবে সমবেত হয়েছে যে, হেম্‌স নগরী তাদের অবরোধে এসে পড়েছে। তাদের অবস্থান এখান থেকে বেশ দূরে আছে একথা সঠিক। কিন্তু এই ফৌজ যদি এই অবস্থায় এগিয়ে আসে, তা হলে হেম্‌স পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে আর আমরা দুর্গে অবস্থান করে লড়াই করতে বাধ্য হব। তখন আমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা এই হবে যে, বাইরে থেকে পাঠানো সাহায্য আমাদের কাছে

এসে পৌঁছতে পারবে না। প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমি তাকে মুক্তি দেব। এই প্রতিশ্রুতিতে আমি অটল আছি। মুক্তি আমি তাকে দেব। এই লড়াইয়ে বিজয় অর্জিত হওয়ার পরই আমি তাকে ছেড়ে দেব।'

'আমি আপনার প্রশংসা করছি মহামান্য সিপাহসালার!'– শারিনা বলল– 'আপনার সম্মুখে আমার মর্যাদা কিছুই নয়। তারপরও আপনি ধৈর্যসহকারে আমার বক্তব্য শুনেছেন এবং আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। রোমানদের ওখানে নিম্নপদের কোনো লোক তার সেনাপতির সামনে দাঁড়িয়ে শব্দ করে নিঃশ্বাসটাও ফেলতে পারে না। সম্রাট হেরাক্ল-এর সঙ্গে এভাবে কথা বলার দুঃসাহস আমি দেখাতে পারতাম না। অথচ তিনি আমার পিতা। পিতার আগে প্রথমে তিনি নিজেকে রাজা, তারপর দেশের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মনে করেন।'

'শোনে শারিনা!'– আবু উবায়দা (রা.) বললেন– 'এ-সময়ে আমি ভীষণ ব্যস্তও, বিচলিতও। বিশেষ আর কোনো কথা থাকলে বলো। আমাদের এখানে নিজের প্রশংসা শুনবার কোনো রীতি নেই। তা ছাড়া আমার হাতে অত সময়ও নেই। তুমি আমার প্রশংসা করো না। প্রশংসার হকদার তুমি। অনেক বড় কৃতিত্ব তুমি দেখিয়েছ।'

'বিশেষ একটা কথা-ই আমি আপনাকে বলতে এসেছি'– শারিনা বলল– 'এই রোমান অফিসারকে কারাগারের পরিবর্তে ভালো আরামদায়ক কোনো কক্ষে রাখুন আর বাইরে পাহারার ব্যবস্থা করুন। তা হলে সে অনুভব করতে পারবে না, তাকে আটকে রাখা হয়েছে। তারপর আমাকে অনুমতি দিন; আমি তার সঙ্গে মিলিত হতে থাকব। আশা করি, আমি তার বুক থেকে আরও কিছু কাজের কথা বের করতে পারব।'

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) প্রথমে হাদীদের প্রতি তাকালেন। তারপর সেই দুই সালারের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, যারা তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। মুখে তাঁর সামান্য মুচকি হাসি।

'আল্লাহর কসম, এই মেয়েটা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কথা-ই বলেছে'– আবু উবায়দা (রা.) বললেন– 'তোমরা নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারছ, আমি কতখানি অস্থিরতার মধ্যে আছি আর আমার মস্তিষ্ক কোথায় আটকে আছে। আমার দেমাগ যদি উপস্থিত থাকত, তা হলে এ-বিষয়টি আমার নিজেরই মাথায় আসত। ঠিক আছে শারিনা! রাওতাসকে উন্নত মানের কক্ষেই রাখা হবে এবং তাকে এই অনুভূতি দেওয়া হবে যে, তুমি বন্দী নও– আমাদের অতিথি।'

'আর আপনার এই সদ্ব্যবহারের সূত্র ধরে আমি তার মাথায় বুঝ দিতে চেষ্টা করব, যাতে সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়'– শারিনা বলল– 'তবে আমার প্রথম ও প্রধান

লক্ষ্য থাকবে, আমি তার থেকে আরও কিছু তথ্য বের করব। হাদীদ আমার সাথে থাকবেন। কিন্তু রাওতাসের সঙ্গে আমি একাকি মিলিত হব।'

আবু উবায়দা (রা.) তখনই দারোয়ানকে ডেকে আদেশ করলেন, রোমান অফিসারকে কারাগারে পাঠিয়ো না। তাকে অন্য কোথাও অতিথির মতো রাখো এবং এর জন্য যা-যা করণীয় সব ব্যবস্থা করো। আর তার কক্ষের সামনে চব্বিশ ঘন্টার জন্য পাহারা বসিয়ে দাও।

আবু উবায়দা (রা.) খালিদ ইবনে অলীদ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর সমপর্যায়ের সালার ছিলেন। খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর পদচ্যুতির পর আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) বাহিনীর কমান্ড তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তিনি ঠিকই বলেছিলেন যে, যে-পরামর্শ শারিনা আমাকে দিয়েছে, সেটি আমারই মস্তিষ্কে আসা দরকার ছিল। কিন্তু আসেনি। তার কারণ ছিল, হেম্স তাঁর হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সাহায্য আগে এসে পৌঁছবে, নাকি হেরাক্ল-এর বাহিনী আগে চলে আসবে এই ভাবনা ও অস্থিরতা তাঁর বুদ্ধি-বিবেককে আহত করে তুলেছিল। রোমান বাহিনী এসে পৌঁছবার আগে সাহায্য এসে পৌঁছে যাবে এমন আশা তিনি করতেই পারছিলেন না। ফলে অন্য কিছু ভাববার শক্তি ও যোগ্যতা তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি একজনের স্থলে দুজন দূত আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

তিনি দূতদের অত্যন্ত কঠোরভাবে বলে দিলেন, তোমরা ঘুমাবে তো ঘোড়ার পিঠে ঘুমাবে। খাবে তো ঘোড়ার পিঠে বসে খাবে। একটা নির্দেশনা তিনি এও দিলেন যে, আমি দুজন দূত এজন্য পাঠাচ্ছি, যদি পথে একজনের কোনো সমস্যা হয়ে যায় বা অসুস্থ হয়ে পড় এবং অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে যায় যে, মরে যাওয়ার উপক্রম হও, তা হলে অপরজন তাকে ফেলে ওখানে না দাঁড়িয়ে একাকি চলে যাবে। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর ভাষা ছিল এ-রকম– 'উড়ে মদীনা পৌঁছে যাবে'।

সেকালের দূতরা এমন ছিলেন না যে, বার্তা নিয়ে কোথাও রওনা হলেন, তো নিজের ইচ্ছামতো পথ চললেন– মন চাইলে এগুতেন, মন চাইলে বসে থাকতেন। তাঁরাও মুজাহিদ ছিলেন। তাঁদের জযবা ছিল, চেতনা ছিল। কর্তব্যপালনে আপন জীবনকে কুরবান করে দেওয়াকে তাঁরা ঈমানের অংশ মনে করতেন। বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থাও ছিল বেশ চমৎকার। একটু পর-পর চৌকি বসানো ছিল, যেখানে তরতাজা ও সুস্থ-সবল ঘোড়া বিদ্যমান থাকত। দূতরা প্রতিটা চৌকিতে ক্লান্ত বাহনটা রেখে নতুন বাহন নিয়ে এগিয়ে যেতেন। মরুপথে উট রাখা থাকত। কারণ, মরু-অঞ্চলে ঘোড়ার চেয়ে উট বেশি দ্রুত চলতে পারত এবং পানির প্রয়োজন হতো না।

হেম্স থেকে মদীনার দূরত্ব কমপক্ষে এক হাজার দুশো মাইল এবং এই পুরো পথের বেশিরভাগই রুক্ষ মরু-অঞ্চল।

* * *

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) হেম্‌সে যে-বাড়িটাতে নিজের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছিলেন এবং নিজের থাকারও ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা সাধারণ কোনো ভবন ছিল না। এই অঞ্চলটা; বরং গোটা শাম রাজ্য কখনও ইরানিদের, কখনওবা রোমানদের দখলে আসছিল। দুজন রাজা ছিলেন। তারা সবখানেই নিজেদের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করে রেখেছিলেন। রোমান ফৌজের এই অফিসারকে সেই প্রাসাদেরই একটা কক্ষে থাকতে দেওয়া হলো। কক্ষের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, খাট-পালঙ্ক ও অন্যান্য আসবাবপত্র ছিল রাজকীয়। কক্ষের বাইরে পাহারা বসিয়ে দেওয়া হলো। তার জন্য উন্নত মানের খাবারের ব্যবস্থা করা হলো।

পরদিন শারিনা তার কক্ষে প্রবেশ করল। ঘুরে-ঘুরে কক্ষের সব কিছু দেখল– খাট-পালঙ্ক, বিছানাপত্র সব, যেন সে কক্ষটা পর্যবেক্ষণ করছে।

'নিজেকে বন্দি মনে করো না'– শারিনা রাওতাসকে বলল– 'এখানে তুমি অতিথি। কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? আমার ধারণা, এখানে তোমার প্রয়োজনীয় কোনো কিছুরই অভাব নেই। তুমি কি এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে না যে, তোমাকে কারাগারের পুঁতিগন্ধময় অন্ধকার প্রকোষ্টে নিক্ষেপ করা হয়নি?'

'তোমাদের সিপাহালার আমাকে মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন'– রাওতাস বলল– 'এখানে পাহারা বসানোর অর্থই হলো, আমি বন্দি।'

'তুমি ফৌজের একজন অফিসার'– শারিনা বলল– 'যদি তোমাদের কাছে তোমাদের শত্রুপক্ষের কোনো ব্যক্তি তোমারই মতো এভাবে আটক হতো আর সে তার পক্ষের সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে দিত, যেভাবে তুমি করেছ, তা হলে কি তোমরা তাকে মুক্ত করে দিতে যে, যাও; বাহিনীতে গিয়ে জানাও, আমি সব তথ্য বলে দিয়ে এসেছি আর এখন তোমরা পরিকল্পনা বদল করে ফেলো?

রাওতাস মাথাটা নত করে ফেলল, যেন শারিনার উত্তরটা তার কাছে যথার্থ বলেই মনে হয়েছে।

'আমি তোমার কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকব'– শারিনা বলল– 'আমরা দুজনই রোমান। এটা একটা বন্ধন, যাকে আমরা কেউই এড়াতে পারব না।'

'কিন্তু এখন তো তুমি মুসলমান'– রাওতাস বলল– 'তুমি কাজে-কর্মে প্রমাণ করে দিয়েছ, আমাকে তুমি নিজের শত্রু মনে করছ। আচ্ছা, বলো তো, এখানে তুমি কীভাবে এসেছ এবং একজন মুসলমানের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলে?'

'তোমার বিস্ময় ও কৌতূহল আমি বুঝি'– শারিনা বলল– 'তুমি নিশ্চয় ভেবে থাকবে, সম্রাট হেরাক্‌ল-এর মেয়ে সাধারণ একজন মুসলমানের সঙ্গে কেন চলে এল! আমার সঙ্গে যে-লোকটা ছিল, তার নাম হাদীদ ইবনে মুমিন খাযরাজ।

বাহিনীতে তার পদমর্যাদা সামান্য। আমাদের যুদ্ধবন্দি ছিল। লোকটাকে আমার এত ভালো লাগল যে, আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম এবং তার সঙ্গে চলে এলাম।'

শারিনা রাওতাসকে তার ও হাদীদের পলায়নের কাহিনী শোনাল। কিন্তু এমন ধারায় ও এমন ভাষায়, যেন নিজের এই পদক্ষেপটা তার পুরোপুরি মনঃপূত হয়নি। রাওতাস তাকে জিজ্ঞেস করল, এখানে তুমি স্বাচ্ছন্দে আছ, নাকি কোনো সমস্যা অনুভব করছ?

'এখানে আমি মুসলমান হতে আসিনি'– শারিনা মিথ্যা বলল– 'পিতামাতার প্রতিও আমার কোনো অভিযোগ ছিল না। বোধহয় আমি ভালবাসার তৃষ্ণা অনুভব করছিলাম। আমার বয়সটাও এমন যে, এই বয়সে বিবেকের উপর আবেগ প্রাধান্য লাভ করে। এই হাদীদ লোকটা আমার এত ভালো লাগল কেন আমি বলতে পারব না। মনে হয়, তার কাছে এমন কোনো জাদু আছে, যেটা আমাকে সম্মোহিত করে ফেলে এবং আকর্ষণীয় একটা ভেল্‌কির রূপ ধারণ করে আমার ঘাড়ে চড়ে বসে। ইসলামের প্রতি আমার কোনো হৃদ্যতা নেই। আমার আন্তরিকতা হাদীদের প্রতি। আমি যদি তোমার দুজন সৈনিককে হত্যা করে তোমাকে এখানে না নিয়ে আসতাম, তা হলে তুমি হাদীদকে মেরে ফেলতে। তোমাকে আমি এখানে হাদীদকে খুশি করতে এনেছি। হাদীদের সালার তার উপর খুবই সন্তুষ্ট।

'কিন্তু বললে হয়ত তুমি বিশ্বাস করবে না, এই লোকগুলো আমার একটুও ভালো লাগে না। আমি একজন রাজকন্যা ছিলাম। আর এখন কোথায় এক বনে তাঁবুতে পড়ে থাকছি আর মাটিতে ঘুমাচ্ছি। এরা খুবই সরল ও পশ্চাদপদ মানুষ। আজ তোমাকে এখানে পেয়ে এবং তোমার পাশে বসতে পেরে আমি অন্তরে খুবই প্রশান্তি অনুভব করছি। মনটা এখন আমার খুবই ভালো লাগছে। খেয়াল রেখো, আমাকে তুমি তোমার শত্রু মনে করো না। তোমার জন্য আমার যা-কিছু করা সম্ভব ছিল, করেছি। তোমাকে কয়েদখানায় নিয়ে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু আমি তার বাস্তবায়ন প্রতিহত করে এই কক্ষে রাখার সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নিয়েছি।'

'মুসলমানরা যদি পরাজিত হয় আর এখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তখন তুমি কী করবে?' রাওতাস জিজ্ঞেস করল।

'আমি তোমার কাছে আশা রাখব, আমার গোপন তথ্যগুলোকে তুমি তোমার হৃদয়ের কবরে দাফন করে ফেলবে'– শারিনা বলল– 'আমি চেষ্টায় আছি, হাদীদকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাব এবং তাকে ইসলাম থেকে বের করে এনে খ্রিস্টান বানিয়ে নেব। মুসলমানরা যদি এখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়, তা হলে হাদীদকে নিয়ে আবার এখানে ফিরে আসব।'

* * *

পরদিন শারিনা পুনরায় রাওতাসের কক্ষে গেল। রাওতাস তো যেন শারিনারই অপেক্ষায় সময় পার করছিল। আগের দিন শারিনা তার উপর এমন ক্রিয়া রেখে এসেছিল যে, রাওতাস ভীষণ অস্থিরতার সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে শুরু করল। লোকটা বৃদ্ধ বা বিগতযৌবন পুরুষ নয়। এখনও টগবগে যুবক। শারিনার কথার চেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে মেয়েটার রূপ-যৌবন দ্বারা। শারিনার প্রতি কৃতজ্ঞও ছিল যে, তাকে সে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে রক্ষা করে এই রাজকীয় বিলাসবহুল কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করেছে। আজ যখন শারিনা তার কক্ষে প্রবেশ করল, তখন আগের চেয়ে অধিক মমতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ; কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো?

'না'– রাওতাস বলল– 'তুমি যদি আমার কাছে আসা ছেড়ে দাও, তা হলেই আমার খুব কষ্ট হবে।'

'আমি রোমান বাহিনীর আক্রমণের অপেক্ষা করছি'– 'শারিনা বলল– 'জানি না, সম্রাট হেরাক্‌ল কীসের অপেক্ষায় সময় নষ্ট করছেন! হেম্‌সকে অবরোধ করে ফেলার এটা খুবই উপযুক্ত সময়। নগরীর ভেতরে সৈন্যসংখ্যা খুবই কম। এরা বেশি সময় মোকাবেলা করতে পারবে না।'

'হয়ে যাবে'– রাওতাস অবলীলায় বলল– 'এসব হলো গিয়ে রাজা-বাদশাহ আর সেনা-অধিনায়কদের ব্যাপার-স্যাপার। তুমি এই যে সামান্য সময়টুকু আমার সঙ্গে কথা বলতে আসছ, আমি এই নীরস ও কাঠখোট্টা আলোচনা দ্বারা তার স্বাদ নষ্ট করতে চাই না। সম্রাট যখন ভালো মনে করবেন, তখন বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেবেন। এসব বাদ দিয়ে তুমি অন্য কথা বলো।

শারিনা অনুভব করল, রাওতাস তার সঙ্গে যুদ্ধবিষয়ে আর কোনো কথা বলতে চাচ্ছে না। এক দিকে সে এ-বিষয়টা এড়াতে চাচ্ছে আর অপর দিকে রূপসী রাজকন্যা শারিনার সঙ্গে রোমাঞ্চকর কথাবার্তা বলে সময় কাটাতে চেষ্টা করছে। সেমতে শারিনা প্রসঙ্গ বদল করে বিনোদনমূলক এটা-ওটা বলতে শুরু করল।

'আমার একটা প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে না'– রাওতাস বলল– 'আমি মদের নেশায় চুর হয়ে আছি। তুমি তো জান, আমরা পানির মতো মদ পান করি। কিন্তু এখানে দেখার জন্যও এক ফোঁটা মিলছে না।'

'তুমি বোধহয় জান না'– শারিনা বলল– 'মুসলমান মদ পান করে না। শুধু তা-ই নয়, এরা মদ পান করাকে অপরাধ মনে করে এবং কেউ পান করলে তাকে শাস্তি দেয়।'

শারিনা খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। রাওতাস যখন মদের নাম উল্লেখ করল, তখন তার মনে পড়ে গেল, তার জাতি এতটাই মদ্যপ যে, তাদের জীবন পানি ছাড়া চলতে পারে; কিন্তু মদ ছাড়া চলে না। শারিনা চিন্তা করল, এটা রাওতাসের এমন

একটা দুর্বলতা যে, একে অস্ত্র বানিয়ে তার ভেতর থেকে সমস্ত গোপন তথ্য টেনে বের করে আনা যেতে পারে।

এই ভাবনা ভেবে শারিনা মদের আলাপই চালিয়ে যেতে লাগল এবং এমনসব কথাবার্তা বলে যেতে শুরু করল যে, রাওতাসের মদের নেশা আগের চেয়ে বেড়ে গেল। মানুষ মদ পান করে মাতাল হয়। কিন্তু শুধু মদের আলাপ দ্বারা শারিনা রাওতাসকে মদের নেশায় পুরোপুরি পাগল করে তুলল।

'কিছু একটা করো শারিনা!– রাওতাস বলল– 'এই শহরে খ্রিস্টানরাও তো বাস করে থাকবে। আর তারা অবশ্যই মদ পান করে থাকে। যেকোনো উপায়ে হোক তুমি কোনো খ্রিস্টান বা অন্য কোনো অমুসলিমের কাছ থেকে আমার জন্য কতটুকু মদ এনে দাও।'

'এনে তো দেব'– শারিনা বলল– 'কিন্তু ধরা পড়লে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি নিজেকে এমন ঝুঁকিতে ফেলতে চাই না।'

রাওতাস শারিনার কাছে অনুনয় শুরু করে দিল।

অবশেষে শারিনা বলল, আমি সর্বাত্মক চেষ্টা চালাব এবং যে করে হোক তোমাকে মদ এনে দেব। কিন্তু প্রতিদিন আনতে পারব না। সংগ্রহ করতে পারলেও তোমাকে এনে দিতে পারব না। কারণ, পাহারাদার সারাক্ষণ পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। মদের ঘ্রাণ পেলে সে সোজা ভেতরে চলে আসবে এবং মদপানের অপরাধে আমাদের দুজনকে সিপাহসালারের সম্মুখে নিয়ে দাঁড় করাবে। তারপর সিপাহসালার আমাদের এমন বেত্রাঘাত করবেন যে, তা সহ্য করার শক্তি আমারও থাকবে না, তোমারও না।

রাওতাসের সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করে শারিনা ওখান থেকে বেরিয়ে গেল এবং হাদীদের সঙ্গে দেখা করল। বলল, যেকোনোভাবে হোক তুমি আমাকে মদের ব্যবস্থা করে দাও।

হাদীদ মনে করল, শারিনা রোমান অফিসারের মনোরঞ্জনের জন্য মদ চাচ্ছে। তাই বলল, মদ পান করা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর শাস্তি কী হতে পারে হাদীদ শারিনাকে তাও জানাল।

'মদ পান করা যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং তার শাস্তি কী আমি এখানকার মহিলাদের থেকে আগেই শুনেছি'– শারিনা বলল– 'রাওতাস থেকে আমাকে আরও অনেক তথ্য বের করতে হবে। কিন্তু লোকটা মুখ খুলছে না এবং কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। ভাবে মনে হচ্ছে, সে সিপাহসালারের কাছে যা-কিছু তথ্য প্রদান করেছে, তার কাছে আরও তথ্য আছে; কিন্তু দিতে চাচ্ছে না। আজ সে আমার কাছে মদ চেয়েছে এবং মদের নেশায় ভীষণ চুর হয়ে আছে।

এমতাবস্থায় আমি চাচ্ছি, যতটুকুই সম্ভব হোক মদপান করিয়ে তার থেকে আরও তথ্য বের করব।'

রাওতাস ঠিকই বলেছে, হেম্‌সে খ্রিস্টানদের বসতি আছে। কিছু মূর্তিপুজকও আছে আবার দু-চার ঘর অগ্নিপুজকও আছে এবং তাদের কাছে মদ থেকে থাকবে।

'আরও একটা কথা মনে পড়েছে'– হাদীদ বলল– 'তার থেকে জানতে হবে, হেম্‌সে হেরাক্‌ল-এর কোনো গোয়েন্দা আছে কি-না। যদি থাকে, তা হলে তথ্য নিতে হবে, তারা কারা। আমি তোমাকে মদ জোগাড় করে দিচ্ছি।'

হাদীদের জন্য এটা কঠিন কোনো কাজ ছিল না। তিনি দু-তিনটা অমুসলিম পরিবার থেকে কিছু-কিছু করে মদ সংগ্রহ করে ছোট্র একটা মশকে ভরে শারিনার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এগুলো তোমার কাছে রাখো; আমি আগে সিপাহ্‌সালারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিই যে, আরও তথ্য বের করার জন্য রাওতাসকে মদ পান করানো আবশ্যক।

হাদীদ সিপাহ্‌সালারের অনুমতিক্রমে পরিকল্পনা ঠিক করে নিলেন, রাওতাসকে একথা জানতে দেওয়া যাবে না, এই মদ তাকে সিপাহ্‌সালারের অনুমোদনক্রমে পান করানো হচ্ছে। বরং উলটো তাকে এই বুঝ দিয়ে রাখতে হবে যে, আমরা তোমাকে লুকিয়ে মদ পান করাচ্ছি। প্রহরীদেরও বলে দেওয়া হলো, কক্ষে যদি তোমরা মদের ঘ্রাণ পাও, তা হলে এড়িয়ে যেয়ো।

* * *

পরদিন শারিনা মদের এই মশকটা চাদরের তলে লুকিয়ে রাওতাসের কাছে গেল এবং তাকে জানাল, আমি বিরাট এক ঝুঁকি বরণ করে নিয়েছি। বলেই মশকটা বের করে তার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, এই নাও; পান করো। কিন্তু সাবধান কেউ যেন দেখতে না পায়।

রাওতাস শারিনার হাত থেকে মশকটা এমনভাবে নিল, যেন পাত্রটা সে কেড়ে নিয়েছে। শারিনা উঠে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিল।

নেশাকাতর রাওতাস একটা মুহূর্তও বিলম্ব না করে গ্লাসে মদ ঢেলে গলগল করে পান করতে লাগল এবং শারিনাকে বলল, তুমিও পান করো।

শারিনা মদ পান করতে অস্বীকৃতি জানাল।

'সামনে মদ দেখে আমি নিজেকে অনেক কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করছি'– শারিনা বলল– 'কিন্তু আমি অপারগ। একটা ঢোকও পান করে যদি হাদীদের কাছে যাই কিংবা অন্য কারও পাশ দিয়ে অতিক্রম করি, তা হলে আমাকে ধরে ফেলবে। তারপর কেউ দেখবে না, আমি কে, কার কন্যা এবং কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তারা

আমাকে সিপাহসালারের কাছে নিয়ে যাবে আর তিনি আমাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

এতক্ষণে রাওতাসের কয়েক গ্লাস পান করা হয়ে গেছে। এখন তার কথাবার্তায় কম্পন দেখা যাচ্ছে। সে তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেছে।

'এবার আমাকে উঠতে হবে'— শারিনা বলল— 'এখানকার কড়াকড়ি দেখো; মদও পান করতে দেয় না। জানি না, আমাদের সম্রাট হেরাক্‌ল কবে আক্রমণ চালাবেন। মুসলমানরা যদি হেম্‌স থেকে পালিয়ে যায়, তাহলে আমি এখানেই থাকব। তুমি আমাকে কেন বলছ না, কী কারণে আক্রমণে এত দেরি করা হচ্ছে? আমি তো ভাবছি, সুযোগ পেলে আমি হেরাক্‌ল-এর কাছে চলে যাব এবং বলব, এখনই সময় আপনার আক্রমণ করার। যদি এদিক-ওদিক থেকে সহযোগী বাহিনী এসে পড়ে, তা হলে আর হেম্‌স জয় করা সম্ভব হবে না।'

'এর কয়েকটা কারণ আছে' – নেশাগ্রস্ত রাওতাস কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বলতে শুরু করল— 'বড় কারণটা হলো, সম্রাট হেরাক্‌ল অনেক সাবধান হয়ে গেছেন। তিনি যতই সাহসী সম্রাট হোন-না কেন, লড়াই তো করবে সৈনিকরা। কিন্তু বাস্তবতা হল্যো, গোটা বাহিনীর উপর মুসলমানদের আতঙ্ক ছেয়ে গেছে।'

'স্বাভাবিক'— শারিনা বলল— 'মুসলমানরা সব কটা রণাঙ্গনে আমাদের ফৌজকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে এবং পুরোটা অঞ্চল জয় করে নিয়েছে। ওদিকে ইরানিদেরও তারা একইভাবে পরাস্ত করে ভিটেছাড়া করেছে। এসব খবরও আমাদের সৈনিকদের কানে আসছে।'

'বিস্মিত ও আতঙ্কিত হওয়ার আরও একটা কারণ আছে'— রাওতাস বলল— 'বিস্ময়ের কারণ হলো, মুসলমানদের সংখ্যা আমাদের তুলনায় অনেক কম— একেবারে নগণ্য। আর আতঙ্কের কারণ হলো, এই গুটিকতক লোক এমন একটি বৃহৎ ও শক্তিধর বাহিনীকে পরাজিত করে দিল! আমাদের বাহিনীতে মুসলমানদের সম্পর্কে বিরল, বিস্ময়কর ও রহস্যময় গল্প-কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের সৈনিকরা প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে বলে থাকে, মুসলমানদের কাছে জিন আছে। আমরা ইরানের মতো শক্তিশালী বাহিনীকে পরাজিত করেছি। আমাদের সম্রাট আহত সিংহের মতো সর্বশেষ আক্রমণটা অবশ্যই করবেন। তিনি আপন ফৌজ ও কাবায়েলি সৈন্যদের সম্মুখে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সামনে পা বাড়ানোর আগে বারকয়েক ভেবে নিচ্ছেন।'

'জাযিরার কাবায়েলি সৈন্যরা তো একদম তরতাজা'— শারিনা বলল— 'এই সাহায্য সম্রাট হেরাক্‌ল-এর জন্য যথেষ্ট নয় কি?'

'যথেষ্ট বটে'— রাওতাস উত্তর দিল— 'কিন্তু সম্রাট এই কাবায়েলিদের ব্যাপারে আরও বেশি সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলছেন। এ তো আমিও বলি যে, এই কাবায়েলিদের

উপর আস্থা রাখা যায় না। সম্রাট হেরাক্‌ল তার সেনাপতিবৃন্দ ও অফিসারদের বলে দিয়েছেন, এই কাবায়েলিরা আপন ভিটেমাটি, স্ত্রী-সন্তান ও জীবন-সম্পদ রক্ষা করার খাতিরে একত্র হয়েছে। এদের মাঝে কোনো জাতীয় চেতনা নেই। না এদের নিজস্ব কোনো রাজত্ব আছে, যার জন্য লড়াই করবে। তাদের নেতারা আমাকে স্পষ্ট বলেছে, মুসলমানরা তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেবে এবং তাদের মেয়েদের তুলে নিয়ে যাবে। এরা স্রেফ নিরাপত্তা চায়। এই নিরাপত্তা যদি এরা মুসলমানদের কাছে পেয়ে যায়, তা হলে রোমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে দ্বিধা করবে না।

'এদের মাঝে আরও একটা ত্রুটি আছে। এরা ব্যক্তিগতভাবে সবাই লড়াকু ও শাহসাওয়ার হতে পারে এবং বাস্তবে এরা তেমনই। কিন্তু একটা বাহিনীর আদলে ও বিন্যাসে লড়াই করা ভিন্ন বিষয়। আগে তাদের বাহিনীর বিন্যাসে লড়াই করার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এদের যদি এভাবেই ময়দানে নিয়ে আসা হয়, তা হলে এরা বাহিনীর বিন্যাসে নয়– একটা ভিড়ের মতো লড়াই করবে। এও জানা গেছে, এরা দেখবে, রোমান বাহিনী দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে, নাকি পালিয়ে যায়। আমাদের বাহিনী যদি জমে লড়াই না করে, তা হলে সবার আগে এই কাবায়েলিরা পালিয়ে যাবে। আর অসম্ভব নয় যে, এরা মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে। আজ যদি জানতে পারে, রোমানদের তুলনায় মুসলমানরা তাদের অধিক হিতকামী, তা হলে তারা রোমানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।'

রাওতাস একসময় হেরাক্‌ল-এর নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার ছিল। এখন গোয়েন্দা বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। দুজন সঙ্গীসহ হেম্‌সের দিকে এই তথ্য সংগ্রহের জন্য আসছিল যে, মুসলমানদের নিরাপত্তাব্যবস্থা কেমন এবং দুর্গের বাইরে তাদের কোনো বাহিনী আছে কি-না। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা হওয়ার কারণে সম্রাট পর্যায়ের তথ্যও তার জানা আছে। কিন্তু সে এই মোটা কথাটা বুঝল না যে, শারিনা তার বুক থেকে টেনে-টেনে তথ্য বের করছে। এই সাফল্যে শারিনার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা কাজ করছিল বটে; কিন্তু আসল কাজটা করছিল তার পরিবেশিত লাল পানি।

রাওতাস পান করছিল আর মাতাল হচ্ছিল। যখন তার মস্তিষ্ক পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে গেল, তখন শারিনা কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল এবং হাদীদকে তার সাফল্যের কথা জানাল। হাদীদ শারিনাকে সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। শারিনা সিপাহসালারকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনাল।

আবু উবায়দা (রা.) তখনই গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং এই পরিস্থিতিকে কীভাবে কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়া যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন।

'কয়েককজন বিচক্ষণ লোক ঠিক করুন'– আবু উবায়দা (রা.) বললেন– 'তাদের ওখানে পাঠিয়ে দিন। ওখানে গিয়ে তারা নিজেদের কাবায়েলি খ্রিস্টান বলে পরিচয় দেবে এবং বলবে, আমরা কাবায়েলি বাহিনীতে অংশ নিতে এসেছি। আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই।'

সঙ্গে-সঙ্গে দশ-বারোজন মুজাহিদকে বাছাই করে প্রস্তুত করা হলো। শত্রুর অঞ্চলে ঢুকে পড়ার এবং ওখানকার লোকদের মাঝে মিশে যাওয়ার বেশ অভিজ্ঞতা তাদের আছে। এ-বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। তাদের তালিকার শীর্ষে আছেন হাদীদ। তাঁকে দায়িত্ব প্রদান করা হলো, যে-রোমান বাহিনীর সঙ্গে অমুসলিম কাবায়েলিরা গিয়ে মিলিত হয়েছে, তুমি তাদের মাঝে ঢুকে যাবে এবং রোমানদের বিরুদ্ধে তাদের বিভ্রান্ত করবে।

* * *

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) অধীন সালারদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। সেই সঙ্গে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর কাছে একজন দূত প্রেরণ করলেন যে, আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেম্‌স চলে আসুন।

'আমার সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ!'– হযরত আবু উবায়দা (রা.) সালারদের উদ্দেশে বললেন– 'আপনারা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন ধৃত রোমান সৈন্যের কাছ থেকে আমরা সম্রাট হেরাক্‌ল, তার বাহিনী ও খ্রিস্টান কাবায়েলিদের সম্পর্কে কী-কী তথ্য লাভ করেছি। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সম্রাট হেরাক্‌ল চরম এক দ্বিধার মধ্যে পড়ে আছেন। কিন্তু তার উপর নির্ভর করে আমাদের এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হওয়া চলবে না যে, আমাদের জন্য কোনো ঝুঁকি নেই। আমাদের বুঝে রাখতে হবে, যেকোনো সময় হেম্‌স অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে আর আমাদের সৈন্য এতই অল্প যে, আমরা সেই অবরোধ ভাঙতে সক্ষম হব না। আমি কাবায়েলিদের মাঝে মিশে তাদেরকে সম্রাট হেরাক্‌ল সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার জন্য কয়েকজন বিচক্ষণ মুজাহিদ পাঠিয়ে দিয়েছি। মদীনার উদ্দেশ্যে প্রেরিত দূত ইতিমধ্যে অর্ধেক পথ অতিক্রম করে থাকবে বলে আশা রাখতে পারি। আপনারা আপনাদের প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন রাখুন এবং দু'আ করুন, যেন সহযোগী বাহিনী তাড়াতাড়ি এসে পৌছয়। আর যদি সময়মতো সাহায্য না আসে, তা হলে যেন আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেন।'

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, তিনি রাতের-পর-রাত যেন নির্ঘুমই অতিবাহিত করছেন। দিনে-রাতে দুই থেকে তিনবার তিনি দুর্গের পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়াচ্ছেন এবং মদীনার পানে তাকিয়ে থাকছেন। অথচ তিনি জানেন, এত তাড়াতাড়ি সাহায্য এসে পৌছতে পারবে না।

দিন চলে যাচ্ছে।

সে-সময় হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) শামের বিজিত শহর কানসারিনে ছিলেন। হেম্‌সের দূত তাঁর কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তাকে হেম্‌সের পরিস্থিতি জানালেন। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাত নায়েব সালারের হাতে কমান্ড বুঝিয়ে দিয়ে হেম্‌সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

* * *

আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)কে সামনে দেখে মনে অসাধারণ এক প্রশান্তি অনুভব করলেন। তিনি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও কিছুটা অসহায় ভাবতে শুরু করেছিলেন। খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) পথে কোনো বিশ্রাম না করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এসে পড়েছিলেন। আবু উবায়দা (রা.) বললেন, খানিক বিশ্রাম করে শরীরটা একটু ঝরঝরা করে নিন; তারপর কথা বলব।

হেম্‌সের দিকে কত বড় একটা বিপদ ধেয়ে আসছে এবং সেই তুলনায় হেম্‌সে নিজেদের সৈন্যসংখ্যা কত কম সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)কে তা অবহিত করলেন। ইতিমধ্যে তিনি কী-কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, হযরত খালিদকে তাও সবিস্তার জানালেন।

'আমি যা চিন্তা করেছি, সেটি হলো'– আবু উবায়দা বললেন– 'আন্তাকিয়া, হামাত, হাল্‌ব ও নিকটতম অঞ্চলগুলোর সমস্ত ছাউনি থেকে অর্ধেক-অর্ধেক করে মুজাহিদ হেম্‌সে নিয়ে আসব এবং অবরুদ্ধ হয়ে লড়াই করব।'

'অবরুদ্ধ হয়ে নয়'– হযরত খালিদ ইবনে অলীদ পরামর্শ দিলেন'– 'আমরা দুর্গের বাইরে দুশমনের মোকাবেলা করব। এরা কোনো নতুন বাহিনী নয়। এদের আমরা অনেক দূর থেকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে আসছি এবং শামের শেষ সীমানা পর্যন্ত এনে ঠেকিয়েছি। আমরা এদের কৌশল ও সৈন্যদের ভালো করেই জানি। এই ময়দানেও আমরা এদের পরাজিত করব।'

সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেননি। ওখানে হেম্‌সের দু-তিনজন সালারও উপস্থিত ছিলেন। তারা সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর এই প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করলেন যে, অন্যান্য জায়গা থেকে অর্ধেক করে মুজাহিদ এখানে নিয়ে আসা হবে। তারা হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর পরামর্শের ব্যাপারেও ভিন্নমত পোষণ করলেন। কারণ দেখালেন, এমনও হতে পারে, শত্রুপক্ষ আগেই জেনে ফেলবে, আমরা হেম্‌সকে শক্ত করার জন্য অন্যান্য অঞ্চল থেকে সৈন্য এনে এখানে সমবেত করেছি। তখন তারা সেসবের কোনো একটা অঞ্চলের উপর আক্রমণ করে সেটা দখল করে নেবে। এভাবে অন্যান্য ছাউনিগুলোরও উপর হামলা চালিয়ে সফলতা অর্জন করতে পারে। সালারগণ বললেন, কোনো অবস্থাতেই অন্য কোনো নগরীর প্রতিরক্ষা দুর্বল করা যাবে না। আমাদেরকে শুধু মদীনার সাহায্য

এসে পৌঁছানোর অপেক্ষা করতে হবে। যদি তার আগেই রোমান বাহিনী এসে পড়ে, তা হলে এই অবস্থাতেই লড়ে যেতে হবে এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে, তিনি যেন আমাদের সফলতা দান করেন।

তাঁরা দীন ও ঈমানের অধিকারী মুসলমান ছিলেন। আপন ভিটে-মাটি ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে এসে আল্লাহর পথে নিজেদের ও শত্রুদের রক্ত ঝরাচ্ছিলেন। তাঁদের অন্তরে সম্পদ ও ক্ষমতার কোনো মোহ ছিল না। তাঁরা রাজত্বের জন্য লড়াই করতেন না। বিশ্বময় আল্লাহর বাণী ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

ইসলামের শুরু যুগের এই মুসলমানরা বিজয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ধরনা দিতেন, আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। কিন্তু তাঁরা একমাত্র দু'আরই উপর ভরসা রাখতেন না। কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁরা সম্যক অবগত ছিলেন। তাঁরা জানতেন, কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যতটুকু চেষ্টা করবে, আল্লাহ তোমাদের ততটুকুই দিবেন। তাঁরা অলৌকিক কিছুর অপেক্ষায় বসে থাকতেন না। নিজের জীবন ও সম্পদ কুরবান করে তাঁরা ইসলামকে জীবিত রেখেছেন। নিজেদের রক্ত ঝরিয়ে নবুওতের প্রদীপকে প্রজ্বলিত রেখেছেন। এভাবে আল্লাহর দীন ইসলাম দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)কে কানসারিন ফেরত পাঠিয়ে দিলেন যে, আপনার অনুপস্থিতিতে যেন ওখানকার প্রতিরক্ষা দুর্বল হতে না পারে। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) যখন আবু উবায়দা (রা.) থেকে বিদায় নিলেন, তখন তাঁর চেহারায় এমন একটা প্রতিক্রিয়া ছিল, যেন আপন সিপাহসালারকে এমন এক কঠিন পরিস্থিতির মাঝে একাকি ফেলে যেতে তাঁর মন সরছে না।

'ইবনে জার্‌রাহ!'– খালিদ ইবনে অলীদ হযরত আবু উবায়দা (রা.)কে উদ্দেশ করে বললেন– 'যদি আমার প্রয়োজন দেখা দেয়, তা হলে এমন দূত প্রেরণ করবেন, যে উড়ে আমার কাছে পৌঁছে যাবে। আর আমি তারও অপেক্ষা দ্রুতগতিতে এসে পৌঁছব।'

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার হয়ে আল্লাহ হাফেয বলে রওনা হয়ে গেলেন।

* * *

উভয় দূত মদীনা পৌঁছে গেছেন। সে-সময় তাঁরা উটের পিঠে সাওয়ার ছিলেন। দুটো উট দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে।

এখন তারা একা নন। মদীনার কয়েক ব্যক্তি ও বেশ কটা বালক তাদের পেছনে-পেছনে ছুটছে। এটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল যে, যারা কোনো-না-কোনো কারণে যুদ্ধে

যেতে অপারগ হন এবং পেছনে রয়ে যান, তারা কোনো দূতের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকেন। অনেকে শহরের বাইরেও চলে যান এবং যখনই কোনো দূত এসে পৌঁছান, তাদের পেছনে-পেছনে ছুটতে শুরু করেন এবং ব্যাকুলভাবে জানতে চেষ্টা করেন, দূত কী সংবাদ নিয়ে এসেছেন। দূতরাও জনতার নাড়ির স্পন্দন বুঝতেন এবং সংক্ষেপে সংবাদ শুনিয়ে দিতেন।

সে-সময় ইসলামের সৈনিকরা একই সময়ে দুটি রণাঙ্গনে যুদ্ধরত ছিলেন। উভয় শত্রুপক্ষ বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী বলে বিবেচিত ছিল। তারা ছিল সেকালের দুটি পরাশক্তি। কোনো শক্তিই তাদের মোকাবেলায় দাঁড়ানোর দুঃসাহস দেখাত না। একটি অগ্নিপুজারি ইরানি আর অপরটি রোমান।

সেই রণাঙ্গনগুলো থেকে যেকোনো সময় যেকোনো ধরনের দুঃসংবাদ আসতে পারত। সাধারণত ধারণা এটাই ছিল যে, সংবাদ খারাপই আসবে। এমন অসম লড়াইয়ে সুসংবাদের আশা করা যায় কী করে! কিন্তু অক্ষম বৃদ্ধ, নিষ্পাপ শিশু, অবলা নারী ও বিকলাঙ্গ লোকদের আন্তরিক দু'আ মুজাহিদদের সাহায্য করত।

মদীনার অলি-গলিতে হই-চই পড়ে গেল, 'দূত এসেছেন– দুজন দূত এসেছেন!'

এই হুল্লোড় আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর কানে গিয়ে ধাক্কা দিল। তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন এবং দূতদের স্বাগত জানাতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি সেদিকে ছুটে গেলেন, যেদিক থেকে দূতরা আসছিলেন। দূতদ্বয় তাঁর নিকটে এসে উট থামিয়ে ফেললেন এবং উটদুটোকে বসিয়ে ধীরে-সুস্থে অবতরণ করার পরিবর্তে উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে এলেন।

'ভালো সংবাদ নিয়ে এসেছ?' হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন এবং তাঁদের নিয়ে ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

'সংবাদ খারাপ নয় মহামান্য আমীরুল মুমিনীন!'– এক দূত হাঁটতে-হাঁটতে বললেন– 'দ্রুত সাহায্য পৌঁছে গেলে আল্লাহ চাহেন তো সংবাদ শুভ হয়ে যাবে।'

'আমীরুল মুমিনীন!'– অপর দূত বললেন– 'আমরা কোথাও থেকে পিছপা হইনি। চলুন; বসে পয়গাম শোনাব।'

ঘরে প্রবেশ করে হযরত ওমর (রা.) দূতদের বসালেন এবং তাদের জন্য পানাহারের ব্যবস্থা করতে আদেশ দিয়ে নিজে বসে বললেন, এবার বলো, তোমরা কী বার্তা নিয়ে এসেছ।

এক দূত বলতে শুরু করলেন। তিনি বিস্তারিত সংবাদ শুনিয়ে অবশেষে হেম্‌স কী রকম ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত হয়েছে, আমীরুল মুমিনীনকে তাও জানালেন। আর বললেন, আল-জাযিরার অমুসলিম কাবায়েলিরা যুদ্ধ করতে রোমানদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে।

'আল্লাহর কসম!'– আমীরুল মুমিনীন বিস্তারিত শুনে বললেন– 'আমি নিজেরই ভেতর থেকে ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে। আমি কেন আল্লাহপাকের শোকর আদায় করব না যে, তিনি আমাকে এতটুকু বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা দান করেছেন। তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমি আগেই চিন্তা করে রেখেছি।'

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) যে-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন, ইতিহাসে তার উল্লেখ যদি এক-দুজন ঐতিহাসিক করতেন, তা হলে না হয় আমরা তাদের সূত্র বর্ণনা করতাম। কিন্তু শুধু মুসলিম ঐতিহাসিকগণই নন, ইউরোপিয়ান অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও হযরত ওমর (রা.)-এর সামরিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যে, তিনি প্রতিটি রণাঙ্গনের প্রতিটি কোণ পর্যন্ত সহযোগী বাহিনী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সবচেয়ে বড় ব্যবস্থাপনাটি ছিল, তিনি বসরা ও কূফাকে এমনভাবে আবাদ করেছিলেন যে, এই অঞ্চলদুটোতে বড়-বড় কতগুলো ছাউনি স্থাপন করে রেখেছিলেন এবং কোনো অমুসলিমকে সেখানে বসতি গড়তে দেননি, যাতে শত্রুরা বুঝতে না পারে, এখানে কী আছে এবং কী হচ্ছে।

এ ছাড়া আরও সাতটা শহর ছিল, যেগুলোর প্রতিটা শহরে বিশেষ পরিস্থিতির জন্য তিনি চার হাজার করে অশ্বারোহী মুজাহিদ প্রস্তুত রেখেছিলেন। তাদের জন্য আদেশ ছিল, তোমরা প্রতিটি মুহূর্তে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রস্তুত থাকবে, যাতে যখনই কোথাও থেকে সাহায্যের আবেদন আসবে, যেন নিকটতম শহর থেকে অন্তত চার হাজার সৈনিক তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে যেতে পারে এবং একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে সেখানে পৌঁছে যেতে পারে, যেখানকার প্রয়োজন তাদের ডাকছে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) তখনই হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর কাছে বার্তাসহ একজন দূত পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন, এই বার্তাটি পাওয়ামাত্র আপনি কা'কা' ইবনে আমরকে চার হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদ দিয়ে হেম্‌স পাঠিয়ে দিন। ওখানে আবু উবায়দা শত্রুর বেষ্টনিতে আটকা পড়েছে এবং সাহায্য পৌঁছবার আগেই না জানি ওখানে কোন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়!

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) সে-সময় মাদায়েনে ছিলেন এবং যরতুশ্‌ত ধর্মের অনুসারীরা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে ইরানের কেসরাও পরাজয়বরণ করেছিলেন এবং ইরাক মুসলমানদের কব্জায় এসে পড়েছিল। কা'কা' ইবনে আমর তখন কূফায় অবস্থানরত ছিলেন।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস আমীরুল মুমিনীন-এর পত্র পেয়ে একটি মুহূর্তও বিলম্ব না করে একজন দূত কূফায় পাঠিয়ে দিলেন।

সে-সময় হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে তাঁর উপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

বর্তমানকার এই পরিস্থিতি তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার বিরাট এক পরীক্ষা। তিনি 'পিছুহটা' ও 'পরাজয়' এই শব্দদুটোর নামও শুনতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু এ তো হলো আবেগের ব্যাপার। বাস্তবতা যা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, তা হলো, তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, হেম্‌স থেকে আমাদের পা উপড়ে যাচ্ছে। তারপর না-জানি আমাদের কোন পর্যন্ত পেছনে সরে আসতে হয়। পাছে এমন যেন না হয় যে, ইরান থেকে ফৌজ বের করে ওখানে পাঠাতে বাধ্য হন আর ইরানসম্রাট আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং ইরাকের বিজিত অঞ্চলগুলোর উপর পুনরায় কব্জা প্রতিষ্ঠিত করে নেবেন।

'আমার ভাইয়েরা!'– আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) উপদেষ্টাদের বললেন– 'আল্লাহর কসম, এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের হোতা আল-জাযিরার কাবায়েলিরা। তারা অধিকাংশই খ্রিস্টান। তারা চাচ্ছে না, ইসলাম ওই অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যাক। তারা হেরাক্‌লকে উসকানি দিয়েছে এবং তাকে কমপক্ষে ত্রিশ হাজার সৈন্য দিয়ে মুসলমানদের শাম থেকে উৎখাতের চক্রান্ত এঁটেছে।

আমার কাছে খবর আছে, হেরাক্‌ল-এর মাঝে এতটা দম ছিল না যে, সে আর কোথাও আমাদের মুজাহিদদের উপর জবাবি আক্রমণ চালাবে। তার ও তার বাহিনীর কোমর ভেঙে গেছে। তার বাহিনীর বেশিরভাগ সৈন্য আমাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। অনেকে আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করেছে। যারা অক্ষত জীবিত আছে, তাদের যুদ্ধ করার চেতনা বিনষ্ট হয়ে গেছে। মিসর থেকে সে যে-কজন সৈন্য পেয়েছে, তারা তার মৃত পরিকল্পনায় কিছুটা প্রাণ সঞ্চার করে থাকবে মাত্র। আর সেই শোচনীয় সময়টাতেই এই কাবায়েলিরা তার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে এবং এত বিরাট একটা বাহিনী দিয়ে তার মধ্যকার দম্ভ-অহমিকার পশুটাকে আবার জীবিত করে তুলেছে।

'আপনারা জানেন, কাবায়েলিদের এলাকাটা যুদ্ধ থেকে নিরাপদ রয়েছে। তাদের তিনটি বসতি আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের শত্রুদের সঙ্গ দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও শত্রুরা পরাজিত হয়ে পিছপা হতে বাধ্য হয়েছিল। তখন আমরা সেই তিনটি বসতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। অবশিষ্ট সবগুলো বসতি তাদের নিরাপদ। এখন আমাদের বুদ্ধি খুঁজে বের করতে হবে, কীভাবে রোমানদের থেকে এই কাবায়েলিদের বিচ্ছিন্ন করা যায়।'

'সেই বসতিগুলোর উপর আক্রমণ চালানো হোক'– এক উপদেষ্টা বললেন– 'এখনও তারা যুদ্ধের স্বাদ উপভোগ করেনি ধ্বংসপ্রাপ্ত তিনটি বসিত ছাড়া। আমরা যদি তাদের উপর আপদ হয়ে আপতিত হই, তা হলে যে-ত্রিশ হাজার কাবায়েলি বাজিন্তিয়ায় হেরাক্‌ল-এক সাহায্যে গেছে, তারা ফিরে আসতে বাধ্য হবে।'

'আল্লাহর কসম!'– আমীরুল মুমিনীন বললেন– 'আমার চিন্তা আর আপনার চিন্তা এক হয়ে গেছে! চিন্তায় মিল থাকলে কাজে বরকত আসে। আমরা কাবায়েলিদের বসতিগুলোর উপর আক্রমণ চালালে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হবে বটে; কিন্তু হেরাক্‌ল তাদের সঙ্গ দেবে না। আর তারা যে ফিরে আসবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন আবু উবায়দা আমাদের প্রেরিত সহযোগী বাহিনী নিয়ে নিজেরা এগিয়ে গিয়ে হেরাক্‌ল-এর উপর চড়াও হবে। তারপর হেরাক্‌ল-এর জন্য এছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না যে, সে তার বাহিনীকে জাহাজে ভরে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে। আমাদেরকে একথাটিও মনে রাখতে হবে, শাম এখন আমাদের। কাজেই ওখানকার যারা এই উদ্দেশ্যে আমাদের শত্রুর কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে যে, তারা আমাদের উপর জবাবি আক্রমণ চালাবে আর এদের সামরিক সাহায্য দেবে; এ তো বিদ্রোহ। এই লোকগুলো বিদ্রোহী। এরা গাদ্দার– বিশ্বাসঘাতক। এদের শায়েস্তা করা আমাদের অধিকারও, কর্তব্যও।'

* * *

কোন সালার কোথায় আছেন, কার কাছে কতসংখ্যক সৈন্য আছে এবং তাকে এক রণাঙ্গন থেকে আরেক রণাঙ্গনে পাঠানো সম্ভব কি-না সব রেকর্ড আমীরুল মুমিনীন-এর কাছে আছে। বালাযুরি তো এতটুকু পর্যন্ত লিখেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) এ-জাতীয় বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ও সংখ্যা-শুমার আপন মস্তিষ্কের বালামে সংরক্ষিত রাখতেন এবং যখনই সে-বিষয়ে কথা বলা শুরু করতেন, তখন মনে হতো, সেই রণাঙ্গনটি তাঁর চোখের সম্মুখে রয়েছে এবং তিনি চাক্ষুষ দেখে-দেখে অবস্থার বিবরণ প্রদান করছেন। এখান থেকেই কিছু বর্ণনা জন্ম নিয়েছে, যেগুলোর কোনোটি বাস্তব, কোনোটা মনগড়া।

সেসব বর্ণনা দ্বারা এই বাস্তবতা প্রমাণিত হচ্ছে, হযরত ওমর (রা.)-এর দুশমনের জয়-পরাজয়ের প্রতি এতটা নজর থাকত যে, শুধু মানসিকভাবেই নয়– শারীরিকভাবেও তিনি নিজেকে রণাঙ্গনে উপস্থিত আছেন বলে কল্পনা করতেন। অপর এক ঐতিহাসিক তাবারি লিখেছেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) যখন সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর বার্তা অনুপাতে নানা আদেশ-নিষেধ জারি করছিলেন এবং এটা-ওটা পদক্ষেপ গ্রহণ করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল, যেন তিনি মদীনায় আপন ঘরে উপবিষ্ট নেই– তিনি রণাঙ্গনগুলোর কাছাকাছি এমন কোনো এক উঁচুতে বসে আছেন, যেখান থেকে সমস্ত রণাঙ্গন দেখা যাচ্ছে আর তিনি সেই অনুপাতে নির্দেশনা জারি করছেন।

হযরত ওমর (রা.) ইরাক ও ইরানের রণাঙ্গনের সিপাহসালার সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর নামে পত্র লিখলেন। তাতে তিনি এই আদেশ প্রদান করেছেন যে, সালার সুহাইল ইবনে আদী ও আব্দুল্লাহ ইবনে গাস্‌সানকে চার হাজার করে

আরোহী সৈন্য দিয়ে আল-জাযিরায় সেই কাবায়েলি অঞ্চলগুলোতে পাঠিয়ে দিন, যারা হেরাক্‌ল-এর সাহায্যে ত্রিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেছে। সুহাইল ইবনে আদীকে রাক্কা আর আব্দুল্লাহ ইবনে গাস্‌সানকে নাঈন অঞ্চলে প্রেরণ করুন। উভয় সালার কাবায়েলিদের বসতিগুলোর উপর আক্রমণ চালাবে। যদি তারা মোকাবেলা করে, তা হলে লড়াই করবে। যদি অস্ত্রসমর্পণ করে, তা হলে তাদের যুদ্ধবন্দি বানাবে। যদি তারা মোকাবেলায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করে, তা হলে বসতিগুলোকে ধ্বংস করে দেবে। এই অভিযান সফল করে সুহাইল ইবনে আদী হাররান আর আব্দুল্লাহ ইবনে গাস্‌সান রুহা চলে যাবে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) পত্রে এই আদেশটিও লেখালেন যে, সালার অলীদ ইবনে উত্‌বা আল-জাযিরার সেই অমুসলিম আরবদের অঞ্চলে গিয়ে হামলা করুক, যেখানে দুটি গোত্র বনু রবি'আ ও বনু তানুখ বাস করে। তিনি অভিমত ব্যক্ত করলেন, আমার জানামতে এই দুটি গোত্র অন্যান্য গোত্রগুলোকেও হেরাক্‌ল-এর সহযোগিতায় প্রস্তুত করছে এবং হেম্‌স আক্রমণে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কাজেই এদেরও দমন করা একান্ত জরুরি। কারণ, এরা নিজেদের বড় বেশি শক্তিশালী মনে করে।

হযরত ওমর (রা.) আদেশনামায় লিখেছেন, সালার ইয়াজ ইবনে গানাম এই বাহিনীর সিপাহসালার হবে এবং সব কজন সালার তার আদেশ অনুযায়ী কাজ করবে।

এই বার্তা নিয়ে দূত রওনা হয়ে গেলেন।

* * *

সিপাহসালার সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর কাছে এই বার্তাটি পৌঁছামাত্র তিনি তার বাস্তবায়ন শুরু করে দিলেন। হযরত ওমর (রা.) যে-কজন সালারকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন, আবু উবায়দা (রা.) তাঁদের সবাইকে কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়ে আদেশ জারি করলেন, আপনারা যার-যার অঞ্চলে পৌঁছে যান। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) সবাইকে ঘটনার ইতিবৃত্ত ও এই পরিকল্পনার পেক্ষাপট বুঝিয়ে দিলেন।

কিন্তু এতসব ব্যবস্থা করেও আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) স্থির হতে পারলেন না।

'আমার ভাইয়েরা!'– আমীরুল মুমিনীন তাঁর উপদেষ্টাদের বললেন– 'আমীনুল উম্মত'কে এই সঙ্গিন মুহূর্তে আমি নিঃসঙ্গ থাকতে দেব না। আরও কিছু সৈন্য নিয়ে আমি নিজে হেম্‌স যাব।'

'আমীনুল উম্মত' হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর উপাধি। আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁকে এই উপাধি প্রদান করেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) মদীনা ও মদীনার আশপাশের অঞ্চলগুলো থেকে কিছু মুজাহিদ সংগ্রহ করে তাদের নিয়ে একদিন হেম্‌সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গে... সে-সময় আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে কতজন সৈন্য ছিল কিংবা কতজন পদাতি... আর কতজন আরোহী মুজাহিদ ছিল কোনো ঐতিহাসিকই এই তথ্য লিখেননি। সবাই শুধু এটুকুই লিখেছেন যে, একটি ফৌজ গঠন করে আমীরুল মুমিনীন হেম্‌সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। ইতিহাস দ্বারা এও জানা যাচ্ছে, আমীরুল মুমিনীন দামেশ্‌কের পথ ধরে রওনা হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি সাথে করে একটি বাহিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই চলার গতি অতটা দ্রুত ছিল না, যতটা একজন দূতের হতে পারে। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর মনে সাহস সঞ্চার করার জন্য তিনি আগে একজন দূত হেম্‌সের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাকে বার্তা দিয়েছিলেন, আমীরুল মুমিনীন কিছু সৈন্য নিয়ে হেম্‌স আসছেন। দূতকে বিশেষভাবে বলে দেওয়া হলো, তুমি যত তাড়াতাড়ি পার গন্তব্যে পৌঁছে যাও।

ইতিহাস দ্বারা আরও একটি তথ্য জানা যাচ্ছে, সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর বার্তাটি যখন আমীরুল মুমিনীনের হস্তগত হয়েছিল এবং সংবাদ পেয়ে তিনি বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন, সে-সময় থেকে তিনি বারবার পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত আওড়াতে থাকেন এবং যে-কাউকে এই আয়াতটি পড়ে শোনাতে থাকেন– 'যারা আমার মাঝে জিহাদ করল, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথগুলো দেখিয়ে দেব। আর আল্লাহ সৎকর্মশীল বান্দাদের সঙ্গে থাকেন।'

আমীরুল মুমিনীন একথাটিও বারবার বলতে থাকেন যে, তোমরা নেক আমলের আঁচল পরিত্যাগ করো না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

* * *

জিহাদের এই কাহিনীকে এবার আমরা সেই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে হেম্‌স থেকে সামান্য দূরে পার্বত্য এলাকায় হেরাক্‌ল-এর বাহিনী ও আল-জাযিরার খ্রিস্টান কাবায়েলি সেনারা হেম্‌স অবরোধ করে বসে ছিল এবং হেরাক্‌ল-এর আদেশের অপেক্ষা করছিল।

কিছুদিন যাবত কাবায়েলি সৈন্যদের মাঝে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল যে, এই রোমানদের কোনো ভরসা নেই; এদের কোনোমতেই বিশ্বাস করা যায় না। হেরাক্‌ল তার পরাজয়কে বিজয়ে পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন। তিনি যদি জয়যুক্ত হয়ে যান, তা হলে করের বোঝা চাপিয়ে আবার তিনি প্রজাদের চুষতে শুরু করবেন। অপর দিকে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মুসলমানরা আল-জাযিরার এই বসতিগুলোকে গুড়িয়ে দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই গুজব কোথা থেকে এবং কীভাবে প্রচার পেয়েছিল, ইতিহাসে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কয়েকটা গোত্র এই গুজবকে সত্য বলে বিশ্বাস করে

নিয়েছিল। অবশিষ্টরা এখনও সংশয়ের দোলাচলে দোলায়মান। তাদের মাঝে যাদের সামান্য বিবেক ও চেতনা ছিল, তারা বলল, এখনও সময় আছে; আমরা ফিরে যাই। হেরাক্‌ল-এর বাহিনী যুদ্ধ করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এই বাহিনী লড়াই করার পরিবর্তে পালাবার পথ খুঁজবে। আর হেরাক্‌ল-এর বাহিনী যদি পিছপা হয়েই যায়, তা হলে মুসলমানরা আমাদের বসতিগুলোকে আস্ত রাখবে না।

এই সংশয়-সন্দেহগুলো কাবায়েলি সৈন্যদের মাঝে সেই দশ-বারোজন মুজাহিদ প্রচার করে ফিরছিলেন, যাদের হযরত আবু উবায়দা (রা.) এ-জাতীয় নাশকতা ও চরবৃত্তির জন্য ওখানে প্রেরণ করেছিলেন। তারা সব কজন ওখানে একত্রে পৌঁছাননি। একজন-একজন, দুজন-দুজন করে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। গিয়ে তারা পরিচয় দিয়েছিলেন, আমরা খ্রিস্টান কবিলার লোক। আসল কাবায়েলিরা যখন তাদের জিজ্ঞেস করত, তোমরা খ্রিস্টানদের কোন গোত্রের লোক, তারা পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিতেন, তোমার গোত্র কোনটা তা-ই আগে বলো। তারা তাদের গোত্রের নাম বললে তখন মুজাহিদরা দূরের কোনো একটা অখ্যাত গোত্রের নাম বলতেন।

এই মিশনে মুজাহিদরা বেশ সাফল্য অর্জন করছিলেন। তারা খ্রিস্টান গোত্রগুলোর মাঝে হতাশা ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছিলেন। তার বিরোধিতা ও প্রতিবাদ তেমন একটা হতো না। ইতিহাসের ভাষ্যমতে এর তাৎপর্য হলো, ওই গোত্রগুলোর অধিকাংশ সদস্য তখনও সংশয়াপন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক মুজাহিদদের জন্য সুসংবাদ ঘোষণা করেছেন, যারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের জন্য পথ খুলে দেন এবং তিনি তাদের সঙ্গী হয়ে যান। হেম্‌স নগরীর অদূরে পর্বতময় এলাকায় মহান আল্লাহর এই ঘোষণা বাস্তবরূপে প্রতিভাত হলো। এর সূচনা হয়েছিল বাজিন্তিয়া থেকে।

এই বইয়ের বিগত অধ্যায়ে আপনারা পড়ে এসেছেন, আল-জাযিরার বড়-বড় কতগুলো গোত্রের পঁচিশ-ত্রিশজন নেতা বাজিন্তিয়ায় রোমসম্রাট হেরাক্‌ল-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। গিয়েছিল তারা হেরাক্‌লকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব নিয়ে। সে-সময় তাদের সঙ্গে পঁচিশজন অতিশয় রূপসী যুবতী মেয়ে ছিল, যাদের মুখাবয়ব থেকে নিষ্পাপতা ঝরছিল। তাদের কয়েজন এমন ছিল যে, বয়স তাদের এখনো কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেনি। এই মেয়েগুলোকে তারা হেরাক্‌ল-এর দরবারে উপস্থাপন করেছিল এবং বলেছিল, এরা আপনাকে সাহায্য করতে এসেছে।

হেরাক্‌ল সেই মেয়েগুলোকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা কি এই মেয়েগুলো আমার জন্য উপহার এনেছ? এক প্রবীণ খ্রিস্টান নেতা উত্তর দিয়েছিল, আমরা আপনার বাহু শক্ত করতে এসেছি। আর এই মেয়েগুলোকে আপনার জন্য উপহার আনিনি। এরা আমাদের ঝি-কন্যা। আপনার কাছে আমরা এদের এটা দেখাতে

এনেছি যে, এরা আমাদের সম্ভ্রম, যারা কিনা এই চলমান যুদ্ধে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। যুদ্ধের কারণে এই নিষ্পাপ তরুণী-যুবতী মেয়েগুলোর জীবন ও সম্ভ্রম অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। আমরা এদের ও এদের মতো হাজার-হাজার কন্যার ইজ্জত রক্ষায় আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। আপনি আমাদের সাহায্য করুন; আমরা আপনাকে সাহায্য দেব। এই যুদ্ধে হাজার-হাজার লড়াকু যুবক আপনাকে আমরা নিবেদন করব।

সেই সাক্ষাতেই হেরাক্ল উক্ত কাবায়েলি নেতাদের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেছিলেন এবং তাদের বলে দিয়েছিলেন, আপনারা ফিরে গিয়ে যত সম্ভব সৈন্য নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে এসে পড়ুন। হেরাক্ল তাদের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, আপনারা যদি আমাকে বিজয় ছিনিয়ে এনে দিতে পারেন, তা হলে আমি আপনাদের সবগুলো গোত্রকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেব এবং আপনাদের উপর থেকে সব ধরনের করের বোঝা প্রত্যাহার করে নেব।

ফিরে যাওয়ার সময় হলে কাবায়েলি নেতারা বললেন, আমাদের মেয়েগুলোকে বের করে দিন; আমরা ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কিন্তু হেরাক্ল-এর এক উপদেষ্টা পরামর্শ দিল, সফর অনেক দীর্ঘ ও ঝুঁকিপূর্ণ। এমন হতে পারে, পথে আপনারা মুসলমানদের হাতে পড়ে যাবেন আর তারা আপনাদের হত্যা করে মেয়েগুলোকে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং ভালো হবে, এদের আপনারা এখানেই রেখে যান; এখানেই এরা নিরাপদ থাকবে।

হেরাক্ল-এর প্রতি কাবায়েলি নেতাদের আস্থা ছিল। তারা প্রস্তাবটা মেনে নিল এবং মেয়েগুলোকে ওখানে রেখে এল।

দুজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, উপরে-উপরে এই প্রস্তাব একজন উপদেষ্টা দিয়েছিল বটে; কিন্তু আসলে এটা ছিল সম্রাট হেরাক্ল-এর মনের ঐকান্তিক বাসনা যে, এমন রূপসী তরুণী মেয়েগুলোকে হাতছাড়া হতে দেওয়া যায় না। উপদেষ্টাকে দিয়ে হেরাক্লই প্রস্তাবটা উপস্থাপন করিয়েছিলেন। হেরাক্ল রাজা ছিলেন। বাজিন্তিয়ায় তার মহল ছিল। তিনি ভাবলেন, এমন চিত্তহারী রূপবতী মেয়েগুলো কাবায়েলিদের তাঁবু ও ঝুপড়িতে ভালো মানাবে না। এরা তো রাজপ্রাসাদে শোভা পাওয়ার মতো জিনিস।

নেতারা চলে গেল। দিনকতক পর যখন আবার এল, তখন তাদের সঙ্গে অন্তত ত্রিশ হাজার যোদ্ধা যুবকের এক বিশাল বাহিনী, যাদের কমপক্ষে অর্ধেকেই অশ্বারোহী।

হেরাক্ল বাইরে এসে বাহিনীটা দেখলেন। খুশিতে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই আনন্দ-দীপ্তিতে অহমিকার রং পরিস্ফুট ছিল। মনে-মনে স্থির করে নিলেন, এই বাহিনী দিয়ে যুদ্ধ করাতে হবে। বোধহয় তার জানা ছিল, হেম্‌সে মুসলমানদের

সংখ্যা চার হাজারের বেশি নেই। আর এটিই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগরী এবং দূরত্বের দিক থেকেও কাছাকাছি। এই বাহিনীটা দেখামাত্র তিনি হেম্‌স নগরী অবরোধ করার এবং আক্রমণ চালিয়ে তাকে পদানত করার পরিকল্পনা ঠিক করে নিলেন।

অল্প কদিন পর মিশর থেকে চার হাজার অশ্বারোহী বাহিনীর একটা সহযোগী সেনাদল পৌঁছে গেল। হেরাক্‌ল এই সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তার কমান্ডার সম্রাট হেরাক্‌ল-এর পুত্র কুস্তুন্তিন।

হেরাক্‌ল কাবায়েলি বাহিনীকেও তার হাতে তুলে দিলেন। এভাবে কুস্তুন্তিন নিজের বাহিনী ছাড়া অতিরিক্ত কাবায়েলি বাহিনীটারও কমান্ডার হয়ে গেল।

হেরাক্‌ল তার পুত্রকে প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশনা প্রদান করে এবং হেম্‌স আক্রমণের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে সেই স্থানটাতে পাঠিয়ে দিলেন, যার আলোচনা আপনারা ইতিমধ্যে পাঠ করেছেন। এই পার্বত্য অঞ্চলে দূর-দূরান্ত থেকে হেম্‌স নগরী অবরোধ করে ফেলা হলো। এবার হেরাক্‌ল-এর আদেশ অনুসারে চারদিক থেকে নগরী অভিমুখে অগ্রযাত্রা ও আক্রমণ-অভিযানের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কুস্তুন্তিন সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সম্রাটের আদেশের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

* * *

বাজিন্তিয়ায় থাকাকালে কুস্তুন্তিন কাবায়েলি নেতাদের নিয়ে আসা মেয়েগুলোকে দেখেছিল। হেরাক্‌ল এই বৃদ্ধ বয়সেও একজন নারীপাগল পুরুষ। তা তার ছেলে তো এখনও টগবগে যুবক। সে ওই মেয়েগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, এরা কারা এবং কোথা থেকে কীভাবে এসেছে? তাকে জানানো হয়েছিল, এরা কাবায়েলি মেয়ে এবং তাকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শোনানো হয়েছিল। তার দিনচারেক পরই তাকে অভিযানে পাঠানো হয়েছিল। হেম্‌সের পার্বত্য এলাকায় বেশ কদিন অবস্থান করার পর কুস্তুন্তিন মনে-মনে বিরক্ত হয়ে উঠল। তার এছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না যে, সে মাঝে-মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে বাহিনীর মাঝে ঢুকে পড়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করে আসত। বাহিনী কয়েক মাইল অঞ্চলের বিশাল এরিয়া নিয়ে অবস্থান করছিল। এখনও কোনো সামরিক তৎপরতা শুরু হয়নি। কুস্তুন্তিন একদিন সম্রাট হেরাক্‌ল থেকে আদেশ-নির্দেশনা আনতে কিংবা বিনোদনের উদ্দেশ্যে বাজিন্তিয়া চলে গেল।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক, হেরাক্‌ল-এর আরও একটা পুত্র ছিল। তার একাধিক স্ত্রী ছিল এবং প্রত্যেকের সংসারে সন্তানাদি ছিল। কিন্তু এই ছেলেটা অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রম ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তার নাম ইউকেলিস। বয়স সবে ষোলো কি সতেরো। কিন্তু হেরাক্‌ল কুস্তুন্তিনকে অন্য সকলের চেয়ে বেশি স্নেহ করতেন। কুস্তুন্তিন সমরবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা ছাড়াও রাষ্ট্রপরিচালনায়ও

অভিজ্ঞ। রাষ্ট্রের জটিল-কঠিন সমস্যার সুষ্ঠু ও বাস্তবসম্মত সমাধান দেওয়ার মতো মাথা তার ছিল। ফলে হেরাক্‌ল তাকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত স্থির করেছিলেন।

ইউকেলিস হেরাক্‌ল-এর আরেক স্ত্রীর সন্তান। তার মা অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক নারী ছিল। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তার মাথা খুব কাজ করত। তার মনে অনেক বড় দুঃখ ছিল, হেরাক্‌ল কুস্তুন্তিনকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন। ইউকেলিসের মায়ের ঐকান্তিক কামনা ছিল, তার পুত্রকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হোক। ইতিহাসে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, ইউকেলিস নিজেও স্থলাভিষিক্ত হতে আগ্রহী ছিল কি-না। কিন্তু তার মায়ের চিন্তা ছিল অন্যরকম।

ইউকেলিসের একটা শারীরিক ত্রুটি ছিল, যা কিনা বড় ধরনের একটা অক্ষমতা বলে বিবেচিত ছিল। তার বাম বাহুটা জন্মগতভাবেই বেকার ছিল এবং একদম শুকনা ছিল। হেরাক্‌ল তার মাকে এই অজুহাতই ব্যক্ত করেছিলেন যে, একজন আধখানা মানুষকে তিনি তার এত বড় সাম্রাজ্যের রাজত্বের স্থলাভিষিক্ত বানাতে পারেন না। কিন্তু ইউকেলিসের মা এই যুক্তি মানতে নারাজ ছিল।

ইউকেলিসের একটি কৃতিত্ব ছিল, সে শুধু ডান বাহু দ্বারাই তরবারিচালনা ও শরনিক্ষেপ করত এবং একটা নিশানাও তার ব্যর্থ হতো না। সোজা কথায় বলা চলে, ছেলেটা উভয় বাহুর অধিকারী একজন সুদক্ষ মানুষেরই মতো তরবারিচালনা ও বর্শাবাজি করতে সক্ষম ছিল। অনুরূপ অশ্বারোহণেও সে একজন অভিজ্ঞ শাহসাওয়ার হিসেবে গড়ে উঠেছিল। শুধু ডান হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখত। এই যোগ্যতায় বেশ কবার সে পরাকাষ্ঠাও দেখিয়েছিল।

শুধু তিরন্দাজিই একটি যোগ্যতা ছিল, যেটি তার দ্বারা হতো না। কারণ, একাজে উভয় বাহুরই প্রয়োজন পড়ে। এক বাহুতে তিরন্দাজি করা যায় না। আকার-গঠন ও দৈহিক আকর্ষণে ইউকেলিস কুস্তুন্তিনের চেয়ে অধিক মনকাড়া ছিল। পিতাকে বেশ কবারই বলেছিল, আমাকে রণাঙ্গনে পাঠান। কিন্তু হেরাক্‌ল এই ঝুঁকি বরণ করে নিতে প্রস্তুত হলেন না। রোমানদের ভাষায় সে যে-নামে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল, তার অর্থ হলো 'একবাহু রাজকুমার'।

* * *

কুস্তুন্তিন রণাঙ্গন থেকে বাজিন্তিয়া যাচ্ছিল। নগরীর কাছঘেঁষে একটা নদী প্রবহমান ছিল, যেটা কতগুলো চটানের মধ্য দিয়ে ঘুরে-ফিরে, এঁকে-বেঁকে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। নদীর কূলে-কূলে এত ঘন ঝোপ-জঙ্গল যে, দূর থেকে তার ফাঁক গলে কিছুই দেখা যায় না। জায়গাটা বেশ সুন্দর ও মনোরম।

এ-জায়গাটারই কোলঘেঁষে কুস্তুন্তিনের পথ অতিক্রম করতে হবে। এখন সে আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। হঠাৎ এমন এক অট্টহাসি ও কিছু শোর তার কানে এসে ঢুকল, যেন কয়েকটা কিশোরী-তরুণী নদীতে গোসল করছে আর খেলা করছে।

কুস্তুন্তিন ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল। ইতিমধ্যে এক মেয়ে দৌড়ে তার সম্মুখে চলে এল। তার পেছনে আরও একটা মেয়ে দৌড়াচ্ছিল।

এরা সেই বিশ-পঁচিশ মেয়ে, কাবায়েলি নেতারা যাদের সঙ্গে করে এনেছিল। আজ তারা সব কজন নদীতে গোসল করতে ও খেলতে এসেছে। তাদেরই দুটা মেয়ে একজন অপরজনের পেছনে দৌড়াতে ও খেলা করতে-করতে চটানের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং এখানে এসে কুস্তুন্তিনের সামনে পড়েছে। পেছনের মেয়েটার বয়স ষোলো-সতেরো বছর। অপরটার বারো-তেরো। কুস্তুন্তিনের চোখদুটো বড় মেয়েটার উপর আটকে গেল। একে তো অতিশয় রূপসী, তার উপর এখন গোসল থেকে উঠে আসা ভেজা পোশাকে অর্ধনগ্না। কুস্তুন্তিন রাজার ছেলে– রাজকুমার ও ভাবী সম্রাট। এই রাজা-বাদশারা প্রজাদের কন্যাদের আপন মালিকানা মনে করতেন।

কুস্তুন্তিন তার ঘোড়া বড় মেয়েটার দিকে হাঁকিয়ে নিল এবং তার কাছে চলে গেল। ছোট মেয়েটা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে শঙ্কিত চোখে কুস্তুন্তিনকে দেখতে লাগল। ভয়ে বড় মেয়েটার মুখ কালি হয়ে গেল এবং উলটোপায়ে ধীরে-ধীরে পেছনের দিকে সরে যেতে লাগল। কুস্তুন্তিন ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে গেল এবং মেয়েটার পানে এগুতে লাগল।

কুস্তুন্তিন মেয়েটাকে মমতার সঙ্গে ডাকছিল। কিন্তু ভয়-বিহ্বল মেয়ে পা-পা করে পেছনের দিকে সরতে থাকল। এবার কুস্তুন্তিন মেয়েটার একটা হাত ধরে তাকে নিজের দিকে টানতে শুরু করল। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে তাকে ঝাপটে ধরতে উভয় বাহু সামনের দিকে এগিয়ে দিল। কিন্তু মেয়েটা ঝট করে পেছনে সরে গেল। কুস্তুন্তিন তাকে বাহুবন্ধনে আটকাতে ব্যর্থ হলো।

এবার কুস্তুন্তিন ক্ষিপ্ত হয়ে দ্রুতপায়ে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটা মোড় ঘুরিয়ে পালাতে উদ্যত হলো। কিন্তু কী একটা শক্ত বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল এবং উঠে না দাঁড়িয়েই বুকটান করে-করে সরতে লাগল। তার ও কুস্তুন্তিনের মধ্যখানে তিন-চার পা দূরত্ব ছিল। এমন সময় অকস্মাৎ কোথা থেকে যেন একটা ঘোড়া ছুটে এসে দুজনের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে গেল।

কুস্তুন্তিন মাথা তুলে আরোহীর মুখের দিকে তাকাল। লোকটা তারই ছোট ভাই ইউকেলিস। কুস্তুন্তিনের মাথাটা আগুনের মতো গরম হয়ে গেল এবং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তাকে পথ ছেড়ে চলে যেতে বলল।

ইউকেলিস একলাফে ঘোড়া থেকে নেমে এল। পাশে দিয়ে সে কোথাও যাচ্ছিল এবং এখানকার দৃশ্যটা দেখে ঘোড়ার গতি বদল করে এখানে চলে এল। হতে পারে, সে মেয়েগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিল এবং তারও মনোবাঞ্ছা আপন

ভাই কুস্তুন্তিনেরই অনুরূপ ছিল। কিন্তু এখন সে এই মেয়েটার রক্ষাকারী বনে গেল, যার উপর কুস্তুন্তিন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছিল।

কুস্তুন্তিন খাপ থেকে তরবারিটা বের করে নিল। ইউকেলিসও নিরস্ত্র থাকল না। সেও তরবারি হাতে নিয়ে কুস্তুন্তিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। দুই ভাই– দুই রাজপুত্র সশস্ত্র হয়ে লাল-লাল চোখে একজন অপরজনের প্রতি তাকিয়ে থাকল এবং পরস্পর পরস্পরের উপর আক্রমণ করার ও আক্রমণ ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

'আমার সম্মুখ থেকে সরে যাও ইউকেলিস!'– কুস্তুন্তিন চ্যালেঞ্জের সুরে বলল– 'একটা বাহু তোমার আগে থেকেই নেই। এবার আমি তোমাকে আরেকটা থেকেও বঞ্চিত করে দেব।'

'তা হলে প্রথম আক্রমণটা তুমি করো'– ইউকেলিস বলল– 'তা হলে তোমাকে এই বলে আক্ষেপ করতে হবে না, আমি আক্রমণ করার সুযোগ পাইনি। এই মেয়েগুলো আমাদের অতিথি। এদের কোনো একটা মেয়ের প্রতি আমি তোমাকে অসৎ উদ্দেশ্যে তাকাতেও দেব না।

যেরূপ হঠাৎ ইউকেলিসের ঘোড়া কুস্তুন্তিন ও মেয়েটার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, অনুরূপ আরেকটা ঘোড়া আচমকা কুস্তুন্তিন ও ইউকেলিসের মধ্যখানে এসে থেমে গেল এবং তার আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল। লোকটি এক-এক করে দুজনের পানে তাকাল। এই লোকটি হেরাক্ল-এর রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার। কুস্তুন্তিনের সম্মুখে তার মর্যাদা একজন কর্মচারীর মতো। কুস্তুন্তিন তাকে আদেশ করল, আমার সামনে থেকে সরে যাও।

'আমি রাজপরিবারের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য'– কমান্ডার বলল– 'রাজপরিবারের প্রতিজন লোকের নিরাপত্তা বিধান করা আমার কর্তব্য। একটা মেয়ের খাতিরে দুজন রাজপুত্র একজন অপরের রক্ত ঝরাবে আর আমি চেয়ে-চেয়ে দেখব এ হতে পারে না। আপনি আগে আমাকে হত্যা করুন। তারপর এক ভাই আরেক ভাইয়ের রক্ত ঝরান।'

কমান্ডারের ক্রিয়াশীল বক্তব্যে কুস্তুন্তিন দমে গেল। সে হাতের কোষমুক্ত উদ্যত তরবারিটা খাপে ঢুকিয়ে নিল। ইউকেলিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এদিক-ওদিক তাকাল। মেয়েটা দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোথাও নেই। শুধু তা-ই নয়– অন্য সবগুলো মেয়েই ওখান থেকে পালিয়ে গেছে। এই কমান্ডার মেয়েগুলোর সঙ্গে এসেছিল। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন রক্ষীসেনা ছিল, যারা মেয়েগুলোর প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। তাদের কমান্ডার ঘটনাচক্রে এদিকে এসে পড়েছিল।

কুস্তুন্তিন মাথায় প্রচণ্ড রাগ ও ক্ষোভ নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং রক্তরাঙা চোখদুটো পাকিয়ে ইউকেলিসের পানে একনজর তাকিয়ে ওখান থেকে চলে গেল।

* * *

ইউকেলিস প্রাসাদে ফিরে আসামাত্র হেরাক্ল তাকে দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং এই বলে শাসালেন যে, তুমি তোমার বড় ভাইকে অপমান করেছ। উত্তরে ইউকেলিস কোনো কথা না বলে নীরব থাকল এবং ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ন মনে দরবার থেকে বেরিয়ে এল। তার জানা ছিল, কুস্তুন্তিন হেরাক্ল-এর পরম আদরের ছেলে। তার কোনো অপরাধ তিনি শুনবেন না, তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তিনি আমলে নেবেন না এবং সে যা বলবে, তা-ই তিনি বিনা বিচারে সঠিক বলে মেনে নেবেন।

ইউকেলিস বুদ্ধিমান ও কুশলী যুবক। পিতার বকুনি খেয়ে এবার সে কৌশল আঁটতে শুরু করল। কাবায়েলি মেয়েগুলো প্রাসাদের যে-অংশে থাকত, সেখানে চলে গেল। কুস্তুন্তিন যে-মেয়েটার সঙ্গে অসদাচরণ করেছে, তাকে খুঁজে বের করল। মেয়েটা তাকে সাধুবাদ জানাল, আপনি আমার ইজ্জত রক্ষা করেছেন।

ইউকেলিস তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার গোত্র কোনটা এবং পিতার নাম কী? মেয়েটা একটা গোত্রের নাম বলল এবং পিতার নাম জানাল। তথ্য নিয়ে ইউকেলিস সেখান থেকে ফিরে এল।

পরদিন রাত পোহানোর পর কালবিলম্ব না করে ইউকেলিস ঘোড়ায় চড়ে বাজিন্তিয় থেকে রওনা হলো। দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সেই স্থানটাতে এসে পৌঁছল, যেখানে কাবায়েলি বাহিনী অবস্থানরত ছিল। ইউকেলিস মেয়েটার গোত্রের নাম উল্লেখ করে খুঁজে ফিরতে শুরু করল, এই গোত্রের লোকেরা কোথায় আছে? তাকে বলা হলো, এদের পেতে হলে আপনাকে গোটা বাহিনীতে খুঁজে বেড়াতে হবে। এ ছাড়া সহজে বিশেষ কোনো গোত্রের সন্ধান বের করা সম্ভব নয়।

ইউকেলিস মেয়েটার পিতাকে খুঁজে বের করল। লোকটি তার গোত্রে অধিপতি। ইউকেলিস তাকে ঘটনার ইতিবৃত্ত শুনিয়ে বলল, আপনাদের জন্য ভালো হবে, আপনাদের মেয়েগুলোকে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে আনুন; ওখানে তাদের সম্ভ্রম নিরাপদ নয়। ইউকেলিস এমনও বলল যে, আপনাদের মেয়েগুলোর ব্যাপারে স্বয়ং সম্রাট হেরাক্ল-এর মতিগতিও স্বচ্ছ নয়। এসব কথা বলে ইউকেলিস সেখান থেকে ফিলে এল।

মেয়েটার পিতা খোদ গোত্রাধিপতি ছিলেন। হেরাক্ল-এর কাছে তিনি এই ফরিয়াদ নিয়ে এসেছিলেন যে, এই নিষ্পাপ মেয়েগুলোর ইজ্জতের নিরাপত্তা দরকার। কিন্তু রাজমহলেই তাদের ইজ্জতের উপর আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। সে তার গোত্রের লোকদের সমবেত করে ঘটনাটা শোনাল। শুনে সবাই আগুনের মতো জ্বলে উঠল। সবাই বলতে শুরু করল, চলুন, আমরা সম্রাট হেরাক্ল-এর কাছে যাই এবং তাকে বলি, আমাদের মেয়েগুলোকে দিয়ে দিন; আমরা তাদের এখান থেকে নিয়ে যাব।

এই সংবাদ সবগুলো গোত্রের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। সব কটা মেয়ের পিতা ও ভাইয়েরা এখানে বাহিনীতে উপস্থিত ছিল, যারা হেরাক্‌ল-এর পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তারা সবাই ক্ষোভে ও প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। তারা হেরাক্‌ল-এর কাছে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু কিছুলোক পরামর্শ দিল, আমাদের কমান্ডার কুস্তুন্তিন ফিরে আসুন; আগে আমরা বিষয়টা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলব।

সমগ্র কাবায়েলি বাহিনীতে অস্থিরতা তৈরি হয়ে গেল।

দু-তিন দিন পর কুস্তুন্তিন ফিরে এলে সবগুলো গোত্রের নেতারা তাকে ঘিরে ধরল এবং বলল, আমাদের মেয়েগুলোর সঙ্গে এরূপ আচরণ শুরু হয়ে গেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বাজিন্তিয়া থেকে তাদের সরিয়ে আনব।

কুস্তুন্তিন তাদের মিথ্যা তথ্য দিলেন, তোমরা যা-কিছু শুনেছ সবই ভুয়া ও অসত্য। সে তাদের সংযত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

তাদের মাঝে একজন প্রবীণ নেতা ছিলেন, যিনি এই বয়সে যুদ্ধ করতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু তিনিও গোত্রের সঙ্গে এসে পড়েছিলেন। তিনি বললেন, তথ্যটা আর কেউ শোনালে না হয় কথা ছিল; আমরা ধরে নিতাম, সংবাদটা সত্য না-ও হতে পারে। কিন্তু আমরা যার মুখে কথাটা শুনেছি, তিনি একজন রাজপুত্র। তার তো আমাদের মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করার কোনোই আবশ্যকতা ছিল না।

দু-তিনটা গোত্রের নেতারা বলল, আমরা নিজেরা গিয়ে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করব। যদি তদন্তে ঘটনার সত্যতা বেরিয়ে আসে, তা হলে আমরা এই লড়াই থেকে হাত গুটিয়ে নেব। সব কজন গোত্রনেতার এই প্রস্তাব মনঃপুত হলো। কুস্তুন্তিন তাদের বিরত রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু তারা তার কোনো কথায় কর্ণপাত না করে বাজিন্তিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

তারা সবগুলো মেয়েকে সঙ্গে করে হেরাক্‌ল-এর কাছে গেল এবং বিষয়টা রাজদরবারে উত্থাপন করল। হেরাক্‌লও তাদের নিরস্ত করতে চাইলেন। কিন্তু তারা এতটাই গোঁয়ার ছিল যে, তারা আপন সিদ্ধান্তেই অটল থাকল।

সম্রাট হেরাক্‌ল তাদের হুমকি দিলেন, এই অবস্থায় এবং এই অজুহাতে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে চলে গেলে আমি তোমাদের ক্ষমা করব না। মুসলমানদের উপর জয়লাভ করার পর আমি তোমাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেব আর তোমাদের এই মেয়েগুলো পুনরায় আমার প্রাসাদে ফিরে আসতে বাধ্য হবে।

ইতিহাস একথাও লিখেছে যে, কোনো-কোনো গোত্র তাদের নেতাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করছিল; কিন্তু নেতারা মেয়েগুলোকে মহলে রেখে যেতে সম্মত হয়নি। তারা মেয়েগুলোকে নিয়ে চলে আসতে শুরু করল। কিন্তু হেরাক্‌ল তাদের আটকে দিলেন। তার অনুভূতি ছিল, ত্রিশ হাজার সৈন্য যদি তার সঙ্গ ত্যাগ করে, তা হলে

শামের এই সর্বশেষ দুর্গ থেকেও তাকে পালিয়ে আসতে হবে। তিনি গোত্রনেতাদের এইমর্মে সম্মত করলেন যে, তিনি তাদের কতগুলো তাঁবু দিয়ে দেবেন। মেয়েগুলোকে তারা সেই তাঁবুতে রাখবে এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রহরার ব্যবস্থা করবেন।

গোত্রনেতারা এই প্রস্তাবে সম্মত হলো এবং মেয়েগুলোকে নিয়ে রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে এল। কাবায়েলিদের মাঝে এই সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। তারা জানল, নিরাপত্তার অভাবে তাদের বোন-কন্যাদের রাজপ্রাসাদ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে এনে তাঁবুতে রাখা হয়েছে। এখন তাদের সবার মুখে-মুখে একই কথা– রোমানদের উপর কোনো আস্থা রাখা যায় না।

ওদিকে মুজাহিদদের সহযোগী বাহিনীও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পৌঁছে যাচ্ছে। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) এখনও পথে রয়েছেন। যে-কজন সালারকে কাবায়েলিদের অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ করতে পাঠানো হয়েছিল, তারা আপন-আপন এলাকায় পৌঁছে গেছেন।

পাঁচ

ইতিহাসের কিছু অধ্যায়, কিছু পর্ব এমন আছে, যেগুলো কালের আলো-আঁধারিতে ঢাকা পড়ে আছে; তবে একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়। আবার কিছু আছে এমন, কালের পরিক্রমা যেগুলোর উপর কালো আবরণ ছড়িয়ে দিয়েছে; কোনো-কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার কড়াগুলো এই আঁধারে এসে হারিয়ে যায়। কিন্তু তথাপি আমাদের ইতিহাসে এমন কিছু গবেষক অতীত হয়েছেন, যাঁরা এই আলো-আঁধারি ও ঘোর অন্ধকারে ডুবে থাকা কোনা-ঘুপচি থেকে হারিয়ে যাওয়া কড়াগুলো খুঁজে-হাতড়ে বের করে এনেছেন এবং ইতিহাসের আঁচলে ঠাঁই দিয়েছেন।

ইতিহাসে রণাঙ্গনের জয়-পরাজয় ও অগ্রযাত্রা-পিছুহটারই কাহিনী পাওয়া যায়। এসব কাহিনী পরাজিত জাতির পরবর্তী বংশধরের জন্য শিক্ষার উপকরণ ও বিজয়ীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উৎসবের কারণ ও উৎসাহব্যঞ্জক হয়। ইতিহাসে গুরুত্ব সেসব কাহিনীকেই প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এসব কাহিনী জাতি-গোষ্ঠীর রীতি-প্রথা ও ঐতিহ্যের আদলে আজীবন জীবন্ত থাকে।

ইতিহাসের আরও একটি দিক আছে। বাহ্যত যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে এই দিকটির কোনো সম্পর্ক পরিদৃশ্য হয় না। এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, রহস্যময় ও বিস্ময়কর একটা ড্রামা, যা পর্দার অন্তরালে খেলা হয়। একে যদি মানবজাতির ইতিহাসও বলা হয়, তা হলে অযৌক্তিক হবে না। এই ড্রামা সেখানে খেলা হয়, যেখানে মানবতা রাজকীয়তার অক্টোপাসে অসহায় ও নিরুপায় হয়ে ছটফট করে; কিন্তু কাজ করতে

পারে না কিছুই। মানুষ মানুষের হাতে খেলনা ও কাঠপুত্তলিতে পরিণত হয়। মানুষই মানুষের খোদা হয়ে বসে।

যেখানে রাজকীয়তা আছে, সেখানে প্রাসাদও আছে। আর প্রাসাদের জন্য প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র একটা আবশ্যিক ও অবিচ্ছেদ্য বিষয়। প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র প্রাসাদের প্রাচীর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই ষড়যন্ত্র প্রাসাদের প্রাচীর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে রণাঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং জয়-পরাজয়কে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেয়। ইতিহাস এসব ড্রামা ও ষড়যন্ত্রকে কমই গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু এসব ড্রামা যেমন চিত্তাকর্ষী, তেমনি শিক্ষাপ্রদও।

কেবল ইসলামই এমন একটি জীবনবিধান, যে কিনা রাজকীয়তার মূলোৎপাটনকে তার মৌলিক শিক্ষামালার অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইসলাম ছোট-বড়র ভেদাভেদ তুলে দিয়েছে এবং মানবতাকে সম্মান করার পাঠ শিখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তাকে আল্লাহর আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তাকে বাস্তবায়িত করেছে।

যে-কুফরিশক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তার পেছনে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার অতটা দখল ছিল না, যতটা ছিল রাজকীয়তার। তারা সবাই রাজা ছিলেন। রাজকীয়তার অবসান ও ফেরাউনি চরিত্রের পতনের মাঝে তারা নিজেদের মৃত্যু দেখতে পেতেন। কিন্তু বিজয় তারই ভাগে পড়েছে, যে মানুষের অন্তরগুলোকে জয় করেছে তরবারি দ্বারা নয়– মমতা দ্বারা। এই বিজেতারা ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা, নবুওত-প্রদীপের ধারক-বাহক।

ইসলামেরও সেই সময়টাতে অধঃপতন এল, যখন খেলাফত রাজকীয়তার রূপ অবলম্বন করতে শুরু করল। আমরা যে-সময়টির কথা বলছি, তখন মুসলমানদের মাঝে সাম্য ছিল। আল্লাহ ও মানুষের মধ্যখানে না কোনো খলীফা দাঁড়াতে পারতেন, না কোনো আলেমে দীন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) কোনো এক ক্ষেত্রে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের স্বাধীন সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কী করে তাদের গোলাম বানিয়ে নিলে!'

এটি উপাখ্যান এক শাহেনশাহর, যার নাম ছিল হেরাক্ল এবং যিনি সম্ভবত কখনও ভাবেনইনি, ফেরাউন কোন পরিণতিতে উপনীত হয়েছিল। রোমের এই সম্রাট নিজেকে ফেরাউন ভেবে বসেছিলেন এবং শাম রাজ্যের বাজি হেরে সীমান্তে বসে-বসে হেরে-যাওয়া-বাজিতে জিতবার স্বপ্ন দেখছিলেন। আসুন, আমরা দেখি, এই বাজি শেষতক কে হারলেন আর কে জিতলেন– আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণকামীরা, নাকি রাজসিকতার পূজারিরা!

* * *

ইউকেলিস পুনরায় রণাঙ্গনে চলে গেল। লড়াই এখনও শুরু হয়নি। সে সারাটা দিন ওখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বাহিনীর মাঝে ঘোরাফেরা করতে থাকল আর খ্রিস্টান গোত্রপতি ও অন্যান্যদের জিজ্ঞাসা করে ফিরল, মেয়েগুলোর ব্যাপারে এখনও তোমাদের কোনো সমস্যা আছে কি?

কুস্তুন্তিন এই বাহিনীর কমান্ডার। তখন সে আপন তাঁবুতে অবস্থানরত ছিল। তাকে সংবাদ জানানো হলো, ইউকেলিস আপনার এই বাহিনীতে ঘোরাফেরা করছে এবং কাবায়েলিদের সঙ্গে ফিসফিস-গুড়গুড় করছে। কুস্তুন্তিন তাঁবু থেকে বের হয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং ইউকেলিসের সন্ধানে ছুটে গেল। একস্থানে গিয়ে ইউকেলিসকে পেয়ে গেল।

'এখানে কেন এসেছ ইউকেলিস?'– কুস্তুন্তিন জিজ্ঞাসা করল এবং তার কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল– 'সবার আগে তোমাকে আমার কাছে চলে আসা দরকার ছিল। তুমি ফৌজের মাঝে ঘুরে ফিরবে আর সৈনিকদের যা-খুশি বলে বেড়াবে, এই অধিকার কেউ তোমাকে দেয়নি।'

'এই অধিকার আমাকে আমি নিজে দিয়েছি'– ইউকেলিস উত্তর দিল– 'আমিও সেই হেরাক্ল-এরই পুত্র, তুমি যার সন্তান। আমি তোমার অধীন নই যে, তুমি যা চাইবে, আমাকে তা-ই করতে হবে। তোমার এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়াই আমি আবশ্যক মনে করি না। আমাদের রাজত্ব এমন এক সমস্যার প্যাঁকে আটকে গেছে যে, কারও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগই আমার নেই। আল-জাযিরার এই গোত্রগুলো আমাদের সাহায্য করতে এসেছিল আর তুমি কিনা তাদের মাঝে অনাস্থা ও অস্থিরতা তৈরি করে দিয়েছ মাত্র একটা মেয়ের খাতিরে। আমি ঘুরে-ফিরে বুঝবার চেষ্টা করছি, তাদের মনের ক্ষোভ দূর হয়েছে কি-না। আমি তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছি।

ইউকেলিসের দুর্বলতা ছিল, তার ডান বাহু জন্ম থেকেই অকর্মা। এই অক্ষমতা তার জীবনের জন্য একটা দুর্ভাগ্য ও পরিহাসে পরিণত হয়েছিল।

'তুমি কেন মেনে নিচ্ছ না, তুমি অক্ষম?'– কুস্তুন্তিন বলল– 'তুমি একজন অপূর্ণাঙ্গ মানুষ। ফৌজ ও রণাঙ্গনের জন্য তুমি অযোগ্য। এখানে তুমি কথা বলতে এসেছ। মনে রেখো, যুদ্ধের মাঠে মুখ চলে না– চলে তলোয়ার।'

ইউকেলিস কোনো উত্তর দিল না। কুস্তুন্তিনের চোখে চোখ রেখে তাকাল এবং তার ওষ্ঠাধরে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল। তারপর লাগামে হাল্কা ঝাকুনি দিয়ে ওখান থেকে চলে গেল। কুস্তুন্তিন তার প্রতি তাকিয়ে থাকল। দুই ভাইয়ের মাঝে শত্রুতা আগে থেকেই ছিল। কিন্তু কাবায়েলি মেয়েটার ঘটনার পর এই বিরোধ আরও তীব্র ও বিষময় হয়ে উঠল। দুই ভাইয়ের শিরায় একই পিতার রক্ত প্রবহমান; কিন্তু মা দুজনের আলাদা।

* * *

কুস্তুন্তিন হেরাক্‌ল-এর কাছে চলে গেল এবং জানাল; ইউকেলিস বড় বেশি বেয়াড়া ও ডেমকেয়ার হয়ে উঠছে। সে হেরাক্‌লকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

'ওর উপর আমার সন্দেহ আছে'– কুস্তুন্তিন বলল– 'বলছে, ও কাবায়েলিদের আস্থা পুনর্বহাল করছে। কিন্তু আমি বলি, ও কাবায়েলিদের মাঝে আমাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা তৈরি করছে। আপনি জানেন, মেয়েটার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ও কোথায় পৌঁছে গিয়েছিল। মেয়েটার পিতার কাছে পর্যন্ত গিয়েছিল এবং তাকে বলেছিল, আপনাদের মেয়েরা এখানে নিরাপদ নয়।'

'আমি জানি'– হেরাক্‌ল বললেন– 'এ আমি সবই জানি। ছেলেটা নিজের মাথায় কাজ করছে না। ওর মা ওকে আমাদের বিরুদ্ধে উস্‌কে দিচ্ছে। তুমি আপন কাজে মনোনিবেশ রাখো। এ-বিষয়টা আমি দেখছি।

'আপনাকে আমি একটি পরামর্শ দিতে চাই'– কুস্তুন্তিন বলল– 'ইউকেলিসকে অতি অনায়াসেই গুম করা যায়। এই সমাধান আপনি কখনও চিন্তা করেছেন কি?'

রাজা-বাদশাদের প্রাসাদগুলোতে আপন স্বার্থের খাতিরে ভাই ভাইকে, পিতা পুত্রকে হত্যা করা কোনো বিস্ময়কর কাজ ছিল না। ইতিহাসের পাতাগুলো এমনসব ঘটনায় পূর্ণ হয়ে আছে।

'হ্যাঁ, এই সমাধানও আমি চিন্তা করেছি'– হেরাক্‌ল বললেন– 'কিন্তু এটি এমন ছোটখাট বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সময় নয়। গোটা একটা দেশ আমাদের হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে...। আমি ইউকেলিসকে হত্যা করাতে চাই না। তুমি ওর মাকে ভালো করে চেন না। আমি যদি এমনটি করি, তা হলে সে এমন গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে যে, আমাদের পায়ের তলা থেকে সবগুলো মাটি সরে যাবে। এ-বিষয়টা আমার উপর ছেড়ে দাও; আমার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখো। আমি ভেবে দেখি কী করা যায়। তুমি হেম্‌সের উপর দৃষ্টি রাখো আর সাধ্যপরিমাণ চেষ্টা করো, যাতে কাবায়েলিরা প্রসন্ন থাকে। ওদের এখনও আমাদের আবশ্যক আছে। আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেলে তখন আমি তাদেরকে সেই স্তরে ফেলে দেব, যেটা তাদের আসল স্তর।'

'আপনি যা-কিছু করতে চাচ্ছেন, তাড়াতাড়ি করে ফেলুন'– কুস্তুন্তিন বলল– 'পাছে এমন না হয় যে, মা-পুত্র মিলে অঘটন কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলেছে আর আমরা চেয়ে-চেয়ে শুধু দেখব। আমার চেয়ে বেশি অনুভব আর কে করবে যে, আমাদের উপর কীরূপ নাজুক ও ভয়াবহ বিপদের ঘনঘটা নেমে এসেছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি ইউকেলিসকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে আমার বাহিনীর সামনে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেব আর তার মাথাটা বর্শার আগায় গেঁথে সর্বত্র প্রদর্শন করে বেড়াব! ছোকড়াটে যে গাদ্দার, তাতে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।'

'ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না'– হেরাক্ল বললেন– 'প্রকাশ্যে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হোক আর কাউকে দিয়ে গোপনে হোক ওকে হত্যা করাই আসল সমস্যা। আমরা যদি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তা হলে ওর মা আল-জাযিরার কাবায়েলিদের বলবে, তোমাদের মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করার অপরাধে আমার পুত্রকে হত্যা করা হয়েছে। তুমি চিন্তা করে দেখো, তখন কাবায়েলিদের প্রতিক্রিয়া কীরূপ হবে! সেই প্রতিক্রিয়া আমাদের জন্য খুবই ভয়াহব হবে।

হেরাক্ল জল্লাদ প্রকৃতির রাজা ছিলেন। তার ঝুলিতে 'দয়া' নামের কোনো বস্তু ছিল না। যেকোনো একজন মানুষকে হত্যা করা তার পক্ষে ছিল একটা সাধারণ বিষয়। হোক সে ঔরসজাত পুত্র বা প্রেমময়ী স্ত্রী। কিন্তু একজন রাজপুত্রের ব্যাপারে তিনি বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে কোনো একটা পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত তার চূড়ান্ত যে, ইউকেলিসকে তিনি জীবিত থাকতে দিবেন না। কিন্তু কুস্তুন্তিন এখনও যুবক। বিচার-বুদ্ধি তার অপরিপক্ব। পিতার মতো অভিজ্ঞতা তার নেই। ইউকেলিসের শত্রুতা অন্তরটাকে তার আগুনের মতো দগ্ধ করছে। তাই সে চাচ্ছিল, ইউকেলিসকে এক্ষুনি এবং তার সম্মুখে হত্যা করে ফেলা হোক। তার এই উৎকণ্ঠা দেখে হেরাক্ল ভালো মনে করলেন, ওকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, আমি ইউকেলিসকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে কী পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছি।

'প্রিয় পুত্র আমার!'– হেরাক্ল বললেন– 'একটি পদমর্যাদা দিয়ে ইউকেলিসকে আমি কোনো এক সেনাপতির সঙ্গে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেব। তাকে ও তার মাকে একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় স্বপ্ন দেখাব। এক বাহু দ্বারা ইউকেলিস কী আর লড়াই করবে সে তুমি জান। প্রথম সঙ্ঘাতেই সে প্রাণ হারাবে। এতে লাভ এই হবে যে, এই প্রক্রিয়ায় সে মারাও যাবে আবার তার মা গর্বের সঙ্গে মানুষের কাছে বলে বেড়াবে, আমার পুত্র শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে রণাঙ্গনে মারা গেছে।'

'সেই সেনাপতিকে আপনি আগাম কিছু বলে রাখবেন কি?'– কুস্তুন্তিন জিজ্ঞাসা করল– 'তাকে কি আগে-ভাগেই বলে দেবেন, এই ছেলেটাকে এমন একটা জায়গায় ঠেলে দেবে, যেখান থেকে ওর আর ফিরে আসা হবে না?'

'শোনো বেটা'– হেরাকল এমন মমতার সঙ্গে বললেন, যার মাঝে খানিক ক্ষোভও ছিল– 'আমার মনে হচ্ছে, তুমি আসল কর্তব্য বাদ দিয়ে শুধু এই বিষয়টা নিয়েই ব্যস্ত রয়েছ। আমি তোমাকে এত বড় একটি বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করলাম! তুমি যদি এরূপ আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে যুদ্ধ কর, তা হলে ফলাফল এ ছাড়া আর কিছু হবে না যে, তুমি পরাজিত হবে এবং শত্রুর হাতে নিজেই প্রাণ হারাবে। তুমি বাহিনীতে ফিরে যাও। আর এ-বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। যা-যা করা দরকার আমি সব ঠিক করে রেখেছি।'

কুস্তুন্তিন উঠে মাথা চুলকাতে-চুলকাতে নত মুখে বেরিয়ে গেল এবং পিতার আদেশ অনুসারে তখনই ঘোড়ায় চড়ে রণাঙ্গন অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

* * *

পিতা-পুত্রে যখন এই আলাপচারিতা চলছিল, তখন তাদের কাছে অতিশয় রূপসী ও বুদ্ধিমতী এক দাসি উপস্থিত ছিল। পরিধানে অতি মিহি ও সংক্ষিপ্ত পোশাক, যেন মেয়েটা উলঙ্গ। হেরাক্‌ল-এর স্বভাব তার জানা ছিল। একটু পর-পর পেয়ালায় মদ ঢালছিল আর সম্রাটের সম্মুখে উপস্থাপন করে একধারে সরে দাঁড়াচ্ছিল। তার ভাবসাব এমন ছিল, যেন পিতা-পুত্রের এই কথোপকথনের সঙ্গে তার কোনোই সংশ্রব নেই। হেরাক্‌ল-এর ইঙ্গিতে একবার কক্ষের বাইরে চলে যাচ্ছিল আবার কিছুক্ষণ পর করতালির শব্দে ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। এ ছিল রাজা-বাদশাদের একটি রীতি। এভাবে তারা বোঝাতে চেষ্টা করতেন, আমরা তোমাদের রাজা ও দেবতা। কাজেই আমাদের তোমরা খোদা বলে বিশ্বাস করো। এই তরুণী দাসিটা অত্যন্ত সুন্দর একটা পুতুল ছিল, যার সঙ্গে শিশুরা যেমন খুশি খেলা করতে পারে। কুস্তুন্তিন চলে গেলে হেরাক্‌ল-এর ইঙ্গিতে দাসি এসে তার সম্মুখে অবনত মস্তকে বসে পড়ল এবং নিজের রূপময় দেহবল্লরীর যৌবন-সুষমা ছড়িয়ে দিয়ে সুকোমল হাতে তার পা টিপতে শুরু করল।

হেরাকল দারোয়ানকে ডেকে বললেন, তুমি ইউকেলিসের মাকে এখনই সঙ্গে করে নিয়ে আসো। হেরাক্‌ল-এর এই স্ত্রী অদূরেই প্রাসাদের একটা কক্ষে বাস করত। আদেশ পাওয়ামাত্র মহিলা হেরাক্‌ল-এর কক্ষে এসে প্রবেশ করল। মহিলার বয়স পঁয়তাল্লিশের কম হবে না। কিন্তু বয়সের কোনো ছাপ তার শরীরের কোথাও নেই। অতিশয় সুঠাম ও সুডৌল দেহের অধিকারী মনকাড়া এক নারী। রাজপরিবারের সন্তান। অপার বিত্ত ও বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিতা। ফলে প্রকৃত বয়সের তুলনায় বেশ ছোট বলে ভ্রম হয়। নাম লিজা।

হেরাকল লিজাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। লিজার মুখাবয়বে প্রশ্নবোধক ছাপ। বহুদিন পর হেরাক্‌ল তাকে এভাবে একান্তে তলব করলেন।

লিজার একটি আকর্ষণীয় ইতিহাস আছে। নিজের অতীত ও পারিবারিক ঐতিহ্যের জন্য সে গর্ব করতে পারত। মেয়েটি রোমদেশীয় নয়– ইরানি এবং কেসরা-পারিবারের শাহজাদী। ধর্মের দিক থেকে অগ্নিপূজক।

ইরান ও রোমের মাঝে তখন চরম বিরোধ চলছিল। উভয় সাম্রাজ্য মুখোমুখি অবস্থানে। কখনও এ বিজয় অর্জন করছে, কখনও ও। মিসর-শাম কখনও ইরানিদের কব্জায় চলে যাচ্ছে, কখনও রোমানদের হাতে চলে আসছে। এমনি পরিস্থিতিতে হেরাক্‌ল-এর সঙ্গে লিজার সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটল। কিন্তু সেটি কোনো বন্ধুসুলভ সাক্ষাৎ ছিল না। লিজা হেরাক্‌ল-এর জন্য চরম এক মৃত্যুবার্তা নিয়ে

হাজির হয়েছিল। হেরাক্ল-এর কাছে নিজের এই পরিচয় দেয়নি যে, আমি ইরান-সম্রাটের রাজকন্যা। বরং সে নিজের অপহরণ-ঘটনার একটা নাটক মঞ্চস্থ করেছিল এবং একজন নিপীড়িতা গুম-হওয়া নারী হিসেবে হেরাক্ল-এর কাছে এসেছিল। হেরাক্লকে তথ্য দেওয়া হয়েছিল, এই মেয়েটি এক ব্যবসায়ীর কন্যা, যাকে কাফেলা থেকে অপহরণ করা হয়েছে। হেরাক্ল তখন টগবগে যুবক এবং এরূপ হিরে-মোতি-পান্নাদের অনুসন্ধানে বিভোর। হেরাক্ল এই উপহার সাদরে বরণ করে নিলেন।

ইরানিরা শাম দখল করে নিল। হেরাক্ল ইরানিদের উপর জবাবি আক্রমণের লক্ষ্যে রোমরাজা ফোকাসের সিংহাসন উলটে দিলেন। নিজে রাজার আসনে আসীন হয়ে শামের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। যে-সময় তিনি শামের অর্ধেকটা জয় করে নিলেন, তখন এই মেয়েটা তার হাতে এসেছিল।

লিজা কোনো ব্যবসায়ীর কন্যা ছিল না। তাকে কেউ অপহরণও করেনি। সম্রাট কেসরা একটা ষড়যন্ত্রের অধীনে পরম সফলতার সঙ্গে তাকে হেরাক্ল-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। কেসরা পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন, আমি হেরাক্লকে হত্যা করতে চাই। হেরাক্ল দুনিয়া থেকে সরে গেলে রোমান বাহিনী আর আমার মোকাবেলায় দাঁড়াতে সাহস পাবে না। কিন্তু কাজটা কীভাবে সমাধা করি?

তখন এই মেয়েটা বলল, আপনার এই কাজটা আমি করে দিতে পারি। কেসরা সম্মত হলেন না। কিন্তু লিজা যখন তার পুরো পরিকল্পনা ব্যক্ত করল যে, আমি এভাবে নিরাপদে ও সফলতার সঙ্গে কাজটা করে ফেলতে পারব, তখন কেসরা সম্মত হলেন। মেয়েটার কাজ ছিল, সে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হেরাকল-এ পেটে ঢোকাবে। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে আসবে।

রাজকুমারী লিজার জানা ছিল না, যাকে সে বিষ পান করাতে এসেছে, লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট। তিনি খুব সফলতার সঙ্গে পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তৎকালীন রাজার সিংহাসন উলটে দিয়ে নিজে রাজার আসনে আসীন হয়েছেন এবং তার চতুরতার ফলে রোমের জনসাধারণ ও সেনাবাহিনী তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

হেরাক্ল রাজকন্যা লিজার রূপে এতটাই বিমোহিত ও প্রভাবিত হলেন যে, তিনি মেয়েটাকে বললেন, তুমি ইরানি রূপের একটি অনুপম উদাহরণ। তখন রাজকুমারীর মুখ ফস্কে অজান্তে বের হয়ে গিয়েছিল, আমি ইরানি-ই বটে। এই উত্তরে হেরাক্ল সতর্ক হয়ে উঠলেন। ইরানি ও রোমানদের শত্রুতা প্রবাদতুল্য হয়ে গিয়েছিল। আর এই মেয়েটা কিনা ইরানি!

হেরাকল কোনো সন্দেহ প্রকাশ না করে লিজার সঙ্গে এমন ভালবাসা ও ক্রিয়াশীল আচরণ শুরু করলেন, যা সে কখনও আশা করেনি। হতে পারে, তার উপর

হেরাক্ল-এর সন্দেহ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি তার আসল পরিচয় জানতে এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যে, তাকে রক্ষিতা না বানিয়ে প্রেমিকা বানিয়ে নিলেন এবং মন উজাড় করে ভালাবাসা দিতে শুরু করলেন।

ইরানি রাজকুমারী লিজা একদিন মোক্ষম সুযোগটি পেয়ে গেল। সে মদের সঙ্গে বিষ মেশাল। কিন্তু যখনই পেয়ালাটা হেরাক্ল-এর সম্মুখে রাখল, অমনি তার হৃদয়ের ভেতরটা শতপাঁকে মোচড় দিয়ে উঠল। তার চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। হেরাক্লকে হত্যা করার মনোঃবৃত্তি তার উবে গেল। হেরাক্ল মদের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিলেন এবং পান করার জন্য মুখের কাছে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ঠোঁটের এক-দু ইঞ্চি দূরে থাকতেই রাজকুমারী লিজা খপ করে পাত্রটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। হেরাক্ল বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে অপলক চোখে লিজার প্রতি তাকিয়ে থাকলেন।

'আমি তোমাকে বিষ দিতে পারি না।' লিজা বলল এবং হেরাক্লকে তথ্য ফাঁস করে দিল, আমি কখনও অপহৃতা হইনি এবং এখানে একটি পরিকল্পনার আওতায় এসেছি।

হেরাকল তখনই একজন দূত ডেকে পাঠালেন এবং ইরানসম্রাটের নামে একটি বার্তা লিখিয়ে তার হাতে দিয়ে বললেন, এক্ষুনি রওনা হয়ে যাও এবং এই বার্তাটি কেসরার হাতে পৌঁছিয়ে দাও।

বার্তায় হেরাক্ল লিখেছেন, 'যে-রাজকন্যাকে তুমি আমাকে বিষ পান করাতে পাঠিয়েছিলে, সে এখন আমার স্ত্রী হয়ে গেছে। আর এও শুনে নাও, তার উপর কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। বরং এটি তার ঐকান্তিক কামনা ছিল, যা আমি সানন্দে গ্রহণ করে নিয়ে তার মনোবাসনা পূর্ণ করেছি। আমাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা যদি তোমার করতেই হয়, তা হলে অন্য আরেক রাজকন্যা পাঠিয়ে দাও। কিন্তু একথাটি মনে রেখো, সুপুরুষ রাজারা মাঠে এসে লড়াই করে– আপন কন্যাদের নিপীড়িতা বানিয়ে শত্রুর ঘরে পাঠায় না।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হেরাক্ল-এর দূত সেই যে বার্তা নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিল, আর কখনও ফিরে আসেনি। কেসরা তাকে হত্যা করে ফেলেছিলেন।

হেরাক্ল কেসরার এই কন্যাআকে খ্রিস্টান বানিয়ে নিলেন এবং তার নাম রাখলেন লিজা। কিছুদিন যাবত হেরাক্ল-এর মানসিক অবস্থা এমন ছিল, যেন তিনি লিজার রূপ-সুষমা ও জাদুকরী যৌবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু লিজা প্রথম সন্তানটা জন্ম দিলে হেরাক্ল-এর মনোযোগ তার থেকে সরে গেল। লিজার উদরে ভূমিষ্ঠ হেরাক্ল-এর এই সন্তানটা-ই ইউকেলিস, যার বাম বাহু জন্মগতভাবেই অকর্মা।

লিজা হেরাক্ল-এরই মতো একটি রাজপরিবারের কন্যা ছিল। পারিবারিক অভিজ্ঞতার আলোকেই তার জানা থাকা আবশ্যক ছিল, এই রাজা-বাদশাহরা

কোনো একটা বস্তু একটুখানি পুরোনো হয়ে গেলেই তাকে ছুড়ে ফেলে দেন এবং তার স্থলে নতুন আরেকটা নিয়ে আসেন। একে তারা তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার মনে করেন। লিজা ইউকেলিসের পর একটা কন্যাসন্তান জন্ম দিলে এবার হেরাক্‌ল-এর চোখে তাকে এমন মনে হতে লাগল, যেন কোথাও রাস্তায় লিজার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর কিছু পথ একসঙ্গে সফর করেছেন। এবার কোনো এক দোরাস্তায় এসে উপনীত হওয়ার পর তার পথ লিজা থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

লিজার জায়গায় আরেক দাসি এল। কিন্তু লিজা নিজেকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত খড়কুটো ভাবল না। পরিণতি যা-ই ঘটুক, লিজা রাজপরিবারের সন্তান। প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তার ভালোই সম্পর্ক-পরিচিতি ছিল। তার মা এমনই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল। সে নিজে এমন অনেক শিকার খেলেছিলও । একটার চেয়ে একটা বড় ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে জানে লিজা। সেই জালে শত্রুকে কীভাবে আটকানো যায়, একটা চক্রান্ত-পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হয়, সেই অভিজ্ঞতাও তার রপ্ত করা আছে। মেয়েটা হেরাক্‌ল-এর মস্তিষ্কে চড়েই থাকল। হেরাক্‌ল কোনোমতেই তাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। এমনকি তার অন্তরে লিজার ভীতি জন্মে গিয়েছিল, না জানি মহিলা কোন কৌশলে কখন কোন অঘট ঘটিয়ে ফেলে।

এ হলো ইউকেলিসের মা, যে কিনা তাকে হেরাক্‌ল-এর স্থলাভিষিক্ত বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু হেরাক্‌ল তার পরিবর্তে কুস্তুন্তিনকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন।

* * *

এখন হেরাক্‌ল লিজাকে ডেকে আনালেন এবং বসতে ইঙ্গিত করলেন। লিজা বসলে হেরাক্‌ল প্রথমে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মাথাটা নত করে ফেললেন।

'কেন আসতে বললেন আমাকে?' লিজা এমন ধারায় জিজ্ঞেস করল, যেন হেরাক্‌ল ছোট-খাট একজন সাধারণ মানুষ।

'তোমার ছেলের ব্যাপারে কথা বলতে।' হেরাক্‌ল শান্ত ও স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

'শুধু আমার নয়'– লিজা বলল– 'ও আপনারও ছেলে। তা কী কথা বলবেন বলুন।'

'তোমার একটি মনোঃবাসনা আমি পূর্ণ করতে চাই'– হেরাক্‌ল বললেন– 'তুমি তোমার জীবদ্দশায় তোমার ছেলের মাথায় রোমের রাজত্বের মুকুট দেখতে চাচ্ছ। আমি কুস্তুন্তিনকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। এখন কোনো কারণ ব্যতিরেকে এবং আইনের বাইরে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারব না। কিন্তু আমি একটা রাস্তা বের করে নিয়েছি। আমি সাম্রাজ্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে নেব। এক ভাগ কুস্তুন্তিনের

হবে আর এক ভাগ ইউকেলিসের। আগে আমাকে শাম রাজ্যের একটা কিনারা করতে দাও।'

'তার কিনারা তো হয়েই গেছে'– লিজা বলল– 'যে-শত্রুবাহিনী সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে শামের সীমান্ত পর্যন্ত ঠেলে দিয়েছে, তারা এখান থেকেও তোমাকে সরিয়ে দেবে।'

'লিজা!'– হেরাক্ল বললেন– 'এমন হতাশার কথা কেন বলছ? আমি মুসলমানদের থেকে এই রাজ্য ফিরিয়ে আনব এবং ইউকেলিসকে তার রাজা বানাব।'

'আমার প্রার্থনাও এটিই'– লিজা বলল– 'কিন্তু এর বাস্তবতা এমন, যেমন কেউ বলল, আমি আকাশ থেকে তারকাটি পেড়ে আনব আর তার অর্ধেক তোমাকে দেব। আমি বলছি, আমার ছেলেকে তা দিন, যা আপনার হাতে আছে।'

'অর্ধেক বাহিনীর কমান্ড তো আমি এক্ষুনি তার হাতে তুলে দিচ্ছি'– হেরাক্ল বললেন– 'আমি ইউকেলিসকে রণাঙ্গনে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাকে একজন সেনাপতির সঙ্গে জুড়িয়ে দেব, যাতে সে সামরিক নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। আমার পুরোপুরি আশা আছে, সে এক হাতেই তরবারি চালনা করে শত্রুকে অস্থির করে তুলতে ও সেনা-অধিনায়কত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হবে। তারপর আমি তাকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করব।'

'আজ হঠাৎ এই ভাবনাটা তোমার মাথায় কেন এল?'– লিজা জানতে চাইল– 'এই গতকাল পর্যন্ত তাকে তুমি পর ভেবে এসেছ কী কারণে?'

'এখন আমি তার একটি যোগ্যতার প্রমাণ পেয়েছি'– হেরাক্ল বললেন– 'যে-কাবায়েলিরা আমাদের সাহায্য করতে এসেছিল, কুস্তুন্তিন তাদের মেয়েদের প্রতি হাত বাড়িয়েছিল। ইউকেলিস তাদের কুস্তুন্তিনের হাত থেকে রক্ষা করেছে। এমনকি এর জন্য সে তরবারিও উত্তোলন করেছে। বিষয়টি আমার খুবই ভালো লেগেছে। এই সংবাদে আমি যারপরনাই প্রীত হয়েছি। আমি ভেবে আনন্দিত হয়েছি যে, আমার এই ছেলেটার মাঝে সাহসও আছে আবার স্বাধীনতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাও আছে।'

লিজা বেজায় ধূর্ত মহিলা। তার সবচেয়ে বেশি কার্যকর অস্ত্র হলো তার রূপ। তার উপর সে জিহ্বায় এমন জাদু সৃষ্টি করে নিয়েছিল, যার থেকে কেউই রক্ষা পেত না। কিন্তু হেরাক্ল তাকে এমন সবুজ বাগান দেখালেন যে, মহিলা তার কৌশলের কাছে ধরা খেয়ে গেল। তার গোপন পরিকল্পনা কিছুই আঁচ করতে পারল না এবং তার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল। লিজা মুখে আনন্দের আভা ফুটিয়ে এবং নিজেকে একজন সফল নারী ভাবতে-ভাবতে দরবার থেকে বেরিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পর হেরাক্ল ইউকেলিসকে ডেকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে তার মা তাকে অবহিত করেছে সম্রাট তার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। শুনে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে।

'প্রিয় পুত্র আমার!'– হেরাক্ল পুত্র ইউকেলিসকে উদ্দেশ করে বললেন– 'সেদিন তোমাকে আমি অনেক মন্দ-শক্ত বলেছি যে, তুমি তোমার বড় ভাইকে অপমান করেছ। কিন্তু পরে একান্তে যখন চিন্তা করলাম, তখন বুঝলাম, আসলে তুমি অনেক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছ। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছ এবং এর জন্য তুমি প্রশংসার হকদার। তোমার সেদিনকার ভূমিকার কারণেই কাবায়েলিরা আজও রণাঙ্গনে টিকে আছে। সেদিন যদি তুমি কুস্তুন্তিনের হাত প্রতিহত না করতে, তা হলে আমরা এই দুর্ধর্ষ ত্রিশ হাজার যোদ্ধা থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতাম। আমি তোমাকে সেনাপতি এন্থনিসের সঙ্গে রণাঙ্গনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তোমার কাজ হলো, তার থেকে সমর নেতৃত্বের মার-প্যাঁচ ও বুদ্ধি-কৌশল রপ্ত করে নাও। পরে আমি তোমাকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করব।'

হেরাকল ইউকেলিসকে জানিয়ে রাখলেন, আগামী কার প্রত্যুষে তোমাকে রওনা হতে হবে। বললেন, এন্থনিসকে ডেকে আমি সব বুঝিয়ে দেব।

* * *

হেরাকল-এর একটা নিজস্ব গোয়েন্দাব্যবস্থা ছিল। তার একান্ত ঘনিষ্ঠমহলও এ-বিষয়ে অবহিত ছিল না। ব্যবস্থাপনাটা এতই গোপন যে, আপন প্রিয়পুত্র কুস্তুন্তিনও এর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনবহিত ছিল। এরা সেনাবাহিনীরই লোক ছিল। দু-তিন দিন পর-পর একজন সংবাদদাতা এসে রিপোর্ট প্রদান করত। বলে রাখা ছিল, সম্রাট হেরাক্ল যতই ব্যস্ত থাকুন-না কেন, তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্নই থাকুন-না কেন, জরুরি কোনো বার্তা জানাতে এমন কেউ এলে যেন তাকে সঙ্গে-সঙ্গে সংবাদ জানানো হয়।

এমনই এক গোয়েন্দা হেরাক্ল-এর কাছে এল। হেরাক্ল তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে নিলেন এবং খাস কামরায় বসে দরজা বন্ধ করিয়ে দিলেন।

'তুমি তো জান আমি কী জানতে চাই'– হেরাক্ল বললেন– 'বলো কী সংবাদ নিয়ে এসেছ?'

'কাবায়েলিদের উপর এখন আর আস্থা রাখা যায় না'– গোয়েন্দা বলল– 'তাদের মাঝে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের মেয়েটার লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা সর্বনিম্ন পর্যায়ের লোকটা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তারা সবাই জেনে গেছে, সম্রাট হেরাক্ল-এর এক পুত্র তাদের একটা মেয়ের প্রতি হাত বাড়িয়েছিল এবং তাকে উত্যক্ত করেছিল। তার একটা প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে যে, তারা এখন কুস্তুন্তিনকে ভালো চোখে দেখে না এবং যখনই তার নাম উচ্চারিত হয়, তাদের চেহারায় তার প্রতি

অনীহা, ক্ষোভ ও অনাস্থা ফুটে ওঠে।'

তোমার ব্যক্তিগত মতামত কী?'– হেরাক্ল গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমি যদি আদেশ করি, হেম্‌স অভিমুখে অগ্রযাত্রা করে নগরীটা অবরোধ করা হোক এবং এই চেষ্টা করা হোক, যেন অবরোধ দীর্ঘতা লাভ না করে, তা হলে কি আশা রাখা যায়, কাবায়েলিরা মনে-প্রাণে লড়াই করবে?'

'তারা একটি শর্ত আরোপ করেছে'– গোয়েন্দা উত্তর দিল– 'তারা বলছে, রোমানরা যদি প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে লড়াই করে, তা হলেই কেবল আমরা তাদের সঙ্গ দেব। অন্যথায় আমরা এখান থেকে চলে যাব...। মহারাজ! আসল ব্যাপার হলো, আপনি আপনার দেশের স্বার্থে লড়াই করছেন। কিন্তু এই কাবায়েলিরা শুধু নিজের, আপন স্ত্রী-সন্তান ও সম্পদের নিরাপত্তার চিন্তায় বিভোর। তাদের কথাবার্তা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, মুসলমানদের পাল্লা যদি ভারী প্রমাণিত হয়, তা হলে এরা তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিক আর না দিক, এখান থেকে চলে যাবে আর আপনি তাদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন।'

'আর আমাদের নিজস্ব ফৌজের স্পৃহা কেমন?' হেরাক্ল জিজ্ঞেস করলেন– 'তাদের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে কি?'

'না মহারাজ!'– গোয়েন্দা বলল– 'আপনার মনে ব্যথা দিয়ে আমি অন্তরে দুঃখবোধ করছি। কিন্তু সত্যকে তুলে ধরা আমার কর্তব্য। আমাদের সৈন্যদের মাঝে কোনো উদ্দম পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সৈনিকের জোশ-জযবা বলতে তাদের মাঝে কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিভিন্ন তাঁবুতে বসে নানাজনের সঙ্গে আমি নিজে কথাবার্তা বলেছি, তাদের মনের কথা বের করেছি। হতভাগাদের উপর মুসলমানভীতি এমনভাবে ঝেঁকে বসেছে, যেন আপন ঘরে বসেও তারা কাঁপছে। তাদের বলা হলো, হেম্‌সে মুসলমানদের সৈন্য বড়জোর চার হাজার। এই চার হাজার সৈনিক আমাদের এই বিপুলসংখ্যক সৈন্যের মোকাবেলায় দাঁড়াতেই সাহস পাবে না। আমাদের সহযোগী বাহিনী কাবায়েলিরাই আছে ত্রিশ হাজার। কিন্তু তারপরও আমাদের সৈন্যদের মাঝে সামান্যতম উদ্দীপনা সৃষ্টি হচ্ছে না। এমন সুরও শোনা যাচ্ছে, মুসলমানদের ধর্মই সত্য ও সঠিক। এসব কথা যারা বলছে, তাদের যুক্তি হলো, খোদা মুসলমানদের সঙ্গে আছেন।'

সম্রাট হেরাক্ল নিজের বাহিনী সম্পর্কে একের-পর-এর হতাশাজনক রিপোর্ট পাচ্ছিলেন। তার কারও মতামত গ্রহণ করার আবশ্যকতা ছিল না। তিনি নিজেই ময়দানের লোক এবং ইতিহাসের একজন সুযোগ্য সেনাপতি। যুদ্ধবিষয়ে তার অনেক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই আপন বাহিনী ও কাবায়েলি বাহিনীর বিদ্যমান অবস্থার সঠিক ও যথাযথ মূল্যায়ন তিনি নিজেই করতে সক্ষম। তার কাছে একটাই পথ খোলা আছে যে, তিনি কালবিলম্ব না করে এখনই হেম্‌স আক্রমণ করে

বসবেন। হেম্‌স তার দখলে এসে পড়লে তার সৈন্যদের মাঝে কিছু মনোবল ও স্পৃহা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু নিজ বাহিনীর মানসিক ও শারীরিক যে-অবস্থার সংবাদ তিনি পাচ্ছিলেন এবং কাবায়েলিদের মাঝে যে-অস্থিরতার কথা গোয়েন্দামারফত জানতে পেরেছেন, তাতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই বাধ্য হচ্ছেন যে, এখনই হেম্‌স আক্রমণ করা যাবে না। তিনি এই আত্মপ্রবঞ্চনায়ও লিপ্ত ছিলেন যে, হেম্‌স বাড়তি কোনো সাহায্য পাবে না এবং মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা স্বল্পই থেকে যাবে।

সম্রাট হেরাক্‌ল জানতেই পারলেন না, মুসলমানরা কত দ্রুততার সঙ্গে নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছে এবং দিনকতকের মধ্যে কীসব ঘটতে যাচ্ছে।

হেরাকল-এর নিজস্ব গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনাটি ছিল খুবই চৌকস ও করিৎকর্মা। মানুষের মনের কথা টেনে বের করে আনার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল তাদের। কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না, আরবের দশ-বারোজন মুসলমান তারই রণাঙ্গনে কাবায়েলি খ্রিস্টানের বেশে ঢুকে পড়েছে এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কাবায়েলিদের মাঝে অস্থিরতা ও রোমানদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে চলেছে।

এই দলটির কমান্ডার হলেন হাদীদ। মানুষের মনোঃজগতে আক্রমণ-অভিযান পরিচালনায় অত্যন্ত সুদক্ষ এক সৈনিক। মিশন বাস্তবায়নে তিনি কোনো-কোনো কাবায়েলি নেতা পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। তাদের চিন্তা-চেতনায়ও সম্রাট হেরাক্‌ল ও রোমানদের ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

বাস্তবতা হলো, সেকালের মুসলমানরা নিজেদের ঈমান, প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞায় পরিপক্ব ও সত্যবাদী ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর পথে মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে আপন-আপন জীবন কুরবান করতে এই সুদূরে এসেছিলেন। কাজেই আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকবেন না তো আর কার সঙ্গে থাকবেন!

মুসলমানদের মাঝে কোনো প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র ছিল না। না তাঁদের মাঝে চরিত্রহীন কোনো সালার ছিলেন, না হৃদয়ে তাঁদের কোনো সংশয় ছিল। তাঁরাা সবাই মহান আল্লাহর মহান একটি বার্তার বাহক ছিলেন এবং প্রত্যেকে আপন-আপন কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাঁদের মাঝে সালারও ছিলেন, নায়েব সালারও ছিলেন, অধীনও ছিলেন। কিন্তু সবাই জানতেন, আল্লাহর কাছে সে-ই বড়, যার ঈমান ও চরিত্র উন্নত।

* * *

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)কে এই সম্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে বের করে আনতে কী-কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং ইরাকের রণাঙ্গন থেকে কোন-কোন সালারকে শামের রণাঙ্গনে

পৌঁছে কাকে কোন এলাকায় যাওয়ার আদেশ করেছিলেন, বিগত অধ্যায়ে আমরা তার বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করেছি। হযরত ওমর (রা.) নিজেও একটি বাহিনী গঠন করে অতিদ্রুত হেম্‌সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন।

আমীরুল মুমিনীন এক দূতকে এই বার্তা দিয়ে হেম্‌স পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, সহযোগী বাহিনীও আসছে, আমিও আসছি। তিনি দূতকে বলে দিলেন, তুমি পাখির মতো উড়ে হেম্‌স পৌঁছে যাও। নিয়ম হলো, যুদ্ধ চলাকালে সেনাপতি বা সিপাহসালার যখন কোনো রণাঙ্গনে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন চেষ্টা করা হয়, যেন শত্রুপক্ষ বিষয়টি জানতে না পারে এবং তিনি প্রতিপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ রণাঙ্গনে পৌঁছে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন।

কিন্তু হযরত ওমর (রা.) চিরাচরিত এই রণনীতির একদম বিপরীত একটি অভিযান পরিচালনা করলেন। তিনি একজন উষ্ট্রারোহী ও একজন অশ্বারোহীকে আলাদা করে নিয়ে তাদের বলে দিলেন, তোমরা সবার আগে সম্মুখে এগিয়ে যাও এবং রণাঙ্গনের সন্নিকটস্থ বসতিগুলোতে সংবাদ ছড়িয়ে দাও, মদীনা থেকে বিরাট এক বাহিনী হেম্‌স যাচ্ছে। আমীরুল মুমিনীন আরও বলে দিলেন, বিশেষভাবে এই সংবাদটি আল-জাযিরায় বেশি করে প্রচার করে দাও। একথাও বলবে, ইরাক থেকেও কয়েকজন সালার বাহিনী নিয়ে হেম্‌স ও বাজিন্তিয়ার অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে।

হযরত ওমর (রা.) নিজের অভিযানে বেরিয়ে পড়ার এই প্রচার ও প্রদর্শন এজন্য করছিলেন, কারণ, তাঁর জানা ছিল, হেরাক্‌ল-এর মাঝে এতটুকু দম নেই যে, এখন তিনি কোথাও মুজাহিদদের সঙ্গে টক্কর লাগাতে পারবেন বা কোথাও জবাবি আক্রমণ চালাতে সক্ষম হবেন।

মদীনা থেকে রওনার আগে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) তাঁর সহকর্মীদের বলেছিলেন, হেরাক্‌ল-এর কোমর ভেঙে গেছে এবং জনবলের দিক থেকে সে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, তার যুদ্ধের স্পৃহা নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আমীরুল মুমিনীন তাঁর ও সহযোগী বাহিনীর আগমনের অধিক প্রচার আল-জাযিরার সেই খ্রিস্টান গোত্রগুলোর মাঝে করাতে চাচ্ছিলেন, যারা হেরাক্‌লকে ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দিয়েছিল। এই প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে গোত্রগুলো ভয় পেয়ে যায়, মুসলমানরা তাদের বসতিগুলোকে ধ্বংস করে দেবে এবং এই চিন্তা মাথায় নিয়ে তারা হেরাক্‌ল-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করবে।

আমীরুল মুমিনীনের এই দূত কত দিনে হেম্‌স গিয়ে পৌঁছেছিল, এই তথ্য নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে বলা যায়, দূত অতি অল্প সময়ে হেম্‌স পৌঁছে গিয়েছিল এবং সিপাহসালার আবু উবায়দাকে সংবাদ জানিয়েছিল, আপনার জন্য সাহায্য আসছে আর খোদ আমীরুল মুমিনীনও একটি বাহিনী নিয়ে আসছেন। হেম্‌স আর কোথা-কোথা থেকে সাহায্য পাচ্ছে এবং কাবায়েলি অঞ্চলগুলোতেও

সালারগণ আপন-আপন বাহিনী নিয়ে পৌঁছে গেছেন দূত এই সংবাদও সিপাহসালার আবু উবায়দাকে অবহিত করলেন।

অপ্রত্যাশিত ও অভাবিত এই সংবাদে সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) কী পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিলেন, কতখানি সুখ ও স্বস্তি অনুভব করেছিলেন, সে সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি তো সিপাহসালার ছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে ওখানে একজন সাধারণ মুজাহিদও জিতে-যাওয়া-বাজি হারতে রাজী ছিলেন না। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) সর্বস্তরের মুজাহিদদের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন যে, এখন পিছুহটার একটি-ই পথ অবশিষ্ট্য আছে। আর তা হলো, তোমরা তোমাদের জীবনগুলোকে কুরবান করে দাও। ফলে প্রতিজন মুজাহিদ পণ করে নিয়েছিলেন– হয় বিজয়, নাহয় মৃত্যু। এমনই একটি স্পর্শকাতর ও পরিস্থিতিতে সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে আমীরুল মুমিনীনের দূতকে মনে হচ্ছিল, যেন আকাশ থেকে রহমতের ফেরেশতা নেমে এসেছে।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)ও চার হাজার অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে হেম্‌স পৌঁছে গেছেন। জীবনের ঝুঁকি বরণ করে নেওয়ার মতো সালার ছিলেন হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.)। তিনি পরামর্শ দিলেন, আমরা বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করব। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) ও অন্যান্য সালারগণ তাঁর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। ঠিক এমনি মুহূর্তে এখন সংবাদ এল, আমীরুল মুমিনীনের আদলে আল্লাহর মদদ আসছে। শুনে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) খুব খুশি হলেন এবং হালে পানি পেলেন, যাহোক, এবার বাইরে বের হয়ে লড়াই করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

আমীরুল মুমিনীনের এই দূত ফিরে গেলেন। এক দিন পর আরেক দূত এসে হাজির হলেন। এই দ্বিতীয় দূতের মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে বার্তা পাঠালেন, রোমানদের রণাঙ্গনে খবর ছড়িয়ে দিন, ইরাক থেকে মুসলমানদের জন্য সহযোগী বাহিনী এসে পড়েছে এবং বিপুলসংখ্যক সৈন্য আল-জাযিরার কাবায়েলি অঞ্চলগুলেতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর কাবায়েলিদের যে-বাহিনীটা হেরাক্‌লকে সাহায্য করতে গেছে, তাদের মাথায় এই ভীতি ঢুকিয়ে দিন যে, মুসলমানদের যে-বাহিনীটি আল-জাযিরা পৌঁছে গেছে, তারা ওখানকার বসতিগুলোকে তছনছ করে দেবে। যুক্তি দেখাবেন, এ সমস্ত অঞ্চল এখন মুসলমানদের অধীন। ফলে এই অঞ্চলের যারা রোমানদের সাহায্য করতে গেছে, তারা বিশ্বসঘাতক। এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসেবে মুসলমানরা তোমাদের বসতিগুলো গুড়িয়ে দেবে এবং পশুগুলোকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে।

এ ছিল একটি মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ-অভিযান, যেটি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) রোমান বাহিনী ও তাদের মিত্র কাবায়েলিদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছিলেন।

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) আগেই দশ-বারোজন মুজাহিদ কাবায়েলি সৈন্যদের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঠিয়ে রেখেছিলেন। এবার আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশনা পেয়ে আরও একজন মুজাহিদকে জরুরি নির্দেশনা দিয়ে রোমানদের রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিলেন।

* * *

এই দূত কাবায়েলি খ্রিস্টানের বেশে রওনা হয়ে গেলেন। তাকে হাদীদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে। অবশিষ্ট কাজ আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব হাদীদ ও তার সঙ্গীদের।

রোমান বাহিনী ও খ্রিস্টান কাবায়েলিরা পর্বতঘেরা অঞ্চলে এমনভাবে অবস্থান নিয়ে আছে, যেন হেম্‌স তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ। অথচ হেম্‌স থেকে তারা এখনও কয়েক মাইল দূরে। এই সমস্ত বাহিনী হেরাক্‌ল-এর আদেশে হেম্‌স অভিমুখে অগ্রযাত্রা করবে এবং হেম্‌স নগরী অবরোধ করবে।

সিপাহসালার আবু উবায়দার এই দূত ওখানে গিয়ে পৌঁছলে কাবায়েলিরা তাঁকে তাদেরই লোক মনে করে ছুটে এল এবং চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? ওখানকার পরিস্থিতি কী? তাদের বক্তব্য থেকে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল। তাতেই দূত ধরে নিলেন, এরা আগেই সংবাদ পেয়ে গেছে, মুসলমানরা আল-জাযিরার বসতিগুলোর উপর আক্রমণ করেছে এবং ওখানকার অবস্থা ভালো নয়।

দূত তাদের জানালেন, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। মুসলমানরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমাদের বসতিগুলো সব উজাড় করে দিচ্ছে। দূত তাদের মাঝে প্রবল একটা ভীতি ছড়িয়ে দিলেন। তারপর খুঁজতে-খুঁজতে হাদীদের কাছে চলে গেলেন। হাদীদও কাবায়েলিদের বেশ ধারণ করে আছে। দূত তাকে আবু উবায়দা (রা.)-এর বার্তা শোনালেন। হাদীদ বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং সিপাহসালারকে আশ্বস্ত করো, যে-মিশন ও পরিকল্পনা নিয়ে তিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন, তার বাস্তবায়ন আগে থেকেই চলছে। আল-জাযিরার আক্রমণ-অভিযানের সংবাদ খ্রিস্টানরা এখানে আগেই পৌঁছিয়ে দিয়েছে। ত্রিশ হাজার কাবায়েলি সৈন্যের সবাই জেনে গেছে, তাদের পেছনের খবর সুখকর নয়।

দূত ফিরে গেলেন। হাদীদ ও তার এই ক্ষুদ্র দলটি জ্বলন্ত আগুনে ভালোমতো তেল ঢাললেন এবং কাবায়েলিদের উপর চরম ত্রাস সৃষ্টি করে দিলেন। রণাঙ্গনে কাবায়েলিরা এক জায়গায় একত্রে ছিল না। তারা কয়েক মাইল দীর্ঘ স্থানে রোমানদের সঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। একটা গুজব কারও কানে ঢুকছে তো সেটা দাবানলের মতো মুহূর্তের মধ্যে রণাঙ্গনের সবখানে পৌঁছে যাচ্ছে। একজনও প্রাপ্ত সংবাদটার সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজন অনুভব করছে না। যখনই যে-কথাটা যার

কানে যাচ্ছে, সত্য বলে বিশ্বাস করে সে-ই তার প্রচারে নেমে পড়ছে।

কাবায়েলিরা আগে থেকেই রোমানদের প্রতি আস্থাহীন হয়ে আছে। রোমানদের ব্যাপারে তাদের অন্তরে যেসব সংশয়-সন্দেহ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, হাদীদ ও তার সঙ্গীরা তাকে আরও পাকাপোক্ত করে তুলেছে, যার ফলে সেসব সংশয়-সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসের রূপ ধারণ করেছে। তাদের মনে এই বিশ্বাসটি বদ্ধমূল করে তোলা হয়েছে, তোমরা যে-যুদ্ধ লড়তে এসেছ, এটি রোমানদের স্বার্থের লড়াই। তোমাদের জন্য এখানে শুধু ক্ষতি-ই ক্ষতি। এই কাবায়েলিরা এসেছিল নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কিন্তু এখন তারা সংবাদ পাচ্ছে, মুসলমান সৈন্যরা তাদের অঞ্চলের উপর আক্রমণ করে বসেছে। এমতাবস্থায় তাদের নেতাদের একটি প্রতিনিধিদল হেরাক্‌ল-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল। সম্রাট হেরাক্‌ল এসব সংবাদ আগেই পেয়েছেন। কাবায়েলি নেতারা বলল, আমরা আপনার যুদ্ধ লড়তে এসেছিলাম; কিন্তু এখন কিনা আমাদেরই অঞ্চলে মুসলমানরা হানা দিয়ে বসেছে।

হেরাক্‌ল অত্যন্ত সতর্ক ও চতুর মানুষ। ধূর্ত এতটা যে, কারও ধরবার জো ছিল না, লোকটা ধড়িবাজি করছে। তিনি কাবায়েলি নেতাদের বক্তব্য অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ও আন্তরিকতার সঙ্গে শুনলেন।

'আমার প্রিয় বন্ধুগণ!'– হেরাক্‌ল বললেন– 'তোমাদের ঘর-বাড়ি ও স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে আমি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করে থাকি। আমার মাথা সব সময় তোমাদের নিয়ে ভাবে। মুসলমানরা যদি তোমাদের এলাকায় এসেই পড়ে থাকে, তাতে তেমন কোনো প্রলয় ঘটে যায়নি। তাতে তোমাদের এতটা বিচলিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই। এখন আমি হেম্‌স আক্রমণে আর বিলম্ব করব না। আমরা যদি হেম্‌স নগরী মুসলমানদের থেকে নিয়ে নিতে পারি, তা হলে তাতেই তাদের কোমর ভেঙে যাবে। তারপর তোমরা দেখবে, মুসলমানদের যে-কজন সৈন্য তোমাদের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে, সবাই ওই অঞ্চল ত্যাগ করে এদিকে পালিয়ে আসছে। তোমরা আমার সঙ্গ দাও। তারপর দেখো, আমি মুসলমানদের কোন পরিণতিতে নিয়ে ঠেকাই।'

'আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না'– প্রতিনিধিদলের প্রধান বললেন– 'হেমস জয় হতে-হতে তত দিনে মুসলমানরা আমাদের বসতিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। আপনি যদি আমাদের সহযোগিতা ও ঐক্য কামনা করে থাকেন, তা হলে আগে আপনার বাহিনীকে আমাদের সঙ্গে আমাদের এলাকায় প্রেরণ করুন। আমরা ওখান থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দিয়ে তারপর এসে হেম্‌স আক্রমণ করব কিংবা আপনি যেখানে চাইবেন আমরা আপনার সঙ্গ দেব।'

হেরাক্‌ল এত কাঁচা মানুষ ছিলেন না যে, তিনি কাবায়েলিদের কথায় গলে যাবেন। তিনি তো তাদের নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার তালে ছিলেন। কাবায়েলিদের উদ্বেগ

অকারণ ছিল না। আগেও এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে, মুসলমানরা তাদের তিনটা বসতি গুড়িয়ে দিয়েছিল। তাতে তাদের অপরাধ ছিল, তখনও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমানদের সঙ্গ দিয়েছিল। কাবায়েলিদের এই তথ্যও জানা ছিল, হেরাক্‌ল হেম্‌স আক্রমণ মুলতবি করতে যাচ্ছেন। কিন্তু মুসলমানরা এমন একটি জাতি যে, কোনো প্রত্যয়-পরিকল্পনা থেকে পিছুহটা তারা জানে না। তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে অভিযান শুরু করে আর সামনের দিকে এগিয়ে যায়— পলকের জন্যও পেছনের দিকে তাকায় না।

হেরাক্‌ল চাচ্ছিলেন, কাবায়েলিরা তার সঙ্গে থাকুক আর তিনি তাদের নিয়ে হেম্‌স আক্রমণ করবেন। কিন্তু কাবায়েলিরা দাবি তুলল, আপনি আমাদেরকে আপনার বাহিনী দিন; আমরা আগে আমাদের অঞ্চল থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে আসি।

হেরাক্‌ল অত্যন্ত মমতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলে তাদের নিজের মতে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাবায়েলিরা কোনোমতেই সম্মত হলো না। এই আলোচনা কোনো ফলাফল ছাড়াই শেষ হয়ে গেল।

'আমার একটি কথা শুনে রাখো'— 'হেরাক্‌ল কণ্ঠের সুর পরিবর্তন করে ঝাঁজের সঙ্গে বললেন— 'যাকে তোমরা নিজেদের অঞ্চল বলছ, সেটি তোমাদের এলাকা নয়। এই অঞ্চলের অধিপতি তিনি, যিনি এই দেশটি জয় করেছেন। তোমরা ইতিপূর্বে আমার করতলগত ছিলে। এখন মুসলমানরা সেখানে হানা দিয়েছে। কাজেই তোমরা এখন স্বাধীন নও। তোমাদের মাঝে যদি আত্মমর্যাদাবোধ ও সাহস থাকে, তা হলে তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করো। তারা এইমাত্র নতুন এসেছে। এখনও তারা ওখানকার ব্যবস্থাপনা গুছিয়ে উঠতে পারেনি। তোমরা এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে স্বার্থ উদ্ধার করো এবং বিদ্রোহী হয়ে যাও।

কাবায়েলি নেতারা হেরাক্‌ল-এর দরবার থেকে ফিরে এল। তারা সম্রাট হেরাক্‌ল-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে বাজিন্তিয়া গিয়েছিল, যেটি কিনা রণাঙ্গন থেকে বেশ দূরে ছিল। রণাঙ্গনে ফিরে আসতে তাদের গোটা দিন ও অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। রণাঙ্গনে পৌঁছে তারা জানতে পারল, তাদের অধিকাংশ লোক এখান থেকে বিদায় নিয়ে আপন-আপন এলাকায় চলে গেছে। অগত্যা এই নেতারাও গাঁটরি-বোচকা গোল করে রওনা হয়ে গেল। তারা এই তথ্যও পেল যে, ওরা তাদের মেয়েগুলোকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

* * *

একদিন প্রত্যুষে আযানের শব্দে সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর ঘুম ভাঙল। তিনি ফজর নামাযের জন্য শয্যা ত্যাগ করে উঠলেন। এমন সময় প্রহরী তাঁকে সংবাদ জানাল, হাদীদ ইবনে মুমিন তার সঙ্গীদের নিয়ে এসেছেন। তিনি কথাটা

যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। মনে হলো, যেন তিনি ভুল শুনেছেন। হাদীদ সহকর্মীদের নিয়ে এভাবে হঠাৎ চলে আসবে, এমনটা তার প্রত্যাশা ছিল না। তিনি খানিক বিচলিত হয়ে উঠলেন, কী ব্যাপার, রোমানরা তাদের আসল রূপ ধরে ফেলল নাকি! হয়তবা দু-চারজন ধরা খেয়েছে আর বাকিরা পালিয়ে এসেছে! হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাদের ডেকে পাঠানোর পরিবর্তে নিজেই বাইরে ছুটে গেলেন। দেখলেন, হাদীদের ওষ্ঠাধরে মিটিমিটি হাসি এবং তার দলের সবকজন সদস্য প্রসন্ন মনে উপস্থিত। সকলেরই মুখাবয়বে খুশির আভা।

'তোমরা সবাই এসে পড়েছ; ব্যাপারটা কী বলো তো?' আবু উবায়দা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'কারণ, ত্রিশ হাজার কাবায়েলির বাহিনীটা ফিরে গেছে।' হাদীদ স্মিত হেসে উত্তর দিলেন।

'কোথায়?'

যেখান থেকে ওরা এসেছিল' –হাদীদ উত্তর দিলেন– 'আমাদের কিছু সফলতা তাদের মাঝে অস্থিরতা ও অনাস্থা ছড়িয়ে দিয়েছিল। আর বাকিটুকু সম্পন্ন করেছে সেসব তথ্য ও সংবাদ, যেগুলো তাদের অঞ্চল থেকে এসেছিল যে, মুসলমানরা এসে পড়েছে। আমরা গুজব ছড়িয়েছি, প্রজ্বলমান আগুনে তেল ঢেলেছি। অবশেষে কাবায়েলিরা রোমানদের ছেড়ে চলে গেছে।'

কাবায়েলিরা কীভাবে হেরাক্‌ল-এর প্রতি বিতৃষ্ণ ও বীতশ্রদ্ধ হলো এবং শেষমেশ কীভাবে তারা হেরাক্‌ল-এর সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেলো, হাদীদ ও তার সঙ্গীরা সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)কে তার ইতিবৃত্ত শোনালেন। বিস্তারিত বিবরণ শুনে হযরত আবু উবায়দা (রা.) দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন, এসব সেই আল্লাহর রহমত ও বরকত, যাঁর নাম নিয়ে আমরা এখানে এসেছি এবং যাঁর নামে আমরা নিজেদের জীবনগুলোকে ওয়াক্‌ফ করে রেখেছি।

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) ও এরা সবাই নামায আদায়ের জন্য চলে গেলেন। সেযুগে যুদ্ধের ময়দানে প্রধান সেনাপতি নামাযের ইমামত করতেন। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) নামায পড়ালেন। নামাযের সালাম ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের উদ্দেশ করে বললেন, কেউ যাবেন না; জরুরি কথা আছে।

'আজকের সকাল আমাদের জন্য অনেক বড় এক সুসংবাদ নিয়ে উদিত হয়েছে'– হযরত আবু উবায়দা (রা.) উচ্চ কণ্ঠে বললেন । সঙ্গে-সঙ্গে কয়েক হাজার মুজাহিদের এই বিশাল মজলিস নিস্তব্ধতার চাদরে আবৃত হয়ে গেল। সবাই উন্মুখ চোখে কান খাড়া করে সিপাহসালারের পানে তাকিয়ে থাকলেন– 'ত্রিশ হাজার খ্রিস্টান কাবায়েলি সৈন্য রোমানদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ফিরে গেছে। এটি

আমাদের জন্য মহান আল্লাহর বিরাট এক গায়েবি মদদ। পবিত্র কুরআনের সূরা যুমারে আল্লাহপাক বলেছেন, যারা শয়তান থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর অভিমুখী হয়, তাদের জন্য সুসংবাদ আছে। এই আয়াতে আল্লাহপাক তাঁর রাসূলের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, তুমি আমার সেই বান্দাদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, যারা আমার কথা মান্য করে, আমার দেখানো পথে চলে, আমি তাদের সঠিক পথটি দেখিয়ে দেই। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহপাক যাদের সুসংবাদ শুনিয়েছেন, সেই লোকগুলো হলে তোমরা। আল-জাযিরার কাবায়েলিদের ত্রিশ হাজার সৈন্য আমাদের জন্য বিরাট এক সমস্যা ও বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে এখন তারা সম্রাট হেরাক্‌ল-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে রোমানদের ত্যাগ করে চলে গেছে। পেছনে রয়ে গেছে রোমানদের অল্পকিছু সৈনিক, যারা তোমাদের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। এদের মাঝে এতটুকু দম নেই যে, তোমাদের সম্মুখে এসে এক দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।'

'নারায়ে তাকবীর।' কে একজন শরীরের সবটুকু শক্তি একত্র করে উচ্চ আওয়াজে তাকবীরধ্বনি দিয়ে উঠল আর সেইসঙ্গে হেম্‌সের আকাশ ও মাটি 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির কানফাটা বিস্ফোরণে থরথর করে কেঁপে উঠল। এই তাকবীরধ্বনি উচ্চারণকারী লোকটি হলেন হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.), যিনি সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর সাহায্যার্থে কানসারিন থেকে এসে হেম্‌সে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) দুর্গের বাইরে গিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন; কিন্তু আবু উবায়দা (রা.) ও অন্যান্য সালারগণ তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। এবার তিনি বাইরে বের হয়ে উন্মুক্ত ময়দানে রোমানদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করার সুযোগ পেয়ে গেলেন।

'ইসলামের সৈনিকগণ!'– আবু উবায়দা (রা.) অতিশয় জ্বালাময়ী কণ্ঠে বললেন– 'ইনশাআল্লাহ এই লড়াই শামের শেষ লড়াই হবে। ইরাকের মাটি যেভাবে যরতুশ্‌তের পূজারিদের থেকে পবিত্রতা লাভ করেছে, তেমনি শাম থেকেও রোমানরা চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হয়ে যাবে। এই ভূখণ্ডটিও পবিত্র হয়ে যাবে। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে বলা আবশ্যক মনে করি, এই দেশটি আমরা এজন্য জয় করিনি যে, আমরা এখানে আমাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করব। একথাটিও মনে রাখুন, একটি দেশ জয় করা পর্যন্তই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। বরং আসল কাজ তার পর থেকে শুরু হয়। সেই কাজটি হলো, মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করা। তাদের অন্তর থেকে গোলামির অনুভূতিকে দূর করে দিয়ে তাদের সেই মর্যাদার আসনে বসানো, যা আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন। কিন্তু এখনই যেন আমরা নিজেদের বিজয়ী মনে না করি। কেননা, শত্রু এখনও এখানে বিদ্যমান আছে। দুশমন যতক্ষণ-না নিজেদের রক্তসাগরে ডুবে যাবে, যতক্ষণ-না তারা নিজেদের ঘোড়ার উড়ানো ধূলিতে গুম হয়ে যাবে, ততক্ষণ অবধি আমরা আমাদের

বিজয়ী ভাবতে পারব না। আল্লাহ্ তাঁর অপার করুণায় আমাদের শত্রুদের ত্রিশ হাজার সৈন্য থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। আমি নিশ্চয়তা পেয়েছি, তাঁর মহান সত্তা আমাদের সঙ্গে আছে। আমীরুল মুমিনীনও সহযোগী বাহিনী নিয়ে আসছেন। কা'কা' ইবনে আমর আমাদের সাহায্যে চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছার কথা আছে। এখন আপনারা বিলম্ব না করে আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। জরুরি নির্দেশনা ও বাদ বাকি কথা সালারগণ বলবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন।'

মুজাহিদীনে ইসলামের এই বাহিনীটির মানসিক ও দৈহিক অবস্থা এমন হয়ে গেল, যেন তাঁদের মাঝে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করা হয়েছে। সাহস ও মনোবল হারাবার মতো মানুষ তাঁরা ছিলেন না। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারাই তারা প্রতিটি ময়দান জয় করেছেন এবং নিজেদের চেয়ে কয়েক গুণ অধিক শক্তির অধিকারী শত্রুপক্ষকে কুপোকাত করেছেন। কিন্তু এখানে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, খোদ সিপাহসালারের চেহারায়ও উৎকণ্ঠার ভাব ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। তিনি দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে লড়াই করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এখন তার মুখজুড়ে আনন্দের দীপ্তি জ্বলজ্বল করছে।

সিপাহসালার হযরত আবু উবায়দা ও হযরত খালিদ ইবনে অলীদ আক্রমণের পরিকল্পনা ঠিক করে নিলেন এবং বাহিনীকে অনতিবিলম্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন।

* * *

বাজিন্তিয়ায় হেরাক্ল-এর রাজঘরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সম্রাট হেরাক্ল খ্রিস্টান কাবায়েলিদের ধরে রাখতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তার নিজস্ব যে-গোয়েন্দা ব্যবস্থাটি ছিল, তাদের থেকে তিনি আপন বাহিনীর ব্যাপারে চরম হতাশাজনক রিপোর্ট পাচ্ছিলেন। কাবায়েলিদের চলে যাওয়ায় হেরাক্ল নিজে অতটা নিরাশ হননি, যতটা নিরাশা ছেয়ে গেছে তার বাহিনীর মাঝে। হতাশ তো তাদের হওয়ারই কথা ছিল। ফৌজের যে-কজন সৈনিক তখন বাজিন্তিয়ায় অবস্থান করছিল, তারা ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী সম্রাট হেরাক্ল-এর অবশিষ্ট সৈন্য। এই সেনারা তাদের হাজার-হাজার সহযোদ্ধাকে মুসলমানদের হাতে কর্তিত হতে ও প্রাণ হারাতে দেখেছে। তারা এমনও দেখেছে, তাদের অশ্বারোহী সৈন্যরা পদাতিক সৈন্যদের দলে-পিষে পিছপা হয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেছে।

তিনজন ঐতিহাসিকের ভাষ্যমতে সে-সময় পর্যন্ত শামের যুদ্ধে হেরাক্ল-এর প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল। আহতদের তো কোনো সংখ্যাই ছিল না। আঘাত-জখম থেকে নিরাপদ যে-কটা ঘোড়া মুসলমানদের হাতে এসেছিল, তার সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার।

হেরাক্‌ল তার পুত্র কুস্তুন্তিনের সঙ্গে সেই স্থানে গেলেন, যেখান তার এই বাহিনী অবস্থানরত এবং যেখান থেকে হেম্‌স নগরী অবরোধ করার পরিকল্পনা আছে। এই বাহিনী দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। তাদের একস্থানে সমবেত করা হলো। সম্রাট হেরাক্‌ল তাদের মনোবল চাঙ্গা করার লক্ষ্যে অত্যন্ত জোরালো ও জ্বালাময়ী এক ভাষণ প্রদান করলেন। কিন্তু তিনি লক্ষ করলেন, তার সৈনিকদের মাঝে কোনো চেতনা নেই। তারা এমনিতেই নির্জীবের মতো চুপচাপ শুনে যাচ্ছে. যেন ওরা কতগুলো জড়পদার্থ সামনে বসে আছে। এরাই সেই ফৌজ, যারা সম্রাট হেরাক্‌লকে কাছে পেলে স্লোগানে-স্লোগানে আকাশ-পাতাল মুখরিত করে তুলত। কিন্তু আজ তাদের অবস্থা হলো, হেরাক্‌ল যতই তোজোময় কথা বলছেন, তার এই সৈন্যরা ততই নিষ্প্রাণ হয়ে চলছে, যেন কতগুলো মৃতকল্প মানুষ ধীরে-ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। গতানুগতিক নিয়ম হিসেবেও একজন সৈনিকও 'সম্রাট হেরাক্‌ল জিন্দাবাদ' বলে স্লোগান তুলল না।

সম্রাট হেরাক্‌ল বিনাযুদ্ধে পিছপা হতে চাচ্ছিলেন না। তাই এই নিষ্পাণ বাহিনীর মাঝে প্রাণ সঞ্চারের জন্য আরেকটা অস্ত্র পরীক্ষা করলেন।

'তোমরা রোমের সিংহ'– হেরাক্‌ল তার বাহুদুটো উঁচু করে শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে বললেন– 'তোমরা রোমের সম্মান ও সম্ভ্রমের মোহাফেয। তোমরা এই দেশটির উপর শাসন করেছ। সুপুরুষরা তাদের মালিকানা ও রাজত্ব সহজে শত্রুর হাতে তুলে দেয় না। তোমরা যদি এই ময়দানে জমে যাও, পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে যাও, তা হলে শাম ফের তোমাদের হবে। আমার গোয়েন্দারা তথ্য জানিয়েছে, মুসলমানরা হেম্‌সের বাইরে এসে আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে। আমিও এটিই চাচ্ছিলাম যে, তারা দুর্গঘেরা নগরীর প্রাচীরের বাইরে বেরিয়ে আসুক। আমার পুরোপুরি নিশ্চয়তা আছে, তখন তোমরা তাদের পালাতে দেবে না– মেরে-কেটে সর্বশান্ত করে দেবে। আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তোমাদের প্রতিজন সৈনিককে আমি খাঁটি সোনার একটা করে চাকা উপহার দেব। আর যারা অধিক বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করবে, তাদের আলাদাভাবে পুরস্কৃত করব। তবে একথাটিও শুনে রাখো, যদি কেউ কাপুরুষতা প্রদর্শন কর আর রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যাও, তা হলে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারব। পুরস্কারদানে আমি এতটা উদারতার পরিচয় দেব যে, তোমরা বিস্ময়ে থ বনে যাবে।

বিচার-বুদ্ধিরহিত এই বাহিনীর মাঝে এবার কিছুটা চাঞ্চল্য পরিদৃশ্য হতে শুরু করল এবং সৈনিকরা একজন আরেকজনের পানে তাকাল, যেন তারা হেরাক্‌লকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। এরা বেতনভোগী সৈনিক। যেকোনো সৈনিকের সামনে দুটি জিনিস বিবেচ্য থাকে– দুটি বস্তুর দিকে তাকিয়ে তারা জীবনের ঝুঁকি বরণ করে সামনের দিকে এগোয়। একটি হলো বেতন-ভাতা, দ্বিতীয়টি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। এই বাহিনী

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কোথা থেকে পাবে! এরা তো সকল ময়দানের পরাজিত সৈনিক। জীবনে রক্ষা পাওয়াই ছিল এদের জন্য অনেক বড় গনিমত।

হেরাক্‌ল-এর বক্তব্যে জোশ বেড়েই চলছিল। তিনি দেখতে পেলেন, সৈনিকদের মাঝে কিছুটা চঞ্চলতা সৃষ্টি হয়েছে। এবার তিনি বললেন, হেম্‌স সোনা-রুপার ভাণ্ডারের শহর। এই নগরীটা তোমরা জয় করে নাও। এর ধনভাণ্ডারের মালিক তোমরাই হবে। এখানকার গনিমত এত বেশি, এত মূল্যবান যে, দেখে তোমরা অবাক্ হয়ে যাবে। এই শহরে সুন্দরী মেয়েদের সংখ্যা এত বেশি যে, তোমাদের প্রতিজন সৈনিকের ভাগে একজনের কম পড়বে না। আর যে-সৈনিক যে-মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, সে তারই থাকবে।

এবার পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল, এই রোমান বাহিনীর মাঝে জীবন ফিরে এসেছে। হেরাক্‌ল বাহিনীকে তথ্য জানালেন, হেম্‌সে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা খুবই নগণ্য, যারা এক দিনের বেশি তোমাদের সঙ্গে টিকতে পারবে না।

দু-তিনজন সেনাপতি ফৌজের পেছনে ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিল। যাদের একজন এন্থুনিস, যার পার্শ্বে আরেক ঘোড়ায় আরেক অশ্বারোহী। এই লোকটা ইউকেলিস। হেরাক্‌ল ইউকেলিসের মাকে বলেছিলেন, আমি তোমার পুত্রকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি। কিন্তু এর জন্য তার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। ইউকেলিসের মা তো খুব খুশি হয়েছিল। কিন্তু মা-পুত্র জানতে পারেনি, হেরাক্‌ল ও তার অপর পুত্র কুস্তন্তিন এই ব্যবস্থাটা ইউকেলিসকে মারবার জন্য করেছিল। সম্রাট হেরাক্‌ল বেশ কদিন আগেই ইউকেলিসকে এন্থুনিসের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, একে রণাঙ্গনে নিয়ে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দাও।

ইউকেলিসকে এভাবে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সেনাপতি এন্থুনিসকে অনবহিত রাখা হয়েছিল। হেরাক্‌ল তাকে বলেছিলেন, ইউকেলিসকে রণাঙ্গনে যুদ্ধের সময় তোমার সঙ্গেই রাখবে না; কিছু সময়ের জন্য একে যুদ্ধ করার জন্য সাধারণ সৈনিকদের মাঝে ঢুকিয়ে দেবে।

ইউকেলিসকে হত্যা করার দায়িত্ব দুজন কমান্ডারের হাতে অর্পণ করা হলো। হেরাক্‌ল তাদের বলে দিলেন, তোমরা ইউকেলিসের উপর চোখ রাখবে। ঘোরতর লড়াইয়ের সময় যখনই সে খানিক আলাদা হয়ে যাবে, তখন তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলবে। পরে প্রচার করে দেবে, ইউকেলিস যুদ্ধে শত্রুর হাতে প্রাণ হারিয়েছে। সম্রাট হেরাক্‌ল এই কমান্ডারদ্বয়কে বলে দিলেন, এই হত্যার ঘটনা যেন এন্থুনিসের সামনে না ঘটে।

ইউকেলিস এ-ই প্রথমবার রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছে। তরবারিচালনা ও বর্শানিক্ষেপে তার বেশ দক্ষতা আছে। বাহু তার একটা। আরেকটা অচল। কিন্তু এক হাতে তরবারিচালনা ও বর্শাবাজিতে এতটাই সক্ষমতা ও পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে যে,

দর্শকরা থ বনে যায়। এখন যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়ে সে বেজায় উৎফুল্ল।

সম্রাট হেরাক্ল ভাষণ শেষ করলেন। ফৌজ এখনও ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। হেরাক্ল ঘোড়ায় চড়ে বাহিনী পরিদর্শনে চলে গেলেন। কুস্তুন্তিন তাঁর সঙ্গে আরেক ঘোড়ায় সাওয়ার।

'ইউকেলিসকে আর বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না'– কুস্তুন্তিন হেরাকলকে বলল– 'আপনি কি এখনও অনুমান করতে পারেননি তার অপরাধ কতখানি গুরুতর? ত্রিশ হাজার কাবায়েলি সৈন্যের এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পেছনে তারও বেশ হাত আছে। আমার বিরুদ্ধে তাদের এতটাই উত্তেজিত করে তোলা হয়েছিল যে, আমার মনে আশঙ্কা জন্মে গিয়েছিল, যুদ্ধের সময় এই বাহিনী আমার কমান্ড মান্য করবে না।'

'আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল আছি'– হেরাক্ল বললেন– 'ওকে আমি বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছি। এই চিন্তা বাদ দিয়ে তুমি ভাবো, মুসলমানরা আক্রমণ করে বসলে এই ফৌজকে কীভাবে তাদের মোকাবেলায় ব্যবহার করবে।'

কুস্তুন্তিন পিতাকে নিশ্চয়তা দিল, এই বাহিনীকে আমি অত্যন্ত কার্যকর ও সুফলদায়ক পদ্ধতিতে লড়াব এবং নিজেও জীবনের বাজি লাগাব।

পিতা-পুত্র কথা বলতে-বলতে ইউকেলিস ও এন্থনিসের কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং ঘোড়াদুটো থেমে গেল। হেরাক্ল ইউকেলিসের পিঠে চাপড় মেরে অতিশয় মমতার সঙ্গে তাকে সাহস জোগালেন এবং বললেন, এই যুদ্ধের পর তুমি সেনাপতি হবে।

* * *

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)কে ইরাকে বার্তা পাঠালেন, কা'কা' ইবনে আমরকে চার হাজার সৈন্য দিয়ে অনতিবিলম্বে হেম্স রওনা করিয়ে দাও। তাকে বলে দিয়ো, যথাসম্ভব অল্প বিরতি দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি যেন গন্তব্যে পৌঁছে যায়। কা'কা' (রা.) ইতিপূর্বে ইরানসম্রাট কেসরার বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছেন এবং তাদের পরাজিত করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। দ্রুতগামিতায় তিনি এমনিতেই বেশ প্রশিদ্ধ ছিলেন। এখনও তিনি অতিশয় দ্রুততার সঙ্গে হেম্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দূরত্ব এতই অধিক যে, এখনও গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হননি।

হেম্সে সিপাহসালার হযরত আবু উবায়দা (রা.) সংবাদ পেয়ে গেছেন, কা'কা' ইবনে আমর চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আসছেন। কিন্তু তিনি তাঁর অপেক্ষা করলেন না। কারণ, তিনি হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রোমানদের এই বাহিনীআর উপর এখনই আক্রমণ করা হবে। এই দুই সেনাপতি চিন্তা করেছেন, এই রোমান বাহিনী ও খোদ সম্রাট হেরাক্ল বর্তমানে মর্মবেদনা ও হতাশায় ভুগছেন যে, তারা ত্রিশ হাজার কাবায়েলি

সৈন্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছেন। তারা আরও চিন্তা করেছেন, এই বাহিনীকে এতটা সময় দেওয়া যাবে না, যাতে তারা বাজিন্তিয়া গিয়ে দুর্গে ঢুকে যেতে পারে। অবরোধের যুদ্ধ দীর্ঘই হয়ে থাকে।

হেরাক্‌ল-এর বাহিনী যে-অঞ্চলে অবস্থান নিয়ে আছে, সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) সেই অঞ্চল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তিনি হাদীদকে ডেকে পাঠালেন। হাদীদ উক্ত অঞ্চলে থেকে এসেছেন। সেজন্য ওখানকার খুঁটিনাটি তার জানা আছে। কোথায় কী আছে, কোন জায়গাটা কেমন সবই তাঁর জানা। তিনি সিপাহসালকে ভূমিটা সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন।

এলাকাটা উন্মুক্ত ময়দান নয়– পর্বতময় ও বনময়। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) সে অনুপাতেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। তারপর সেদিনই অগ্রযাত্রার আদেশ জারি করলেন। হাদীদ তাঁর দু-তিনজন সঙ্গীসহ গাইড হিসেবে অগ্রবাহিনীর সঙ্গে রওনা হলেন। ওদিকে হেরাক্‌ল ও কুস্তুন্তিন এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি, বাহিনীকে এখানেই থাকতে দেবেন, নাকি বাজিন্তিয়া ডেকে নিয়ে দুর্গবন্দ হয়ে যাবেন। মুসলমানরা অগ্রযাত্রা করবে, নাকি হেম্‌সে অবস্থান করেই রোমানদের আক্রমণের অপেক্ষা করবে, এ-ব্যাপারে হেরাক্‌ল কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কি-না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ইতিহাস থেকে এটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, হেরাক্‌ল শোচনীয়রূপে ত্রস্ত ছিলেন এবং চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। অবশ্য তিনি তার বাহিনীকে সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর কামনা ছিল, তিনি আকস্মিকভাবে গিয়ে রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু গিয়ে তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পাবেন এমন আশা তাঁর ছিল না। কারণ, হেম্‌সেও হেরাক্‌ল-এর গোয়েন্দা ও সংবাদদাতা ছিল।

আবু উবায়দা (রা.) তাঁর বাহিনীকে তিনভাগে বিভক্ত করে নিলেন। এক ভাগ সোজাসুজি যাবে। অবশিষ্ট দুই ভাগের এক ভাগ ডান দিক দিয়ে আর অপর ভাগ বাঁ দিক দিয়ে বেশ দূর পথে রওনা হবে। এই কৌশল অবলম্বন করে তিনি দুশমনকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন, আক্রমণকারী বাহিনী এটিই, যারা সামনের দিক থেকে আসছে।

আবু উবায়দা (রা.) নিজে এই মধ্যবাহিনীতে থাকলেন। এই অংশের অগ্রযাত্রার গতি মন্থর রাখা হয়েছে, যাতে ডান ও বাম অংশ আপন-আপন স্থানে পৌঁছে গিয়ে সম্মুখ থেকে আক্রমণ চালাতে পারে। এদের বলে দেওয়া হয়েছে, তোমরা অনেক দূরপথ ঘুরে অগ্রসর হবে।

দূরত্ব এত বেশি ছিল না যে, যেতে-যেতে দিনই কেটে যাবে। ফজর নামাযের পর রওনা-হওয়া-বাহিনী যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপনীত হলো, তখন সবে সূর্য মাথার

উপর উঠছে। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর ইউনিট পার্বত্য এলাকা থেকে বের হয়ে যখন সেই মুক্ত মাঠে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন দেখতে পেলেন, শত্রুবাহিনী যুদ্ধের বিন্যাসে দাঁড়িয়ে আছে। তাতেই পরিষ্কার বোঝা গেল, সম্রাট হেরাক্‌ল তথ্য আগেই পেয়ে গেছেন। হেরাক্‌ল নিজে ময়দানে ছিলেন। কমান্ড তার পুত্র কুস্তুন্তিনের হাতে। মুসলিম বাহিনীকে দেখামাত্র সে অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে তার সৈনিকদের উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়ল, ওই দেখো, তোমাদের শত্রুরা সংখ্যায় কত অল্প। তোমরা অতি অনায়াসে তাদের কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে পারবে। সেইসঙ্গে কুস্তুন্তিন তার বাহিনীকে ডানে-বাঁয়ে আরও ছড়িয়ে দিল।

সে-যুগে নিয়ম ছিল, যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে উভয় পক্ষ থেকে এক পক্ষ অপর পক্ষকে হুঙ্কার দিত, তোমাদের মাঝে কোনো বীর-বাহাদুর থাকলে বেরিয়ে এস। এভাবে উভয় পক্ষের দুজন সৈনিক দল থেকে বেরিয়ে মধ্যখানে দাঁড়িয়ে একে অপরের মোকাবেলা করত। তারপর দুজনের একজন মারা না যাওয়া পর্যন্ত এই দ্বৈত লড়াই অব্যাহত থাকত। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) এরূপ কয়েকটি মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং এই দ্বৈত লড়াইয়ে তিনি রোমানদের বেশ কজন সেনাপতিকে হত্যা করেছেন। কিন্তু এখানে এই চিরাচরিত রীতির ব্যত্যয় ঘটল। এখানে এমন কোনো মোকাবেলা হলো না। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) মুখোমুখি গণযুদ্ধের আদেশ ঘোষণা করে দিলেন। মুজাহিদগণ আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে আকাশ-পাতাল মুখরিত করে প্রবল জোশ ও জযবার সাথে শত্রুর দিকে এগোতে শুরু করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে উভয় পক্ষ ঘোরতর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

রোমানদের সেনাপতি এস্থনিস ইউকেলিসকে নিয়ে এক পার্শ্বর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে ইউকেলিসকে প্রতিটি বিষয় এমনভাবে বোঝাতে থাকল, যেমনটি শিক্ষক ছাত্রকে বোঝান। যেহেতু সে সেনা-অধিনায়ক, তাই সাধারণ সৈনিকের মতো লড়াই করছিল না। বরং সে যুদ্ধ করাচ্ছিল। তার ও ইউকেলিসের হাতে তরবারি ছিল এবং ঘোরতর লড়াই তাদের পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। ইউকেলিস সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাচ্ছিল; কিন্তু এস্থনিস তাকে এগোতে দিচ্ছিল না। সে ইউকেলিসকে যুদ্ধের কৌশল ও মার-প্যাঁচ শিক্ষা দিচ্ছিল।

রোমান ফৌজ অটলপায়ে লড়াই করছিল। তারা মূলত হতাশাগ্রস্ত ও সাহসহারা সৈনিক ছিল। মুসলমানদের ভীতি আগে থেকেই তাদের অন্তরে চেপে ছিল। এভাবে বীরত্বের সঙ্গে তারা লড়াই করবে, এমনটি প্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু সম্ভবত এই ভেবে তারা অটল হয়ে গেছে যে, মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য; এই অল্প কজন সৈনিককে পিষে মারতে সময় লাগবে না। কুস্তুন্তিন তার এই বাহিনীটাকে বেশ চমৎকার ও সুনিপুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল এবং ফৌজকে ডানে-বাঁয়ে এমনভাবে

ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছিল, যাতে পার্শ্বগুলো থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা যায়।

সেই অনুসারে সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) মুজাহিদদেরও ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। এভাবে চরম ঘোরতর এই যুদ্ধ সেখান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল, যেখানে এন্থনিস ও ইউকেলিস অবস্থান করছিল। এন্থনিস যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল এবং ইউকেলিস থেকে তার মনোনিবেশ সরে গেল। সে দেখতে পেল না, ইউকেলিস যৌবনের জোশে ভুলে গেছে, আমি সেনাপতি না হলেও সেনাপতি পদমর্যাদার মানুষ। সে তরবারিচালনার যোগ্যতা পরীক্ষা করতে চাচ্ছিল। সেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

ইউকেলিস এক হাতে লড়াই করছিল এবং ঘোড়ার লাগাম মুখে ঢুকিয়ে দাঁত দ্বারা শক্ত করে চেপে রেখেছিল। এটিই তার কৃতিত্ব যে, একহাতি মানুষ হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধও করছিল আবার ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণও ঠিক রাখছিল।

এন্থনিস ডানে-বাঁয়ে তাকাল; কিন্তু ইউকেলিসকে ধারে-কাছে কোথাও দেখল না। ইউকেলিস তার সঙ্গে নেই। এন্থনিস বিচলিত হয়ে উঠল। এতটা উৎকণ্ঠিত হলো যে, যুদ্ধের কথা ভুলেই গেল। সে ইউকেলিসকে খুঁজতে শুরু করল। অবশ্য অল্পতেই তাকে পাওয়া গেল। এন্থনিস তার পানে ঘোড়া হাঁকাল। সে দেখতে পেল, দুজন মুসলমান অশ্বারোহী দু-তিনজন রোমান সৈন্যকে ধাওয়া করতে গিয়ে ইউকেলিসের পাশ দিয়ে চলে গেছে। ইউকেলিস তার ঘোড়াটা ওদের পেছনে হাঁকিয়ে দিল। এন্থনিস তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে তাকে থামাতে চাইল। ইউকেলিসকে সে নিজের সঙ্গে রাখতে চাচ্ছিল। এন্থনিস দেখল, দুজন রোমান অশ্বারোহী ইউকেলিসের পেছনে-পেছনে ছুটে চলছে।

এন্থনিস একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেল। দেখল, কুস্তুন্তিন হঠাৎ এদিকে এসে পড়েছে। সে একস্থানে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। এ-সময়ে এভাবে তো তার এখানে আসবার কথা নয়! এই সময়ে তার ফৌজের পেছনে বা মধ্যখানে কোথাও থাকবার কথা! তার সঙ্গে আছে একজন অশ্বারোহী পতাকাবাহী আর মাত্র দুজন রক্ষীসেনা। কুস্তুন্তিন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ইউকেলিসের মুসলমান অশ্বারোহীদের ধাওয়া করা দেখছিল।

এক রোমান অশ্বারোহী ইউকেলিসের কাছে পৌঁছে গেল এবং এমনভাবে তরবারি উঁচু করল, যেন সে ইউকেলিসকে হত্যা করতে চাইছে। এন্থনিস তাদের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। সে যখন দেখতে পেল, নিজেদেরই এক সৈনিক ইউকেলিসকে হত্যা করতে উদ্যত, তখন সে তরবারি উঁচু করে ঘোড়ার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। কাছাকাছি গিয়ে তরবারিটা উক্ত রোমান অশ্বারোহীর পিঠে এমনভাবে গেঁথে দিল, যেভাবে বর্শা নিক্ষেপ করা হয়।

আরেক রোমান অশ্বারোহী ইউকেলিসের ঘোড়ার অপর পার্শ্বে ছিল। কিন্তু ছিল খানিক সম্মুখে। এস্থনিস দেখল, এই লোকটা তার ঘোড়াটা ইউকেলিসের ঘোড়ার কাছে এনে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, এও ইউকেলিসকে হত্যা করতে চাইছে।

এস্থনিস নিজের ঘোড়াটা তার দিকে ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু রোমান অশ্বারোহী তাকে দেখতে পেল না। কারণ, তার মনোযোগ সবটুকুই ইউকেলিসের প্রতি নিবদ্ধ। অন্য কোনো দিকে তার কোনোই খেয়াল নেই। এস্থনিস তার বাঁ কাঁধের উপর এমন এক জোরদার আঘাত হানল যে, তার বাহুটা দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল। তরবারি তার হাতেই ছিল। এস্থনিস ইউকেলিসকে সঙ্গে করে অন্য এক দিকে নিয়ে গেল।

কুস্তন্তিন এই কার্যকলাপ দেখল কি, দেখল না এস্থনিস তার কোনোই পরোয়া করল না। এটা সাধারণ কোনো অপরাধ ছিল না যে, সে যুদ্ধের মাঠে নিজেদেরই দুজন সৈনিককে হত্যা করে ফেলেছে।

কুস্তন্তিন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এস্থনিসের এই কর্মকাণ্ড সবই প্রত্যক্ষ্য করল। শেষে মোড় ঘুরিয়ে ওখান থেকে চলে গেল।

'আপনি আমাদেরই দুজন সৈনিককে হত্যা করে ফেললেন?' ইউকেলিস বিস্মিত কণ্ঠে এস্থনিসকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি যদি ওদের দেখে না ফেলতাম, তা হলে ওরা তোমাকে হত্যা করে ফেলেছিল!'– এস্থনিস বলল– 'এখন আর আমার থেকে আলাদা হয়ো না।'

'আমাকে খুলে বলুন তো ব্যাপারটা আসলে কী? ঘটনাটা আসলে কী ঘটল?'– ইউকেলিস জানতে চাইল– 'আমি তো যুদ্ধ করতে এসেছিলাম। আমি আমার পিতা ও ভাইকে দেখাতে চেয়েছিলাম, চোখের দেখায় আমি অপূর্ণাঙ্গ ও একহাতি বটে; কিন্তু কর্তব্য সম্পাদনে আমি অপূর্ণ নই। আমার তো মনে হয়, সম্রাট হেরাক্ল এটা দেখার জন্যই আমাকে আপনার সঙ্গে প্রেরণ করেছেন।

'না বৎস!'– এস্থনিস বলল– 'তোমার পিতা ও ভাই তোমাকে হত্যা করাতে এখানে পাঠিয়েছেন। আর কাজটা সম্পন্ন করার দায়িত্ব যে-দুজন লোকের উপর ন্যস্ত ছিল, তারা তোমার পর্যন্ত এসে পড়েছিল। তাদের একজনের তরবারি আর তোমার ঘাড়ের মধ্যখানে সামান্য ব্যবধান ছিল। আর অপরজন তার ঘোড়াটা তোমার ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে লাগিয়ে তোমাকে আটকে রেখেছিল। আমি দেখে না ফেললে তোমার মাকে সংবাদ শুনতে হতো, তোমার পুত্র বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে দেশ ও জাতির জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছে। তুমি কি দেখনি, সে-সময় তোমার ভাই কুস্তন্তিন ওখানে এসেছিলেন? এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় তার অন্য কোথাও থাকবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি এদিকে এলেন আর তোমার উপর আক্রমণ হলো। তোমার এই দুই ঘাতক সাধারণ কোনো সৈনিক নয়– এরা এক-একজন

বাহিনীর কয়েকশো সৈনিকের নেতৃত্বদানকারী কমান্ডার।'

ঘটনার বিবরণ ও তার চাঞ্চল্যকর নেপথ্য রহস্য শুনে ইউকেলিসের যারপরনাই বিস্মিত ও বিচলিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার মাঝে কোনোই ভাবান্তর পরিলক্ষিত হলো না। কারণ, তার জানা ছিল, রাজপরিবারগুলোতে রক্তসম্পর্কের কোনোই মূল্য নেই। যেখানে সিংহাসন ও মুকুটের স্থলাভিষিক্তি কিংবা অন্য কোনো স্বার্থের সঙ্ঘাত দেখা দেয়, সেখানে ভাই ভাইয়ের রক্তের পিয়াসী হয়ে যায়।

'বলুন; আমি কী করব?'– ইউকেলিস এন্থুনিসকে জিজ্ঞেস করল– 'আমি কি এখান থেকে বেরিয়ে যাব, নাকি এখানেই থাকব?'

'তুমি আমার সঙ্গে থাকো'– এন্থুনিস বলল– 'এখন তো আমাকেও এখান থেকে পালাতে হবে। আমি বাহিনীর দুজন কমান্ডারকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছি। কাজটা আমি কেন করেছি, সেই অজুহাত কেউ শুনবে না। আমাকে এখন মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির অপেক্ষা করতে হবে।'

'তা হলে আসুন; আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই।' ইউকেলিস বলল।

'তুমি একটা কাজ করো'– এন্থুনিস বলল– 'ওই যে টিলাটা দেখছ; তুমি ওটার পেছনে চলে যাও। তারপর এমনভাবে বাজিন্তিয়া পৌঁছে যাও, যেন কেউ দেখতে না পায়, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে গেছ। সোজা তোমার মায়ের কাছে চলে যাও। তাকে বোলো এখানে কীসব ঘটনা ঘটেছে আর আমি তোমাকে কী কথা বলেছি।'

'আর আপনি?'

আমি এখনও কোনো সিদ্ধান্তে নিইনি'– এন্থুনিস বলল– 'তুমি যাও।'

ইউকেলিস তৎক্ষণাৎ একটা টিলার পেছনে চলে গেল এবং ওখান থেকে বাজিন্তিয়া অভিমুখে ঘোড়া হাঁকাল।

* * *

অঞ্চলটা এমন যে, ওখান থেকে কেউ পালাতে চাইলে কারও বুঝবার উপায় ছিল না, অমুক পালিয়ে গেছে। ওখানে হাজার-হাজার ঘোড়া রণাঙ্গন থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। কোনো-কোনো ঘোড়া এমনও আছে যে, তার পিঠে কোনো আরোহী নেই। তাদের আরোহীরা আহত হয়ে কোথাও পড়ে গেছে। কিছু-কিছু আরোহী আহত হয়ে পড়ে গেলে তাদের এক-একটা পা ঘোড়ার পাদানিতে আটকে আছে আর ঘোড়াগুলো তাদের রক্তরঞ্জিত জীবিত বা মৃত দেহটাকে টেনে-হেঁচড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। কোনো-কোনো ঘোড় নিজেরাই আহত এবং এলোপাতাড়ি ছুটে চলছে। কোনো-কোনো ঘোড়া তাদের আরোহীদের পিঠে করে ছুটে চলছে। তাদের গতি আন্তাকিয়ার দিকে, যেখান থেকে একটু সামনে গেলেই রোম উপসাগরের বন্দর এলাকা। এই বন্দরে সেই জাহাজটা নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে, যেটা মিসর থেকে

হেরাক্ল-এর জন্য বাহিনী নিয়ে এসেছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে রোমানরা ঘন্টাতিনেক সময় শক্তপায়ে যুদ্ধ করেছিল। হেরাক্ল তাদের সোনার টুকরা, পুরস্কার ও হেম্‌সের গনিমতের লোভ দেখিয়েছিলেন। এসবে এতটা শক্তি ছিল যে, রোমানদের পা শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) দেখলেন, রোমানরা খানিক বেশিই জোশ ও জযবার সঙ্গে লড়াই করছে। তিনি হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)কে ইঙ্গিত করলেন। মুজাহিদ বাহিনীর কয়েকটা ইউনিট ডানে, কয়েকটা বাঁয়ে চলে গিয়েছিল। এরা হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন ছিল। তিনি এই ইউনিটগুলোকে এত চমৎকারভাবে পর্বতমালার পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, রোমানরা তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল। অগ্রযাত্রার সময় তাদের দূর থেকেই এই পর্বতমালার অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটি সমরবিদ সাহাবী হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর একটি বিশেষ রণকৌশল। এই কৌশল প্রয়োগ করে তিনি নিজের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী দুশমনকে বেশ কটি রণাঙ্গনে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন। এখানেও তিনি সেই কৌশলটি অবলম্বন করলেন এবং রোমানদের সেই ধোঁকাটা দিলেন।

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর ইঙ্গিত পেয়ে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) ডানে-বাঁয়ে কয়েকজন দূত পাঠিয়ে দিলেন, যাও; ঝাঁপিয়ে পড়ো।

এই ইউনিটগুলোর কমান্ডার ব্যাকুলতার সঙ্গে এই আদেশেরই অপেক্ষায় সময় পার করছিলেন। তারা বেজায় অস্থিরতা ভোগ করছিলেন যে, আমাদের ভাইয়েরা যুদ্ধ করছে, নিজেদের ও শত্রুর রক্ত ঝরাচ্ছে আর আমরা পাহাড়ের অভ্যন্তরে আরামের সঙ্গে লুকিয়ে বসে আছি। অবশেষে তারা আক্রমণের আদেশ পেলেন এবং পাহাড়ের ভেতর থেকে শত্রুবাহিনীর উভয় পার্শ্ব দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে বাঁধভাঙা প্লাবনের মতো বেরিয়ে গেলেন।

কিছু অশ্বারোহী রোমানদের পেছনে চলে গেল। কুস্তুন্তিনের জন্য দুটিই পথ খোলা ছিল। হয় ময়দানে স্থির থেকে সৈন্যদের যমের হাতে তুলে দেবে, নতুবা রণেভঙ্গ দিয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। রোমান সেনা-অধিনায়ক কুস্তুন্তিন দ্বিতীয় পথটা অবলম্বন করল। আপন বাহিনীকে মুজাহিদদের তরবারি ও বর্শার আঘাতে প্রাণ হারাতে এবং তাদের ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে মরতে রেখে নিজে পালিয়ে গেল। রোমান সৈনিকরা কেটে-কেটে পড়ে যেতে লাগল। রণাঙ্গনের আশপাশে পাহাড়-পর্বত ও টিলা-টিপি ছিল। রোমান বাহিনীর যেসব সৈনিক রণাঙ্গন ছেড়ে পালাতে সক্ষম হলো, তারা পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢুকে প্রাণ রক্ষা করল।

কোনো প্রকার ভিন্নমত ছাড়া সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন, পলায়মান রোমানদের রোখ ছিল আন্তাকিয়ার দিকে। তারা সেই বাহিনী ছিল, যারা কুস্তুন্তিনের সঙ্গে মিসর

থেকে হেরাক্ল-এর সাহায্যার্থে এসেছিল। এই রোমান বাহিনীটা এই আশা নিয়ে আন্তাকিয়ার দিকে যাচ্ছিল যে, যে-জাহাজে করে তারা এখানে এসেছিল, সেটা এখনও ওখানেই থেকে থাকবে এবং তাদের নিয়ে মিসর ফিরে যাবে। বিস্ময়কর ঘটনাটা এই ঘটল যে, কুস্তুন্তিনও রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করে বাজিন্তিয়ার পরিবর্তে আন্তাকিয়ার পথ ধরেছিল। তারও অভিপ্রায়, সে মিসর চলে যাবে।

হেরাকল-এর পরাজয় চূড়ান্ত হয়ে গেল। পরাজয়ের শেষ কীলকটা গাঁথার কাজও সম্পন্ন হলো। এখন শামের এক ইঞ্চি মাটিও আর তার দখলে রইল না।

* * *

বাজিন্তিয়ায় সম্রাট হেরাক্ল সংবাদ পেয়ে গেছেন, তার যে-বাহিনীটা মিসর থেকে এসেছিল এবং যেকজন সৈনিক বাজিন্তিয়ায় তার কাছে ছিল, তারা সবাই হয়ত যুদ্ধে নিহত হয়েছে কিংবা ছিন্নভিন্ন হয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এই সংবাদে হেরাক্ল প্রথম যে-পদক্ষেপটা গ্রহণ করলেন, সেটা হলো, তিনি বাজিন্তিয়া থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। তিনি আদেশ জারি করলেন, বাজিন্তিয়া খালি করে দেওয়া হোক।

খালি করে দেওয়ার অর্থ এই ছিল না যে, এক-দুদিন সময়েই প্রাসাদ শূন্য করে ফেলা এবং সেখান থেকে রওনা হওয়া সম্ভব। এর জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। বাস্তবতা এই ছিল, হেরাক্ল পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, মিসর গিয়ে তিনি বাহিনী পুনর্গঠন করবেন। তারপর শামে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে মুসলমানদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেবেন। এটি কোনো কুদরতি প্রতিক্রিয়াই ছিল বা তিনি নিজের পরাজয়কে আড়াল করে রাখাল একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যে, তিনি এই ঘোষণাটি দিলেন। মনের ক্ষোভ চাপা দেওয়ার এর চেয়ে ভালো আর কোনো পন্থা তার কাছে থাকবার কথা ছিল না।

ইউকেলিস রণাঙ্গন থেকে বেরিয়ে রাতেই বাজিন্তিয়ায় তার মায়ের কাছে পৌঁছে গেল। কিন্তু এতটা সাবধানতা অবলম্বন করে গেল, যেন হেরাক্ল জানতে না পারেন, ইউকেলিস জীবিত ফিরে এসেছে। মা লিজা পুত্র ইউকেলিসকে দেখে নিশ্চয় এই মর্মে বিস্মিত হয়ে থাকবেন যে, ছেলেটা ফিরে এল কেন! ইউকেলিস মাকে পুরো ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল, এস্থনিস না থাকলে আজ মায়ের কাছে আমার মস্তকছিন্ন লাশটাই আসত শুধু।

ইউকেলিস লিজার একমাত্র পুত্র। শুনে সে এমনভাবে চমকে উঠল যে, তার চোখদুটো হঠাৎ অপলক হয়ে গেল। হা-করা-মুখটা তার হা করেই রইল। তারপর তার চেহারায় ক্ষোভের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। মহিলা দাঁতে দাঁত পিষতে লাগল।

'জালেম!– জল্লাদ!'– লিজা দাঁত কড়মড় করে বলল– 'আমি এসেছিলাম একটা

মিশন নিয়ে– 'বিষপান করিয়ে ওকে হত্যা করতে। কিন্তু আমি ওর প্রেমের জালে ফেঁসে গেলাম। ওকে আমার আসল পরিচয় বলে দিলাম। ভালবাসায় অন্ধ হয়ে আমি ওর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আর আজ কিনা ও আমার ছেলেকে হত্যা করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে! ওর প্রতি আমার আস্থা বিয়ের অল্প কদিন পরই উঠে গিয়েছিল। কিন্তু তত দিনে আমি তার কাছে অপরাগ হয়ে পড়েছিলাম।'

কথাগুলো লিজা এমন ধারায় বলল, যেন সে আপনার সাথে কথা বলছে। ইউকেলিস বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তার মুখের পানে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকল– মা আমার এসব কী বলছেন!

দিনদুয়েক পর এন্থুনিসও বাজিন্তিয়া পৌঁছে গেল। কিন্তু এল এমন সন্তর্পণে যে, হেরাক্‌ল জানতেই পারলেন না, তার একজন সেনাপতি রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসেছে। এন্থুনিস নিজের বাড়িতে উঠল না– কোনো বন্ধুর কাছে বা অন্য কোনো গোপন ঠিকানায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকল। এন্থুনিস একজন সেনাপতি। হয়তবা কোনো রাজপরিবারের সদস্যও। সে কোনো এক মাধ্যমে ইউকেলিসের মা লিজার কাছে সংবাদ পাঠাল, অনতিবিলম্বে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।

লিজা অতিমাত্রায় বিচলতা ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে এন্থুনিসের অপেক্ষা করছিল। তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তুমি কী করে জানলে, হেরাক্‌ল ও তার পুত্র কুস্তুন্তিন ইউকেলিসকে এই প্রক্রিয়ায় হত্যা করতে চেয়েছিল, যেমনটা ইউকেলিস আমাকে বলেছে?

আজ এন্থুনিসের বার্তা পাওয়ামাত্রই উঠে সে হাঁটা দিল এবং এন্থুনিসের কাছে পৌঁছে গেল। লিজা একজন সাধারণ নারীর পোশাক পরিধান করে মুখের উপর অবগুণ্ঠন ফেলে ছদ্মবেশ ধারণ করে গেল, যাতে কেউ চিনতে না পারে মানুষটা কে।

'এস লিজা!'– এন্থুনিস লিজাকে ম্লান মুখে অভ্যর্থনা জানাল এবং জিজ্ঞেস করল– 'তোমার ছেলেটাকে জীবিত ও নিরাপদ পেয়েছ কি?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি'– লিজা গম্ভীর মুখে উত্তর দিল– 'কিন্তু এসব কী ঘটল এবং কীভাবে ঘটল? আমি কিছু বুঝেছি আর কিছু তোমার কাছে জানতে চাই।'

এন্থুনিস বলল, আমি ইউকেলিস ও যমের মাঝে কীভাবে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই ইতিবৃত্ত শোনাবার জন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। যে-বৈঠকে আমাদের সম্রাট হেরাক্‌ল ও তার পুত্র কুস্তুন্তিন মিলে ইউকেলিসকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল– যার পরে প্রথমে ইউকেলিসকে ও পরে তোমাকে ডেকে সম্রাট তোমাদের সম্মুখে ইউকেলিসকে সেনাপতি বানানোর স্বপ্ন দেখিয়েছিল এবং তারও পরে আমাকে ডেকে তাকে প্রশিক্ষণের জন্য আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সে-সময় হেরাক্‌ল-এর কক্ষে এক অতিশয় রূপসী তরুণী দাসি উপস্থিত ছিল। মেয়েটা থেমে-থেমে হেরাক্‌লকে সুরা পান করাচ্ছিল আর পরে আড়ালে সরে গিয়ে হেরাক্‌ল

ও কুস্তুন্তিনকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে থাকত কিংবা বাইরে চলে যেত। এভাবে চতুরতার সঙ্গে কান পেতে দাসি হেরাক্‌ল ও কুস্তুন্তিনের কথোপকথন শোনার চেষ্টা করছিল। সে-সময় ও বেশ ভালোভাবেই এবং স্পষ্ট করেই শুনেছিল, সম্রাট হেরাক্‌ল ও কুস্তুন্তিন ইউকেলিসকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। হেরাক্‌ল যখন বললেন, ইউকেলিসকে এস্থনিসের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তখন দাসি চমকে উঠেছিল। এবার সে তাদের কথাবার্তা আরও গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল। দাসি ইউকেলিসের হত্যা-চক্রান্তের সব তথ্য জেনে ফেলল।

এই দাসি মেয়েটা কচি বয়সে তার বিধবা মায়ের কাছ থেকে ছিনতাই হয়েছিল এবং তাকে হেরাক্‌ল-এর কাছে উপহারস্বরূপ পেশ করা হয়েছিল। মেয়েটা অসাধারণ রূপসী ছিল। সেজন্য হেরাক্‌ল তাকে নিজের একান্তা দাসি বানিয়ে সে অনুপাতে গড়ে তুলেছিলেন। এস্থনিস এর মাকে বেশ ভালোভাবেই জানত এবং মহিলা তাকে তার আপন ও হিতকামী বলে বিশ্বাস করত। কারণ, তার স্বামী এস্থনিসের বন্ধু ছিল। দাসির মা এস্থনিসের কাছে এসে-এসে মিনতি জানাত, আমার মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিন।

এস্থনিস মহিলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কোনো-না-কোনোভাবে হেরাক্‌ল-এর পাঞ্জা থেকে তোমার মেয়েকে আমি উদ্ধার করে দেব। ফলে দাসি এস্থনিসকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করতে শুরু করল এবং তাকে পিতার আসনে স্থান দিল। এস্থনিসকে খুশি করার জন্য দাসি একটা পন্থা বের করে নিল। হেরাক্‌ল তার খাস কামরায় যখনই কারও সঙ্গে কোনো কথা বলতেন, তখন যদি কোনো গোপন তথ্য তার কানে আসত, তা হলে সেই তথ্যটি সে এস্থনিসকে জানিয়ে দিত। তারই ধারাবাহিকতায় ইউকেলিসের হত্যা-ষড়যন্ত্রের তথ্য সে এস্থনিসকে জানিয়ে দিয়েছিল।

এ-তথ্য দাসি তার সাধারণ রুটিন হিসেবেই দিয়েছিল। কিন্তু তার জানা ছিল না, এ-তথ্য এস্থনিসের জন্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ছিল এবং এই হত্যা-ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত শুনে সে কী পরিমাণ আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়েছিল।

এস্থনিস ইউকেলিসের মাকে জানাল, ইউকেলিস আমার সঙ্গে রণাঙ্গনে গেলে আমি প্রতিটা মুহূর্ত তাকে চোখে-চোখে রাখতে শুরু করলাম, পাছে এমন না হয় যে, কুস্তুন্তিন কোনো এক সুযোগে যুদ্ধের আগেই তাকে হত্যা করিয়ে ফেলে। অবশেষে যুদ্ধ শুরু হলো। এবার আমি তাকে একদম কাছে-কাছে রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু কোনো এক সুযোগে ইউকেলিস আমার থেকে আলাদা হয়ে গেল।

'তুমি বিষয়টা আমাকে আগে জানালে না কেন?' লিজা জিজ্ঞাসা করল।

'কিছু একটা চিন্তা করেই আমি তোমাকে বিষয়টা আগে অবহিত করিনি'– এস্থনিস উত্তর দিল– 'আমি চিন্তা করেছিলাম, তুমি গিয়ে এ-ব্যাপারে হেরাক্‌ল-এর সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করবে। আর তখন হেরাক্‌ল রণাঙ্গনে না পাঠিয়ে তাকে হত্যা

করার অন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করবেন। আমি ইউকেলিসকে বাঁচানোর পণ করে নিয়েছিলাম। কেন করেছিলাম, তা অবশ্য তোমার জানা আছে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি'– লিজা বলল– 'ইউকেলিস তোমার ঔরসজাত– হেরাক্‌ল-এর পুত্র নয়। আমি যে-কটা কন্যা জন্ম দিয়েছি, ওরা হেরাক্‌ল-এর সন্তান। ইউকেলিসের জনক তুমি।'

'তার অর্থ দাঁড়ায়, আমি তোমার উপর কোনো অনুগ্রহ করিনি'– এন্থনিস বলল– 'ইউকেলিস আমারই আত্মজ।'

লিজা হেরাক্‌ল-এর প্রেমজালে আটকে গিয়ে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু হেরাক্‌ল-এর হৃদয় দিনকতক পরই তার থেকে সরে যেতে শুরু করেছিল। সে-সময় এন্থনিস সেনাপতি ছিল না। ছিল হেরাক্‌ল-এর নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার। অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ও মনকাড়া যুবক ছিল। লিজার তাকে এতই ভালো লাগল যে, তার সঙ্গে গোপন বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। ইউকেলিস তাদের সেই বন্ধুত্বেরই ফসল। ছেলেটা এন্থনিসের কামজ সন্তান।

'রাজা-বাদশাদের অভ্যন্তরীণ জগতে এসবই ঘটে'– এন্থনিস বলল– 'আমি যদি তথ্য পেতাম, হেরাক্‌ল কুস্তুন্তিনকে বা তার অন্য কোনা ছেলেকে হত্যার ষড়যন্ত্র এঁটেছে, তা হলে আমি বিষয়টাকে এতটুকুও আমলে নিতাম না। কিন্তু ইউকেলিসের এভাবে খুন হওয়া চেয়ে-চেয়ে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই ঘটনার সঙ্গে আমার রক্তের ব্যাপার জড়িত ছিল।

'এতক্ষণে কুস্তুন্তিন হেরাক্‌লকে নিশ্চয় বলে দিয়ে থাকবে, তুমি তার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছ'– লিজা বলল– 'হেরাক্‌ল তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করবেন বলে মনে করছ?'

'না করুন'– এন্থনিস বলল– 'আমি আত্মগোপনে চলে যাব। তারপর যেদিন ধরা পড়ব, সেই দিনটি হবে আমার জীবনের শেষ দিন।'

'আপাতত এখানেই লুকিয়ে থাকো'– লিজা বলল– 'যখন কোথাও পালিয়ে যাবে, আমাকে ও ইউকেলিসকে নিয়ে যেয়ো।'

'সম্রাট হেরাক্‌ল ও কুস্তুন্তিনকে পরাজয়ের তিক্ত ঢোক গিলতে দাও'– এন্থনিস বলল– 'তারপর ভেবে-চিন্তে করণীয় ঠিক করব।'

ওদিকে হেরাক্‌ল-এর পালিয়ে-যাওয়া-বাহিনীর কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈনিকরা বন্দরে পৌঁছে গেল। তারা জাহাজে চড়ে বসল। জাহাজ তাদের নিয়ে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) এখনও হেম্‌স থেকে বেশ দূরে আছেন। এখানেই আবু উবায়দা (রা.)-এর প্রেরিত দূত তার কাছে এসে পৌঁছল। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) রণাঙ্গন থেকেই বার্তা পাঠিয়েছিলেন, মহান

আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দ্বারা ধন্য করেছেন। আপনি যে-বাহিনীটি নিয়ে এসেছেন, সেটির এখন কোনো প্রয়োজন নেই।

বার্তা পেয়ে আমীরুল মুমিনীন সেখানেই থেমে গেলেন। তাঁর হাতে এতটা সময় ছিল না যে, বাকি পথটুকু অতিক্রম করে হেম্‌স ঘুরে আসবেন। এখনও পাঁচ-ছয় দিনের দূরত্ব অবশিষ্ট আছে।

রোমসম্রাট হেরাক্‌ল চূড়ান্তরূপে পরাজিত হলো। কিন্তু আল-জাযিরার খ্রিস্টান গোত্রগুলো নিজ-নিজ এলাকায় পৌঁছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে নতুন সমস্যার জন্ম দিল।

ছয়

হযরত ওমর (রা.) তখন জাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি যখন আবু উবায়দা (রা.)-এর বার্তা পেলেন, রোমানদের চূড়ান্তরূপে পরাজিত করা হয়েছে, তখন ওখান থেকেই মদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তাঁর দীর্ঘ সময়ের জন্য মদীনা থেকে অনুপস্থিত থাকা সমীচীন ছিল না। লড়াই শুধু হেম্‌স ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোতেই লড়া হচ্ছিল না– বরং ওদিকে ইরাকের বিজয় এখনও চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেনি। ইরানের কেসরা-বাহিনী নানা জায়গায় পরাজয়ের শিকার হয়েছে। এখন দেশটির দখল চূড়ান্ত করা হচ্ছে এবং বিজিত অঞ্চলগুলোর ব্যবস্থাপনা বহাল করার কার্যক্রম চলছে। মুজাহিদ বাহিনী দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের দূতগণ একের-পর-এক বার্তা নিয়ে মদীনা আসছেন। এমতাবস্থায় আদেশ-নিষেধ জারি করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য আমীরুল মুমিনীনের মদীনায় উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।

হযরত ওমর (রা.) জাবিয়া থেকে এখনও রওনা হননি। এখনও তিনি রওনার প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত। এমন সময় হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর আরেক দূত এসে হাজির হলেন। এই দূত আমীরুল মুমিনীন থেকে একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এসেছেন।

ব্যাপারটা হলো, আবু উবায়দা (রা.) যখন সাহায্য চেয়ে মদীনায় আমীরুল মুমিনীনের কাছে আবেদন পাঠিয়েছিলেন, তখন হযরত ওমর (রা.) যে-কটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তার একটি ছিল, তিনি সিপাহসালার হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর কাছে আদেশ প্রেরণ করেছিলেন, আপনি কা'কা' ইবনে আমরকে চার হাজার সৈন্য দিয়ে অনতিবিলম্বে হেম্‌স রওনা করিয়ে দিন।

যুদ্ধাভিযানে তড়িৎগতিতে অগ্রযাত্রা করা এবং শত্রুর উপর সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ায় কা'কা' ইবনে আমর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লড়াকু ছিলেন। এ-ক্ষেত্রে তার বেশ খ্যাতি ছিল। তিনি কূফা থেকে চার হাজার অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে ঝড়ের

মতো হেম্‌সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পথে থাকতেই আবু উবায়দা (রা.) রোমানদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে শামের সীমান্ত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হযরত কা'কা' ইবনে আমর (রা.) যখন হেম্‌স গিয়ে পৌঁছান, ততক্ষণে বিজয় সম্পন্ন হয়ে গেছে।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) ব্যক্তিগতভাবে মনে করলেন, গনিমতের সম্পদ বণ্টনে কা'কা' ইবনে আমর ও তার সালারদেরও ভাগ থাকা দরকার। কিন্তু তাঁরা তো এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণই করেননি। এমতাবস্থায় কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) নিজে এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি একজন দূত জাবিয়া পাঠিয়ে দিলেন যে, যাও; আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) থেকে এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসো।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) এ-ব্যাপারে ঐতিহাসিক যে-সিদ্ধান্তটি দিলেন, সেটি কাগজে লিখিয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর নামে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সিদ্ধান্তের শব্দগুলো আজও ইতিহাসের আঁচলে সংরক্ষিত আছে।

তিনি লিখেছেন : 'কূফাবাসীদের মালে-গনিমতে অতটাই অংশীদার ভাবতে হবে, যতটা অংশীদার লড়াইকারী মুজাহিদগণ। কা'কা' ও তার মুজাহিদগণ এই যুক্তিতে গনিমতের হকদার যে, তাদের আগমনের সংবাদে রোমানরা প্রভাবিত ও সন্ত্রস্ত হয়েছিল। আর এটিও রোমানদের পরাজয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। মহান আল্লাহ কূফার লোকদের কল্যাণ করুন ও উত্তম বিনিময় দান করুন যে, তারা তাদের বিজিত অঞ্চলগুলোর সুরক্ষাও করে, আবার যখন যেখানেই প্রয়োজন দেখা দেয়, সাহায্যের জন্য সেখানেই ঝড়ের বেগে ছুটে যায়।'

শত্রুর উপর মনস্তাত্ত্বিক অভিযান পরিচালনার জন্য আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) সেনাপতি কা'কা' ইবনে আমর ও তার চার হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদকে গনিমতের সম্পদে পুরোপুরি ভাগ পাইয়ে দিলেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) জাবিয়া ত্যাগ করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

* * *

ইসলামের এই বিজয়গুলো নিঃসংশয়ে গৌরবময় বিজয়। কিন্তু বিজয়ের পরিধি এতটাই বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল যে, সে অনুসারে মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল একেবারেই অপ্রতুল। তবে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) ও তাঁর সিপাহসালারদের বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার ফলে বিজয়ের এই সুবিশাল পরিধিও তাঁদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে থাকে। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁরা এই স্বল্পসংখ্যক সৈনিককে এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে, গোটা অঞ্চল একটি সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস বলছে, এই বিজয় বাহ্যত পূর্ণাঙ্গ ছিল; কিন্তু সাপ তখনও

মরেছিল না। হেরাক্‌লও বাজিন্তিয়া থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। তার অভিমুখ ছিল রোম ভূখণ্ড।

পরাজিত রোমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিল কুস্তুন্তিন। সেও জীবনের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। বাজিন্তিয়ার পরিবর্তে সে আন্তাকিয়ার পথ ধরেছিল। তার আশা ছিল, হেরাক্‌ল আন্তাকিয়াতেই থেকে থাকবেন আর ওখান থেকে মিসর রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু মাঝপথে জানতে পারল, হেরাক্‌ল এখন না বাজিন্তিয়ায় আছেন, না আন্তাকিয়ায়। বরং তিনি অন্য একস্থানে গিয়ে উঠেছেন। কুস্তুন্তিন সেদিকে মোড় ঘুরিয়ে দিল এবং পিতার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলো।

'শ্রদ্ধেয় আব্বাজান!'– পিতার মনের ক্ষোভ নিরসনের লক্ষ্যে কুস্তুন্তিন পরম অনুনয়ের সুরে বলল– 'মনে আমার অনেক দুঃখ যে, আমি আপনার মনোবাসনা পূরণ করতে পরিনি। কিন্তু এই পরাজয়ের দায়ভার আমার ঘাড়ে চাপানোর আগে আমি আপনাকে অবহিত করতে চাই এর আসল দায় কার। কে আমাদের এমন শোচনীয় পরাজয়ে মুখে ঠেলে দিল।'

হেরাক্‌ল-এর মুখ থেকে একটাও কথা বের হলো না। তিনি নির্বাক চোখে কুস্তুন্তিনের পানে তাকিয়ে থাকলেন।

'আল-জাযিরার কাবায়েলিরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকত, তা হলে আমাদের এভাবে পিছপ হতে হতো না'– কুস্তুন্তিন বলল– 'ওদের তাড়িয়েছে ইউকেলিস। এ তো আপনিও নিশ্চিতভাবেই জানেন। অবশ্য সমস্যা এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকলে না হয় কথা ছিল। যুদ্ধ চলাকালে বড়মাপের আরেক ভয়ানক গাদ্দার দৃশ্যপটে এসেছিল। সে হলো আমাদেরই এক সেনাপতি– এস্থনিস। লোকটা আমারই চোখের সামনে আমাদের দুজন অভিজ্ঞ কমান্ডারকে হত্যা করেছে...।

হেরাক্‌ল সহসা চকিত হয়ে উঠলেন। এতক্ষণ তিনি আধা ঘুম আধা জাগরণের অবস্থায় ছিলেন। কুস্তুন্তিনের সর্বশেষ তথ্যে তিনি হঠাৎ পুরোপুরি জেগে উঠলেন।

'উক্ত সেনাপতি আমাদের সেই দুই কমান্ডারকে হত্যা করেছে, যাদের আমরা ইউকেলিসকে হত্যা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম'– কুস্তুন্তিন বলল– 'ঘটনাটা আমি নিজচোখে প্রত্যক্ষ করেছি।'

কুস্তুন্তিন সম্রাট হেরাক্‌লকে এস্থনিসকর্তৃক রোমান বাহিনীর দুজন কামান্ডার হত্যার বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়ে বলল, পরে আমি সেখান থেকে চলে গেলাম। এস্থনিসের তো জানাই ছিল না, আমরা ইউকেলিসকে হত্যা করাচ্ছি। তারপরও সে কমান্ডারদ্বয়কে হত্যা করল কেন? শুধু এজন্য যে, সে আমাদের বাহিনীটিকে দুর্বল বানাচ্ছিল, যাতে আমাদের পরাজয় অবধারিত হয়। পরে আমি যুদ্ধের পরিস্থিতি অনুপাতে এস্থনিসের কাছে দূত পাঠালাম, তোমার ইউনিটটাকে অমুক দিকে নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাও। কিন্তু দূত তাকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে

এসেছিল। না এস্থনিসের কোনো সন্ধান পাওয়া গেছে, না ইউকেলিসের কোনো হদিস মিলেছে। বলুন আব্বাজান, এটা জাজ্বল্যমান বিশ্বাসঘাতকতা নয় কি?'

'ও এখন আছে কোথায়?' হেরাক্‌ল বিষণ্ন মনে জিজ্ঞেস করলেন।

'সেই তথ্যও আমি সংগ্রহ করে এনেছি'— কুস্তুন্তিন জবাব দিল— 'তারা দুজনই বাজিন্তিয়া চলে গেছে। দুজনকেই ওদিকে যেতে দেখা গেছে।'

হেরাক্‌ল আগেই ক্ষোভে-বেদনায় আধাপাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তার রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারকে তলব করলেন। কমান্ডার এসে নত মুখে দাঁড়ালে তিনি অত্যন্ত বজ্রকঠিন গলায় আদেশ জারি করলেন, এক্ষুনি বাজিন্তিয়া যাও; সেনাপতি এস্থনিসকে শিকলে পার বা রশিতে পার বেঁধে এখানে নিয়ে আসো।

সূর্য অস্ত গেছে অনেক আগে। রাত গভীর হয়ে গেছে। রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার আট-দশজন রক্ষীসেনা নিয়ে বাজিন্তিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। বাজিন্তিয়া পৌঁছতে তিন-চার ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। সম্রাট হেরাক্‌ল-এর আদেশ ছিল, সেনাপতি এস্থনিসকে এক্ষুনি নিয়ে আসো। কমান্ডারের নেতৃত্বে রক্ষীসেনারা ঘোড়ার পিঠে চাবুকের আঘাত হানল। ঘোড়া প্রাণপণ ছুটতে শুরু করল।

মধ্যরাতের কিছু আগে এই বাহিনী বাজিন্তিয়া গিয়ে পৌঁছল। বাজিন্তিয়া একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। দুর্গের ফটক সূর্য অস্ত যাওয়ামাত্র বন্ধ হয়ে যায় এটাই সচরাচর নিয়ম। কিন্তু বাজিন্তিয়ার ফটক একদম খোলা— একেবারে উন্মুক্ত। কারণ, হেরাক্‌ল এই নগরীটা খালি করে দিতে আদেশ করেছিলেন।

কমান্ডার এস্থনিসের ঘর চিনত। সে উক্ত ঘরে হানা দিল। কিন্তু ঘরটা একদম ফাঁকা— শূন্য। ঘরে কোনো মানুষ নেই।

নগরীতে এখনও কিছু লোক বিদ্যমান আছে। কমান্ডার আশপাশের তিন-চারটা ঘরে করাঘাত করে সবাইকে ঘুম থেকে জাগাল এবং তাদের এস্থনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তারা বলল, এস্থনিসের স্ত্রীকে তার সন্তানদের নিয়ে শহর থেকে বের হতে দেখেছি। কিন্তু এস্থনিসকে কোথাও দেখা যায়নি।

ততক্ষণে এস্থনিস বাজিন্তিয়া থেকে পুরো এক দিনের দূরত্বে চলে গিয়েছিল। ইউকেলিসও তার সঙ্গে ছিল। ছিল ইউকেলিসের মা লিজাও। তিনজনই ঘোড়ার পিঠে চড়া। চতুর্থ আরেকটা ঘোড়ায় কিছু খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র বোঝাই করা। ধাওয়া করে তাদের পর্যন্ত পৌঁছা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রক্ষীবাহিনীর কামান্ডার ফিরে গিয়ে জানাল, এস্থনিসের ঘরে কাউকে পাওয়া যায়নি। শুধু ঘরটা খালি পড়ে আছে। তার স্ত্রী-সন্তানরাও লাপাত্তা।

কুস্তুন্তিন এই তথ্য শুনেই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, গাদ্দার!— বেটা বউ-বাচ্চাদের নিয়ে কোথাও পালিয়ে গেছে নিশ্চয়!

হেরাক্‌ল আগে থেকেই পাগলের মতো হয়ে আছেন। রাগে-ক্ষোভে মাথাটা তার আগুন হয়ে আছে। তিনি সরোষে আদেশ জারি করলেন, যেখান থেকে হোক সেনাপতিকে ধরে আমার সামনে হাজির করতেই হবে। আমি ওকে ক্ষমা করব না।

'আর অপর গাদ্দার ইউকেলিস সম্পর্কে আপনার আদেশ কী?' কুস্তুন্তিন হেরাক্‌ল-এর কাছে জানতে চাইল।

'এখন আর আমি ওকে ক্ষমা করতে পারি না'– হেরাক্‌ল-এর কণ্ঠ কঠিন শোনাল– 'এখন ওকে যে করেই হোক নির্মূল করতে হবে। ওর দিন শেষ হয়ে গেছে। ওর মাও যদি উলটা-পালটা কিছু করে, তা হলে আমি ওকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব। পুরোটা দেশ আমার হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি তো এখন নিজেকেও ক্ষমা করতে প্রস্তুত নই।'

কুস্তুন্তিন হেরাক্‌লকে উস্‌কে দিল, ইউকেলিসকে হয় গ্রেফতার করে আনা হোক কিংবা যেখানেই পাওয়া যাক, গোপনে হত্যা করার ব্যবস্থা করা হোক।

'আচ্ছা, ও যুদ্ধে মারা যায়নি তো!' হেরাক্‌ল খানিক শান্ত হয়ে আশাবাদের সুরে বললেন।

'ও তো যুদ্ধ করেইনি'– কুস্তুন্তিন বলল– 'আমি তথ্য নিয়েছি। আপনি নিশ্চিত হোন, ও জীবিত আছে এবং কোথাও আত্মগোপন করে আছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই সে মাঠ ত্যাগ করেছিল।

অবশেষে হেরাক্‌ল সিদ্ধান্ত দিলেন, ইউকেলিসকে হত্যা করা হোক।

কুস্তুন্তিন এই সিদ্ধান্তে খুব খুশি হলো। হেরাক্‌লকে বলল, ঠিক আছে, দায়িত্বটা আমি নিলাম– একাজ যেভাবেই হোক আমিই করাব।

কুস্তুন্তিন বেরিয়ে গেল এবং আস্থাভাজন দুজন সেনাকমান্ডারকে ডেকে বলল, তোমরা ইউকেলিসকে খুঁজে বের করো। পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমি পরে জানাব।

আদেশ পেয়ে দুই কমান্ডার ইউকেলিসের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

* * *

রোমান বাহিনী তাদের বিপুল মরদেহ ও গুরুতর আহত সেনাদের রণাঙ্গনে ফেলে রেখে পিছপা হয়ে গেলে মুজাহিদগণ গনিমত কুড়োতে শুরু করে দিলেন। এখন আর শত্রুর পক্ষ থেকে কোনো জবাবি হামলার আশঙ্কা নেই নিশ্চিত হয়ে সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) হেম্‌স ফিরে গেলেন। তার অব্যবহিত পরক্ষণ থেকেই হেম্‌সে রোমানদের অস্ত্রের স্তূপ জমতে শুরু করল। গনিমতের সম্পদগুলো এসে-এসে সিপাহসালারের সম্মুখে স্তূপীকৃত হতে লাগল।

এ কোনো সাধারণ বিজয় ছিল না। ইসলামের সর্ববৃহৎ শত্রুকে আরবের মাটি থেকে বেদখল করে দেওয়া হলো। সবাই উৎসব পালনের মুডে ছিলেন। মুজাহিদদের

যেসব স্ত্রী, বোন ও কন্যারা সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা আহতদের তুলে আনতে ও সেবা-চিকিৎসা দিতে ময়দানে চলে গেলেন। শারিনাও ওদিকেই যাচ্ছিল। কিন্তু একলোক তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, রোমান বাহিনীর যে-অফিসারকে একটা কক্ষে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছিল, তিনি আপনাকে যেতে বলেছেন।

লোকটা রাওতাস। শারিনা রাওতাসকে ভুলতেই বসেছিল। রাওতাস একজন চাকর পাঠিয়ে শারিনাকে যেতে সংবাদ পাঠিয়েছে। শারিনা সঙ্গে-সঙ্গে তার কাছে চলে গেল।

'মনে হচ্ছে, সিপাহসালার তাঁর প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছেন'– রাওতাস শারিনাকে উদ্দেশ করে অভিযোগের সুরে বলল– 'তুমি বিষয়টা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পার।'

'সিপাহসালার এই আজই নগরীতে ফিরেছেন'– শারিনা বলল– 'ঠিক আছে; আমি আজই তাঁর কাছে গিয়ে তোমার মুক্তির আদেশ নিয়ে আসছি।'

রাওতাসের মনের উপর দখল প্রতিষ্ঠিত রাখার মানসে শারিনা তাকে বরাবরই বলে আসছিল, আমি একজন মুসলমানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমি এখানে থাকব না। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আমি সম্রাট হেরাক্‌ল-এর কাছে চলে যাব। এখন রাওতাস তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে, না কী করবে?

'আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না'– শারিনা বলল– 'এখন পরিস্থিতি একদম পালটে গেছে। হেরাক্‌ল না জানি কোথা থেকে কোথায় চলে গেছেন। তাঁর বাহিনীর তো কোনো অস্তিত্বই অবশিষ্ট রইল না। স্বামীকে সঙ্গে করে আমি যাবটা কোথায়? এখন তোমাকে এখান থেকে বের করিয়ে দিচ্ছি। তারপর যখনই সুযোগ পাব, আমি এসে পড়ব।'

শারিনা সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর সঙ্গে দেখা করল এবং তাঁকে রাওতাসের মুক্তির ওয়াদার কথা মনে করিয়ে দিল। আবু উবায়দা (রা.) তখনই রাওতাসকে ডেকে পাঠালেন। রাওতাস আরবি জানত না; আবু উবায়দাও তার ভাষা বুঝতেন না। শারিনা দুজনেরই ভাষা বুঝত ও বলতে পারত। সে দুজনের দোভাষী হয়ে গেল।

'শারিনা মা!'– আবু উবায়দা (রা.) বলতে শুরু করলেন– 'ওকে বলো, জয়-পরাজয় আল্লাহর ইচ্ছাধীন। সেজন্য আমি সবার আগে আল্লাহর শোকর আদায় করছি। তারপর সেই লোকটির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যে আমাদের এই বিজয়ের জন্য সামান্যও সহযোগিতা করেছে। রাওতাসকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাও। সে আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছে; আমাদের এই বিজয়ে তার বেশ অবদান আছে। আমি তাকে কিছু উপঢৌকন দিয়ে বিদায় জানাতে চাই।'

বলেই আবু উবায়দা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) যা-যা বলেছেন, শারিনা রাওতাসের ভাষায় অনুবাদ করে তাকে সব শোনাল। পরে জানাল, সিপাহসালার তোমাকে কিছু উপহার দিয়ে বিদায় করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

রাওতাস প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল, আমার জন্য এটিই বড় মূল্যবান উপহার যে, তিনি আমাকে সম্মানের সঙ্গে মুক্তি দান করছেন।

এতক্ষণে আবু উবায়দা (রা.) কক্ষে ফিরে এলেন। তাঁর হাতে একটা ক্রুশ, যেটা বড়জোর ছয় ইঞ্চি লম্বা হবে। তার গায়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর শূলিবিদ্ধ প্রতিকৃতি। ক্রুশটা কাঠের; কিন্তু প্রতিকৃতিটা সোনার।

'এ খ্রিস্টান'– আবু উবায়দা (রা.) বললেন– 'আমি একে এর ধর্ম অনুপাতে উপঢৌকন দিচ্ছি। এই ক্রুশ একজন মৃত রোমান সেনা-অফিসারের সঙ্গে ছিল। আমার কাছে এটা গনিমতের সম্পদ হিসেবে এসেছে। একে বলো, সিপাহসালারের এতটুকু অধিকার নেই যে, তিনি গনিমতের সম্পদ থেকে একটা কনাও আপন মর্জিতে নিয়ে নিজে রেখে দেবেন কিংবা অন্য কাউকে দেবেন। কিন্তু এই লোকটি আমাদের যে-সাহায্য করেছে, তার বিনিময়ে আমি আমীরুল মুমিনীন ও আমাদের সকল মুজাহিদের পক্ষ থেকে এটা উপহার দিচ্ছি।'

আবু উবায়দা (রা.) ক্রুশটা রাওতাসের হাতে দিয়ে শারিনাকে বললেন, বাইরে গিয়ে তুমি কোনো নায়েব সালার কিংবা কমান্ডার পদমর্যাদার একজনকে আমার কাছে নিয়ে আসো।

শারিনা বেরিয়ে গেল এবং একজন দায়িত্বশীল মুজাহিদকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) তাঁকে বললেন, এই রোমানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও এবং যে-ঘোড়াটা এর পছন্দ হয়, তার উপর যিন কষে ও প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়ে সজ্জিত করে একে দিয়ে দাও। একজন মুজাহিদকে এর সঙ্গে দাও, যেন একে রণাঙ্গন অতিক্রম করে আরও কিছু দূর পথ সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে আসে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এই ব্যবস্থাটা এজন্য করলেন, যাতে মুজাহিদরা একে রোমান মনে করে ধরে না ফেলে।

'সিপাহসালারকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাও শারিনা!'– রাওতাস বলল– 'আজ এই প্রথমবার আমি জানলাম, মুসলমানের চরিত্র কত উন্নত, কত মহান ও প্রশংসনীয়। আজ আমি বুঝলাম, ইসলাম কেন এত দ্রুততার সঙ্গে বিস্তার লাভ করছে। তাঁকে একথাটাও বলো, এই যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আমি একদিন ভুলে যাব; শাম রাজ্যের কথাও আমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাবে; কিন্তু তাঁর এই উত্তম চরিত্রের কথা আমি কোনোদিনও ভুলতে পারব না।'

রাওতাস সিপাহসালার আবু উবায়দার সঙ্গে করমর্দন করল এবং একপা পেছনে সরে গিয়ে রোমান কায়দায় স্যালুট দিল। তারপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

ওখানে ঘোড়ার কোনো অভাব ছিল না। নিহত ও আহত রোমান সৈন্যদের হাজার-হাজার ঘোড়া ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। রাওতাস উন্নত জাতের হৃষ্টপুষ্ট একটা ঘোড়া পছন্দ করল, যেটা তারই বাহিনীর কোনো এক মৃত অশ্বারোহী সৈনিকের ছিল। তাকে সেই ঘোড়াটা সাজিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো। তাতে সে আরোহণ করল। এক মুজাহিদ তাকে এগিয়ে দিতে তার সঙ্গে গেল।

হেমস থেকে কিছু দূর পথ অতিক্রম করার পর তার বাহিনীর বিশাল অঞ্চলজুড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মরদেহগুলো তার চোখে পড়ল। রাওতাস লাশগুলো দেখে-দেখে এবং সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়াটাকে ডান-বাম করে-করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল, যাতে তার ঘোড়া কোনো মৃত কিংবা আহত জীবিত লোককে পিষ্ট না করে। নিজবাহিনীর রক্তস্নাত এত অধিকসংখ্যক মৃতদেহ দেখে তার মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। রাওতাস ঘোড়াটা থামিয়ে দিল। তারপর তার সঙ্গে আসা মুজাহিদের সঙ্গে হাত মেলাল এবং ইঙ্গিতে বলল, এবার তুমি ফিরে যাও। বলেই রাওতাস ঘোড়ার পিঠে চাবুকের আঘাত হানল। ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। এবার আর সে দেখল না, তার ঘোড়া কাকে পিষ্ট করল আর কাকে রক্ষা করল।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। পশ্চিমাকাশে লাল সূর্যটা অস্ত যেতে শুরু করল। রাওতাসের অভিমুখ বাজিন্তিয়ার দিকে। রণাঙ্গন অতিক্রম করে খানিক দূর আসার পর সে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল, যাতে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। গন্তব্য তার এখনও অনেক দূর।

রাওতাসের মনে চিন্তা জাগল, আমি তো বাজিন্তিয়া যাচ্ছি; কিন্তু সম্রাট হেরাক্‌ল কিংবা কোনো সেনাপতি যদি জিজ্ঞেস করে, এতটা দিন কোথায় ছিলে, তা হলে উত্তর কী দেব। নিজবাহিনীর পরাজয়ে আগে থেকেই সে হতাশাগ্রস্ত ছিল। বেদনার বোঝা তার হৃদয়ের উপর এমনভাবে চেপে ছিল যে, সঠিক কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারছিল না। তার মনে আশঙ্কা জাগতে শুরু করল, আমার স্বাস্থ্য ও শারীরিক অবস্থা এতটাই ভালো যে, কেউই স্বীকার করবে না, আমি মুসলমানদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে এসেছি। কয়েদির সঙ্গে কেউ ভালো আচরণ করে না, তাকে একজন সম্মানিত অতিথি মনে করা হবে। সেই সঙ্গে এই অপরাধবোধও তাকে অস্থির করে তুলতে শুরু করল যে, সে মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে নিজেদের অনেক গোপন তথ্য বলে দিয়েছে।

সম্রাট হেরাক্‌লকে বেশ ভালো করেই জানত রাওতাস। হেরাক্‌ল ফেরাউন-চরিত্রের মানুষ, যার আদালতে সবচেয়ে লঘু শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। রাওতাস দ্বিধায় পড়ে গেল। কী করবে, কী সিদ্ধান্ত নেবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। নানা চিন্তা, নানা ভাবনা

তার মাথাটার মধ্যে কিলবিল করতে শুরু করল, যা কিনা ধীরে-ধীরে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠতে লাগল।

রাওতাস পকেট থেকে ক্রুশটা বের করল, যেটা সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) তাকে উপহার দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা এখনও গভীর হয়নি। বেশ কিছু দূর পর্যন্ত চোখ কাজ করছে। রাওতাস ক্রুশের গায়ে সাঁটানো শূলিবিদ্ধ প্রতিমাটা দেখল।

'কোথায় যাব যিশু?'– রাওতাস প্রতিমাটাকে জিজ্ঞস করল– 'আপনি আমায় পথের সন্ধান দিন। আমাকে সেই পথে তুলে দিন, যেটি আমাকে কল্যাণ ও আত্মিক প্রশান্তির মনযিল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে।'

রাওতাস মূর্তিটা চোখের সঙ্গে লাগাল, ঠোঁটের সঙ্গে লাগাল। তারপর আবার পকেটে পুরে রেখে ঘোড়ার লাগামে মৃদু নাড়া দিল। ঘোড়া চলতে শুরু করল। কিন্তু রাওতাস ঘোড়ার গতি ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল। সে বাজিন্তিয়াকে মস্তিষ্ক থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত যাবেটা কোথায় এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়নি বটে; কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আমি বাজিন্তিয়া যাব না এবং হেরাক্‌ল-এর মুখোমুখি হব না।

রাওতাস সম্রাট হেরাক্‌ল-এর গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার ছিল। শামের গলি-ঘুপচি, চিপা-চাপা ও বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিল। তার জানা ছিল, সে যেদিকে এগিয়ে চলছে, ওদিকে খ্রিস্টান কাবায়েলিদের অধিবাস। ভেবে-চিন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, আপাতত কোনো একটা কবিলায় গিয়ে আশ্রয় নেব। কী করব, কোথায় যাব সেই ভাবনা পরে ভাবব।

* * *

এস্থনিস ইউকেলিস ও লিজাকে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কোথাও চলে যাচ্ছিল। তারা এতটা দূরে চলে গিয়েছিল যে, এখন আর কেউ ধাওয়া করবে এমন আশঙ্কা নেই। কিন্তু তারপরও এস্থনিস কোথাও থামছিল না। অথচ রাত গভীর হয়ে গেছে। ঘোড়াগুলো তাদের পিঠে করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলছে। পথে লিজা এস্থনিসকে তিন-চারবার জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? এস্থনিস প্রতিবারই উত্তর দিয়েছিল, এখন এগোও; সামনে গিয়ে বলব।

রাত কেটে যাচ্ছিল। এস্থনিস একটা সবুজ-শ্যামল এলাকায় এসে পৌঁছল। এখানে অনেকগুলো উঁচু-উঁচু টিলা। আকাশের চাঁদটা মাথার উপরে উঠে আসছে। এস্থনিস একটা উপযুক্ত জায়গা দেখে থেমে গেল এবং ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। বলল, রাতটা কাটানোর জন্য এই জায়গাটাই যুৎসই।

তারা চতুর্থ ঘোড়ার পিঠ থেকে আহার্যদ্রব্য বের করল এবং সবাই খেতে বসল।

'আমরা আমাদের জীবন তো রক্ষা করেছি'– আহারের পর লিজা বলল– 'এখন আমাদের কোথাও আত্মগোপন করা দরকার। তুমি তো জান এন্থুনিস! আমি ইরানসম্রাটের রাজপরিবারের শাহজাদী ছিলাম। হেরাক্ল-এর কাছে আমি এক উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম; কিন্তু ঘটনা ঘটে গেল আরেকটা। এখন তো আমি আমার রাজপরিবারের কাছে একজন অপরাধী। আমি এখন ওখানেও যেতে পারব না। আমাকে এখন একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করতে হবে।'

'আর আমাকে আপনি সাথে করে আনলেন কেন?'– ইউকেলিস জিজ্ঞেস করল– 'আমি তো কুস্তুন্তিনকে হত্যা করার সংকল্প নিয়েছিলাম। আর সম্ভবত আমি আমার পিতা হেরাক্লকেও হত্যা করে ফেলতাম। এখন আপনি আমাকে এখান থেকে ফিরে যেতে দিন। ওরা কাপুরুষের মতো ধোঁকায় ফেলে আমাকে হত্যা করাতে চেয়েছিল। কিন্তু ওদের আমি বীরের মতো হত্যা করব। আমি ওদের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে হত্যা করব।'

'এখন আর এর কোনো আবশ্যকতা নেই'– এন্থুনিস বলল– 'এখন আরেকটি রাজত্ব অস্তিত্বে আসবে। আমি তার ভিত্ রচনা করব। রোম-পারস্যের রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন পৃথিবীতে আরেকটি রাজত্ব আত্মপ্রকাশ করবে, যেটি ইরানেরও হবে না, রোমেরও হবে না। এটি মহান ক্রুশের রাজত্ব হবে, যেটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবে। হেরাক্ল-এর হাতে এখন আছে শুধু মিসর আর রোম। আমি তাকে মিসর থেকে বিতাড়িত করে রোমেই সীমাবদ্ধ করে দেব।'

'এন্থুনিস!'– লিজা বলল– 'তুমি অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তোমার উপর এই ভীতিও ভর করে আছে, যদি ধরা পড়ে যাও, তা হলে হেরাক্ল তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। এবার শুয়ে পড়ো, আরাম করো; তা হলে মস্তিষ্ক ঠিক হয়ে যাবে। তখন মাথাটা সঠিক ভাবনা ভাবতে পারবে। এখন তুমি জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখছ।'

'না লিজা!'– এন্থুনিস বলল– 'আমি ক্লান্ত নই, সন্ত্রস্তও নই। এতটা সজাগ আমি কখনও ছিলাম না, যতটা এখন আছি। তুমি বলেছ, আমি স্বপ্ন দেখছি। তা হলে শুনে নাও কোন বাস্তবতার উপর আমি আমার এই সংকল্পের প্রাসাদ নির্মাণ করছি। আল-জাযিরার খ্রিস্টান গোত্রগুলো আমার বাহিনী হবে। তুমি কি দেখনি, ওরা কীভাবে ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে হেরাক্ল-এর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল? হেরাক্ল যদি তাদের অন্তরে আস্থা বসিয়ে নিতে পারতেন, তা হলে তারা তো বহাল থাকতই, ত্রিশ হাজারের আরও একটি বাহিনী তিনি পেয়ে যেতেন। তখন হেরাক্ল-এর সৈন্যের অভাব থাকত না। কিন্তু হেরাক্ল তাদেরকে আস্থার শেকলে বেঁধে রাখতে পারলেন না। তারা হেরাক্ল ও তার বাহিনীকে বিশ্বাস করতে পারল না। তারা খ্রিস্টান; মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তারা সব সময়ই প্রস্তুত।

আমি তাদের জানি। ইসলামের সামনে বাঁধার প্রাচীর দাঁড় করাতে তারা উদগ্রীব। পরম আস্থায় এনে আমি তাদের কাজে লাগাব।'

'কিন্তু এখন আমরা কোথায় যাব?' লিজা প্রসঙ্গ বদল করে জানতে চাইল।

'এও কি জিজ্ঞেস করার মতো কোনো বিষয় হলো?'– এন্থনিস বলল– 'এই শাম মুলুকে আমাদের রাজত্ব ছিল। আমি গোটা দেশটিতে চষে বেড়িয়েছি। আল-জাযিরায় তো আমি বহুদিন অবস্থান করেছি। অনেক গোত্রের অধিপতিরা আমাকে কেবল জানেই না– তাদের সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্কও আছে। তাদের কোন-কোন গোত্র বেশি শক্তিশালী আমি তাও জানি। আপাতত আমি তাদের কারও কাছে গিয়ে উঠব। আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে, তারা আমাকে নিরাশ করবে না– আমি যার কাছেই যাব, সবাই আমাকে সাদরে বরণ করে নেবে। বরং তারা এই ভেবে খুশি হবে যে, আমরা একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি পেয়ে গেছি। তাদের আমি একটি সুসংগঠিত বাহিনীর আকারে গড়ে তুলব। আমাদের সৈনিকদের আমরা যেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি, তাদেরও আমি ঠিক সেভাবে তৈরি করে নেব।'

এন্থনিস যে-দুটি খ্রিস্টান গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তাদের একটি বনু রবিয়া আর অপরটি বনু তানুখ। ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, এই দুটি গোত্র জনসংখ্যা ও অর্থের দিক থেকে খুবই শক্তিশালী ছিল। অন্যান্য ছোট-বড় গোত্রগুলো তাদের নেতা মান্য করত। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) যখন সংবাদ পেলেন, আল-জাযিরার খ্রিস্টান গোত্রগুলো ত্রিশ হাজার সৈন্যের আদলে হেরাক্‌ল-এর কাছে বাজিন্তিয়া পৌঁছে গেছে, তখন তিনি প্রথম কথাটি এই বলেছিলেন যে, আমি জানি, বনু রবিয়া ও বনু তানুখ তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তখনই তিনি আদেশ জারি করেছিলেন, এই দুটি গোত্রের বসতিগুলো ধ্বংস করে দাও, যাতে ভবিষ্যতে আর মাথা তোলার যোগ্য না থাকে।

এমনই শক্তিশালী তৃতীয় আরেকটি গোত্র ছিল ইয়াদ। কিন্তু তাদের মাঝে এমন কতিপয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ছিল, যারা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করত, পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া ও সমঝোতা করে চলত এবং নিজেদের স্বার্থবিবেচনায় প্রয়োজনে নতিও স্বীকার করে নিত। এই তিনটি গোত্রই হালবের উপকণ্ঠে বাস করত আর অন্যান্য গোত্রগুলো আল-জাযিরার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল।

এ ছিল তৃতীয় আরেকটা শক্তি, যেটা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্থান লাভ করছিল। বিশেষ কারণে এটা ভয়ানক ছিল যে, এই তথ্য কারও জানা ছিল না। এই উত্থান এতটাই গোপনীয় ছিল যে, গোয়েন্দাদের পক্ষেও এর সন্ধান বের করা সম্ভব হয়নি।

'তুমি একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব সেনাপতি এন্থনিস!'– লিজা বলল– 'যুদ্ধবিষয়ে তুমি আমার চেয়ে বেশি জান ও বোঝ। কিন্তু আমিও কিছু জানি। এত বড় সুসংগঠিত রাজশক্তি যে-মুসলমানদের বিরুদ্ধে পেরে উঠল না, তাদের মোকাবেলায় এই

অপ্রশিক্ষিত আনাড়ি গোত্রগুলো কীভাবে লড়াই করবে? তারা বিদ্রোহ করতে পারে। হেরাক্‌ল মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে তাদের বলেছিলেনও।'

'আমি সেনাপতি লিজা!'– এন্থনিস বলল– 'একটা সেনাবাহিনীর দোষ-গুণ ও সবলতা-দুর্বলতা আমি বুঝি। মুসলমানরা শাম জয় করে নিয়েছে। এখন তারা এতটাই ক্লান্ত যে, এখান থেকে আর সম্মুখে অগ্রসর হলে তাদের দম নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাদের মোকাবেলায় কাবায়েলিরা একদম তরতাজা ও আনকোড়া। এখনও পর্যন্ত তারা কোথাও লড়াই করেনি। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শত্রুকে পরাজিত করার শক্তি ও যোগ্যতা তাদের আছে। তাদের শুধু একজন সেনাপতির প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন আমি পূরণ করব।'

* * *

রোমান সেনাপতি ভুল বলেনি যে, মুসলমানরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মুসলমানদের আমির, সিপাহসালার ও অন্যান্য সালারগণ মস্তিষ্কের দিক থেকে তখনও সজাগ ও তরতাজা ছিলেন। তাঁরা শত্রু সম্পর্কে উদাসীন হয়ে বিশ্রামের জন্য আরাম শয্যায় গা এলিয়ে দেননি বা গনিমতের সম্পদ লুণ্ঠনে আত্মনিয়োগ করেননি। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) জাবিয়া থেকে মদীনায় ফেরত রওনা হওয়ার প্রাক্কালে আদেশ জারি করে গিয়েছিলেন, যে-সালারদের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, তারা যেন উক্ত অঞ্চলগুলোর জনবসতি ও ছোট-ছোট দুর্গগুলোর উপর আক্রমণ শুরু করে দেয়।

সেই অঞ্চলগুলোই ছিল আল-জাযিরার এসব খ্রিস্টান কাবায়েলি এলাকা। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) চিন্তা করেছিলেন, এই গোত্রগুলোকে যদি ক্ষণিকের জন্যও নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দেওয়া হয়, তা হলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিয়মতান্ত্রিক বাহিনীতে পরিণত হয়ে যাবে। একবার গিয়ে ফিরে এলেও রোমানরা তাদের আবারও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।

এই সবগুলো অঞ্চল মুসলমানরা জয় করে নিয়েছিল। কিন্তু ছোট-বড় কিছু দুর্গ ও জনবসতি এমন ছিল, যেখানে মুজাহিদের সংখ্যা খুব কম ছিল। কারণ, তখনও অধিকাংশ মুজাহিদ হেমসের রণাঙ্গনে নিয়োজিত ছিল। তার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, কোনো-কোনো অঞ্চলের খ্রিস্টানরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল এবং মুসলমানদের শাসন মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল।

এমনই একটা বিদ্রোহের খবর এক দুর্গঘেরা নগরী রাক্কা থেকে এল। ওখানে মুজাহিদদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। বেশি মুজাহিদ নিয়োজিত করার প্রয়োজনই বোধ করা হয়নি। যে-কজন ছিলেন, সবাই ছিলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, যাদের জিযিয়া-কর ইত্যাদি উসুলের জন্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু ওখানকার জনসাধারণ

জিযিয়া-কর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসল এবং এই মুসলমান কর্মকর্তাদের একস্থানে আটকে রেখে তাদের অসহায় করে তুলল।

কে একজন ওই খ্রিস্টানদের কবল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বেরিয়ে এল এবং সংবাদ জানাল, রাক্কায় বিদ্রোহ হয়ে গেছে। এই লোকটি হয় মুজাহিদদের কেউ কিংবা যেসব খ্রিস্টানকে মুসলমানরা তাদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে নিয়োজিত করেছিল, তাদের একজন। এই অঞ্চলটি সালার সুহাইল ইবনে আদির দায়িত্বে ছিল। সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে তৎক্ষণাত রাক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

হযরত সুহাইল ইবনে আদি রাক্কা পৌঁছে দেখলেন, এ তো বেশ শক্ত দুর্গ, যার সব কটি ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। খ্রিস্টানরা পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে মুসলমানদের হুঙ্কার ছাড়ছে। তারা তির-ধনুক হাতে নিয়ে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে আছে। কারও-কারও হাতে ছোট-ছোট বর্শাও আছে। সালার সুহাইল ইবনে আদির কাছে দুর্গের প্রতিরক্ষা বেশ মজবুত বলে প্রতীয়মান হলো।

সুহাইল ইবনে আদি ঘোষণা করিয়ে দিলেন, তোমরা অনতিবিলম্বে অস্ত্রসমর্পণ করে দুর্গের ফটক খুলে দাও। আমাদের যদি লড়াই করে দুর্গ জয় করতে হয়, তা হলে তোমাদের প্রত্যেককে গোলাম বানিয়ে আরব পাঠিয়ে দেব। ঘোষণায় একথাও বলা হলো, যারা হেরাক্‌ল-এর মতো শক্তিশালী রাজবাহিনীকে বারবার পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের মোকাবেলায় তোমরা একটা দিনও টিকতে পারবে না। ফটক খুলে দিয়ে যদি তোমরা আমাদের আনুগত্য মেনে নাও, তা হলে আমরা তোমাদের সঙ্গে সেই আচরণই করব, যেমনটি আমরা প্রতিটি বিজিত অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে করে থাকি। তখন আমরা তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দেব।

'সাহস থাকলে সম্মুখে এগিয়ে আসো এবং ফটক নিজেরা খুলে নাও।'

'রোমানরা পালিয়ে গেছে, কারণ, এটি তাদের ভূখণ্ড নয়– এটি আমাদের দেশ।'

'এই অঞ্চল তোমাদের নয়– আমরা তোমাদেরও এখান থেকে তাড়িয়ে দেব।'

মুসলমানদের ঘোষণার জবাবে ভেতর থেকে এমনই হুঙ্কার শোনা গেল। বলেই খ্রিস্টানরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আপন শক্তির উপর তাদের বেজায় দম্ভ ও ভরসা ছিল। জানা গেল, তিন-চারটা কবিলা দুর্গে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু তাদের জানা ছিল না, কোনো একটা দুর্গকে সেই বাহিনীই কেবল রক্ষা করতে পারে, যারা দুর্গে আবদ্ধ হয়ে লড়াই করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং এ-কাজে তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে। দুর্গের পাঁচিল-ফটক ভেতরের অধিবাসীদের একটুখানি সময়ের জন্যই বাঁচাতে পারে শুধু।

সালার সুহাইল ইবনে আদি তাঁর তিরন্দাজদের আদেশ করলেন, তোমরা সম্মুখে এগিয়ে যাও এবং পাঁচিলের উপর তীব্রতার সঙ্গে তির ছুড়তে শুরু করো। তিরন্দাজগণ মুষলধারায় তির ছুড়তে শুরু করলেন। কিন্তু পাঁচিলের উপর থেকে

জবাব আসতে শুরু করলে তাঁরা একদণ্ডও দাঁড়াতে পারলেন না। তিরের সঙ্গে উপর থেকে বর্শাও আসতে শুরু করল।

'এরা তো দেখছি বড় নির্বোধ ও আনাড়ী'– সালার সুহাইল ইবনে আদি বললেন– 'অযথা বর্শাগুলো নষ্ট করছে। এগুলো তোমরা কুড়িয়ে নাও। অস্ত্রগুলো আমাদের কাজে আসবে।'

এই তির-বর্শার ছায়ায় সালার সুহাইল ইবনে আদি কয়েকজন জানবাজকে দুর্গের পার্শবর্তী একটা ফটকের দিকে পাঠিয়ে দিলেন যে, তোমরা গিয়ে ফটকটা ভেঙে ফেলো। এদের অস্ত্র ছিল কুড়াল। এরা জীবনের বাজি লাগিয়ে ছুটে গেল। কিন্তু পাঁচিলের উপরকার তিরন্দাজরা এবার এদের আক্রমণের নিশানা বানাল, যাতে এই জানবাজরা ফটকের কাছে পৌঁছতে না পারে। কয়েকজন জানবাজ তিরবিদ্ধ শরীর নিয়ে ফিরে এল আর অন্যরা তিরের আওতায় না পড়তেই পেছনে সরে এল।

সালার সুহাইল দুর্গের চারদিকটা এক চক্কর ঘুরে এলেন। তিনি দেখলেন, দুর্গের প্রাচীরের কোথায় এমন কোনো দুর্বলতা আছে কি-না, যেখানটা ভেঙে ভেতরে ঢোকার পথ তৈরি করা যায়। কিন্তু না; দুর্গের কোনো অংশে এমন কোনো দুর্বলতার সন্ধান বের করা গেল না। জানবাজরা বলল, তা না থাকুক, দুর্গ যতই মজবুত ও দুর্ভেদ্য হোক আমরা কোনো একটা জায়গা দিয়ে প্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করবই। দুর্গ ভাঙা ও জয় করায় মুসলমানরা বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ছিল। ইতিহাস বলছে, এই দক্ষতার আসল তাৎপর্য ছিল, মুসলমানদের মাঝে জযবা ছিল। তাদের লড়াই করার মূলনীতি ছিল– হয় বিজয়, নাহয় শাহাদাত। মৃত্যুকে তারা হিসাবে গণনা করতেন না।

সালার সুহাইল ইবনে আদি দুর্গের পাঁচিল ভাঙতে কী-কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, মুজাহিদগণ কীভাবে জীবনের বাজি লাগিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপকে সফল করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, তার বিবরণ অনেক দীর্ঘ। চেষ্টা-পদক্ষেপ তো একটিও সফল হয়নি বটে; কিন্তু শত্রুর মনে প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানদের নানা পদক্ষেপ-প্রচেষ্টার ফলে ভেতরের অধিবাসীরা ধীরে-ধীরে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে শুরু করল।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছীর ও বালাযুরি লিখেছেন, অবরোধের সাত-আট দিনের মাথায় দুর্গের ভেতর থেকে ঘোষণা এল, আমরা সন্ধি করতে চাই; কাজেই যুদ্ধ মুলতবি করা হোক এবং আমরা যারা যেখানে আছি, সেখানেই থাকি। সালার সুহাইল ইবনে আদি সাময়িকের জন্য যুদ্ধ মুলতবি করে দিলেন।

এই দুই ঐতিহাসিক যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পেক্ষাপট লিখেছেন, যখন খ্রিস্টান গোত্রগুলো দেখল, মুসলমানরা অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ চালাচ্ছে, তখনই তারা বুঝে

ফেলল, এরা দুর্গ জয় না করে ছাড়বে না। আর তখন এরা আমাদের কোনো শর্তই গ্রহণ করবে না।

গোত্রগুলোর নেতারা সিদ্ধান্ত নিতে আলোচনায় বসল। এক বর্ষীয়ান নেতা পরিস্থিতি তুলে ধরে বলল, এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত কী নেওয়া যায় আমাদের তা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। সে বলল, তোমরা বীর যোদ্ধা, একথা সঠিক। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে, তোমরা কার জন্য লড়াই করছ। এটি আরব, আজম ও রোমের লড়াই। আমরা আরবও না, আজমও না, রোমানও না। আমরা রোমানদের সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। মুসলমানরা আমাদেরকে আমাদের সেই অপরাধের শাস্তি দিচ্ছে। আমি তখনও বলেছিলাম, পরের লড়াই লড়তে যেয়ো না; লাভ কিছুই হবে না। ফল শুধু এতটুকু পাবে, রোমানরা যে-ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তোমাদেরও তার ভাগ নিতে হবে। আজ আমরা সেই ধ্বংসেরই হিস্যা উসুল করছি। আমার পরামর্শ হলো, তোমরা মুসলমানদের সঙ্গে সমঝোতা করে নাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলমানরা তোমাদের মর্যাদা দেবে।'

আরেক নেতা বলল, যুদ্ধই যদি করতে হয়, তা হলে সবগুলো গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা বাহিনী গঠন করতে হবে। তারপর মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করতে হবে, এই মাটি আমাদের; তোমরা এখান থেকে চলে যাও। অন্যথায় তরবারির জোরে আমরা তোমাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেব।

নেতারা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। পরিস্থিতি তাদের ঐকমত্যে পৌঁছতে বাধ্য করল। তখনই তারা আটক মুসলমান কর্মকর্তাদের মুক্ত করে দিল এবং তাঁদের বলল, আমরা সন্ধি করতে চাই; আপনাদের পক্ষে এর ক্ষমতা কার হাতে? এ-বিষয়ে আমরা কার সঙ্গে আলোচনা করব? মুসলমান কর্মকর্তাগণ জানাল, আল-জাযিরার অঞ্চলটা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে তিনজন সালারের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এই অংশের সিপাহসালার হলেন ইয়াজ ইবনে গানাম, যিনি এ-সময়ে ওয়াসিতে অবস্থান করছেন। আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করার এক্তিয়ার একমাত্র তাঁর হাতে।

খ্রিস্টান গোত্রপতিরা তাদের দুই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বানিয়ে মুসলমান কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুর্গের বাইরে পাঠিয়ে দিল এবং মুসলমানদের বলে দিল, এদেরকে আপনাদের সালারের কাছে পৌঁছিয়ে দিন।

প্রতিনিধিরা সালার সুহাইল ইবনে আদির কাছে এল এবং তাদের প্রস্তাব উপস্থাপন করল। সালার তাদেরকে ওয়াসিত পাঠিয়ে দিলেন। সিপাহসালার ইয়ায ইবনে গানাম সন্ধির শর্তগুলো মেনে নিয়ে সুহাইল ইবনে আদিকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

এভাবে এই অবরোধ উঠে গেল। দুর্গের খ্রিস্টান গোত্রগুলো মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিল এবং কর-জিযিয়া পরিশোধ করতে শুরু করল।

***

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলি নু'মানি লিখেছেন, হেরাক্ল শাম থেকে পিছপা হয়ে রোমে গিয়ে মারাজুল আবয়াজ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন এবং সেখানে অবস্থান নিলেন। আজ বিশ্বমানচিত্রে এই নগরীর কোনো অস্তিত্ব নেই। ওখানেও হেরাক্ল-এর যে-আবাস ছিল, সেটিও রাজমহলের চেয়ে কম ছিল না। রাজকীয় সকল আয়োজনই সেখানে বিদ্যমান ছিল। সুরা ছিল। সুরা পরিবেশনের জন্য রূপসী দাসিরা ছিল। নারীর হেরেম ছিল, যেখানে জানার উপায় ছিল না, কে স্ত্রী আর কে গণিকা-রক্ষিতা।

হেরাকল তার খাস কামরায় অবনত মস্তকে পায়চারি করছেন। তার চেহারায় অস্থিরতা ও ক্ষোভের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। পুত্র কুস্তুন্তিন একধারে বসে পিতার পানে তাকিয়ে আছে। পিতার সঙ্গে তার কথা বলা দরকার; কিন্তু সাহস হচ্ছে না– ভয়ে তার হাঁটু কাঁপছে। পিতার আবেগ ও মেজাজ তার জানা আছে।

হেরাকল পদচারণা করতে-করতে থেমে গেলেন এবং মাথাটা উঁচু করে চোখ তুলে গম্ভীর মুখে পুত্র কুস্তুন্তিনের প্রতি তাকালেন।

'শুধু এস্থনিসই গাদ্দার ছিল না'– হেরাক্ল-এর গুরুগম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল– 'আমার স্ত্রী লিজা আর পুত্র ইউকেলিসও আমাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেছে। ওরা তিনজন একসঙ্গে গেছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আমার ধারণা, লিজা জেনে গিয়েছিল, আমরা তার পুত্রকে হত্যা করাচ্ছি।'

'শ্রদ্ধেয় আব্বাজান!'– কুস্তুন্তিন খানিক সাহস সঞ্চয় করে সতর্ক কণ্ঠে বলল– 'আপনি ঠিকই ধরেছেন; ওরা তিনজনই গাদ্দার।'

'আমি গোটা বাহিনীকেই গাদ্দার বলছি'– 'হেরাকল বললেন– 'এখনও আমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছিনি বটে; কিন্তু যেকোনো সময় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, যেসব কমান্ডার প্রাণে বেঁচে এসেছে, তাদের হত্যা করা হবে। এই হতভাগ্যরা মুসলমানদের ভয়ে একেবারে কাতর হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের উপর মুসলানভীতি চড়িয়ে নিয়েছিল। এখন আমি নতুন বাহিনী গড়ে নেব এবং খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসে শামের উপর আক্রমণ চালাব। হেরাক্ল এমন সাধারণ কোনো নাম নয় যে, ইতিহাস থেকে মুছে যাবে, অনাগত প্রজন্ম হেরাক্লকে একটা অপার্থিব শক্তি বলে স্মরণ করবে।'

এমন সময় দারোয়ান এসে সংবাদ দিল, সেনাপতি এস্থনিসের স্ত্রী তার দুটি সন্তানসহ এসেছেন এবং তিনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছেন।

কুস্তুন্তিন চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং অর্থবহ দৃষ্টিতে হেরাক্ল-এর প্রতি তাকিয়ে থাকল, সম্রাট মহিলাকে ভেতরে আসবার অনুমতি দেন কি-না। হেরাকল কিছু সময় মাথাটা নত করে চিন্তা করতে থাকলেন। তারপর মাথা দ্বারা হাল্কা ইঙ্গিত করলেন,

ওদের ভেতরে পাঠিয়ে দাও। মর্যাদার বিচারে মহিলা সাধারণ কোনো নারী নয়– একজন সেনাপতির স্ত্রী।

মহিলা ভেতরে প্রবেশ করে হেরাক্ল-এর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। হেরাক্ল জিজ্ঞেস করলেন, কেন এসেছ? পরক্ষণেই প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জান তোমার স্বামী কোথায়?

'আমি তো মহারাজের কাছে একথাটি-ই জিজ্ঞেস করতে এসেছি, আমার স্বামী কোথায়'– মহিলা উত্তর দিল– 'তিনি যুদ্ধে গিয়েছেন সে আমি জানি। কিন্তু ফিরে না আসায় নানাজনের কাছে জানতে চেয়েছি, তিনি নিহত হয়েছেন, নাকি আহত হয়েছেন? কিন্তু সবাই একই উত্তর দিল, তিনি নিহতও হননি, আহতও হননি।'

'যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই সে কোথাও পালিয়ে গেছে'– হেরাক্ল বললেন– 'যদি পেতাম, তা হলে তুমি তার লাশটা পেয়ে যেতে। কিন্তু সে নিখোঁজ। তা আমার থেকে তুমি কী নিতে এসেছ?'

'আশ্রয়'– মহিলা উত্তর দিল– 'আমার অবলম্বন দরকার। আপনার কাছ থেকে আমি শরণ নিতে এসেছি। আপনি আমার এই নিষ্পাপ, নিরপরাধ শিশুগুলোর পানে তাকান। এদের তত্ত্ব নেওয়ার মতো কেউ নেই।'

'এর জন্য আমি দায়ী নই'– হেরাক্ল উত্তর দিলেন– 'এখানে আমার কোনো অপরাধ নেই। এরা এদের পিতার পাপের শাস্তি ভোগ করছে।'

'কিন্তু মহারাজ!'– মহিলা প্রশ্ন ছুড়ল– 'আমি কার পাপের সাজা ভোগ করছি? আমি তো আমার স্বামীকে বলিনি, তুমি এমনটা করো? আমি তো এ-ব্যাপারে কিছুই জানি না?'

'আমার ধনভাণ্ডার দ্বারা কোনো বিশ্বাসঘাতকের স্ত্রী ও তার সন্তানদের প্রতিপালন হতে পারে না'– হেরাক্ল কঠিন গলায় রাজকীয় ভঙ্গিতে বললেন– 'যাও; অন্য কারও সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। তাতে সন্তানদের আশ্রয় জুটে যাবে।'

সেনাপতি এস্থনিসের স্ত্রী অনুনয়-বিনয় শুরু করে দিল যে, আমাকে এভাবে তাড়িয়ে দেবেন না। কান্নাদীর্ণ কণ্ঠে বলল, আপনার সামরিক বিভাগে আমার স্বামীর অবদানও তো কম নয়। তারও তো একটা বিনিময় এই অবুঝ শিশুরা আপনার কাছে পেতে পারে। আমাকে আপনি নিরাশ করবেন না মহারাজ!

মহিলার চোখের পাতা অশ্রুতে ভিজে গেল।

কিন্তু হেরাক্ল-এর পাষাণ হৃদয় বিগলিত হলো না। একজন অসহায় নারীর প্রতি করুণার হাত প্রসারিত করার পরিবর্তে তিনি তাকে ধমকাতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ বকে হেরাক্ল নীরব হলে কুস্তুন্তিন এস্থনিসকে গালমন্দ শুরু করল। পিতা-পুত্র মিলে এস্থনিসের স্ত্রীকে মর্মপীড়ায় জর্জরিত করে তুলল।

'মহারাজ!'– এস্থনিসের স্ত্রী উদ্‌গত অশ্রু আঁচলে মুছে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বলল– 'আমার স্বামী যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে, তা হলে কি ভালো হয় না, আপনি আমাকে ও তার এই সন্তানগুলোকে তার সেই অপরাধের শাস্তি হিসেবে হত্যা করে ফেলবেন? আপনি আমাদের মৃত্যুদণ্ড দিন। আপনার থেকে নিরাশ হয়ে এখন আমি মৃত্যু ছাড়া আর উত্তম কোনো আশ্রয় চোখে দেখছি না। এর চেয়ে ভালো আশ্রয় আমার আর হতে পারে না।'

'আমি তোমার উপর করুণা করেছি'– হেরাক্‌ল বললেন– 'অন্যথায় এতক্ষণে আমি তোমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতাম। মৃত্যু যদি তোমার কাম্যই হয়ে থাকে, তা হলে বিষ পান করে নিজেই নিজেকে হত্যা করো আর সন্তানদেরও পান করাও। এখন তুমি এখান থেকে চলে যাও এবং আর কখনও আমার সামনে এসো না।'

এস্থনিসের স্ত্রীর চোখে অশ্রু টলমল করছিল। মহিলা সম্রাট হেরাক্‌ল-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে একজন ভিখিরিনীর মতো কথা বলছিল। কিন্তু হেরাক্‌ল-এর বক্তব্যে তার রক্তশূন্য পাংশু মুখে লালিমা জেগে উঠল। চোখে অশ্রুর যে-ফোঁটাগুলো সাঁতার কাটছিল, চোখই সেগুলো চুষে নিল। তার ঘাড়টা হঠাৎ বেঁকিয়ে উঠল।

'শুনুন রোমের সম্রাট!'– মহিলা একদম পরিবর্তিত স্বরে এবং জলদ্‌গম্ভীর কণ্ঠে বলল– 'এবার আপনি আমার থেকে শুনে নিন; আমার স্বামী, আপনার সেনাপতি এস্থনিস কোথায় আছেন। আপনার রানি লিজা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। আপনার নির্দয় ভর্ৎসনা ও নির্মম আচরণ সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। এখন আর আমার কারও পরোয়া নেই। আমার স্বামী এস্থনিস আর আপনার স্ত্রী লিজা আমার জীবনটাকে নরক বানিয়ে দিয়ে গেছে। আর এখন আপনি আমাকে ও আমার সন্তানদের আমাদের না-করা-অপরাধের শাস্তি প্রদান করছেন।'

'লিজাকে নিয়ে আমার কোনো ভাবনা নেই'– হেরাক্‌ল বললেন– ও আমার পুত্র ইউকেলিসকেও ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গেছে।'

'শাহেনশাহে রোম!'– এস্থনিসের স্ত্রী অত্যধিক সাহসের সঙ্গে বলল– 'ইউকেলিস আপনার পুত্র ছিলই না। ও আমার স্বামীর ঔরসজাত। আমি রানির উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি এই অভিযোগে আমার উপর আপনার নির্মম খড়্গ আপতিত হওয়ার আগে এর রহস্য আমার কাছ থেকে শুনে নিন। লিজা আমার ঘরে এসে বেশ কবার আমার স্বামীর সঙ্গে নির্জনে সময় কাটিয়েছেন। তিনি আমাকে অনেক মূল্যবান উপহার দিয়ে খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু স্বামীর মূল্য তো কেউ দিতে পারে না। আমি তাকে তিরস্কার করেছি, ভর্ৎসনা করেছি যে, আপনি আমার জীবনটা ধ্বংস করছেন। উত্তরে তিনি আমাকে হুমকি দিয়েছেন, আমি রোমসম্রাটের স্ত্রী; আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে কারাগারের সবচেয়ে নোংরা ও অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দি করাতে পারি। যখন ইউকেলিস ভূমিষ্ট হলো, তখন লিজা

আমাকে বলেছিলেন, এখন আর আমার এস্থনিস থেকে দূরে থাকার কোনোই সুযোগ নেই। তিনি আমার পুত্রকে জন্ম দিয়েছেন। লিজা বলতেন, আপনি তাকে যৌবনেই হেরেমে নিক্ষেপ করেছেন এবং ভুলে গেছেন, লিজা নামেও আপনার একজন স্ত্রী আছেন। লিজা আমার স্বামীকে তার যৌনলালসা চরিতার্থের উপায় বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের এই সম্পর্ক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বহাল ছিল।'

এস্থনিসের স্ত্রীর বোধহয় ধারণা ছিল, এমন সাহসিকতার সঙ্গে এই তথ্য প্রকাশের পর সম্রাট হেরাক্ল আগুনের মতো জ্বলে উঠবেন এবং তাকে গলাধাক্কা দিয়ে মহল থেকে বের করে দেবেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মহিলার এই বক্তব্যের পর তার উপর নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। তিনি কিছুক্ষণ যাবত মহিলার পানে তাকিয়ে থাকলেন। তার অবশ্যই জানা থাকবে, রাজা-বাদশাদের প্রাসাদগুলোতে এমনতরো ঘটনা ঘটেই থাকে। যেসব যুবতী মেয়েদের হেরেমে নিক্ষেপ করা হয় এবং রাজারা তাদের কথা ভুলে যান, তারা যৌনলালসা নিবারণের কোনো-না-কোনো গোপন পথ বের করেই নেয়। হেরাক্ল-এর জন্য এটি এমন কোনো ঘটনা নয় যে, এর জন্য তাকে কঠোর কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে হবে। মহলের একজন নারী যদি কারও সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে হেরাক্ল-এর চোখে এটা বিশেষ ক্ষতিকর কোনো বিষয় ছিল না। সে-সময় তার মস্তিষ্কের উপর এত বড় একটা পরাজয়ের গ্লানি সাওয়ার ছিল যে, শামের মতো বৃহৎ দেশটা তার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

'কুস্তুন্তিন!'– হেরাক্ল শান্ত-সমাহিত কণ্ঠে বললেন– 'আপাতত অতিথি হিসেবে একে প্রাসাদে থাকতে দাও। আমি এর পুনঃবিবাহের ব্যবস্থা করব। সে পর্যন্ত এর দেখভাল করতে হবে। এখানে এ যেন কোনো জিনিসের অভাব অনুভব করতে না পারে।

* * *

এস্থনিস, লিজা ও ইউকেলিস আরও এক দিনের পথ অতিক্রম করে অপর একস্থানে যাত্রাবিরতি দিল। এই জায়গাটাও সুবজ ঘাস-পাতায় পরিপূর্ণ, টিলা-টিপিতে ঘেরা। বিপুল গাছ-গাছালির সমারোহ আছে। কাছে দিয়ে একটা স্বচ্ছ পানির নদী প্রবহমান। তারা আহারাদি সেরে অবসর হয়েছে। ইউকেলিস ইতিমধ্যেই তারুণ্যের নিশ্চিন্ত ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এস্থনিস-লিজাও তার পাশেই শয়ন করেছিল। কিন্তু এখন তারা ওখানে নেই।

অর্ধেক রাত কেটে গেছে। তারা খানিক আড়ালে সরে গিয়ে ক্ষুদ্র একটা পাথরের উপর বসে দুজনে দুজনার মাঝে হারিয়ে গেছে। লিজা ইরানি রূপের অসাধারণ এক উপমা। সম্রাট হেরাক্ল কী কারণে যে এত তাড়াতাড়ি রূপের এই প্রতিমা থেকে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে হেরেমে নিক্ষেপ করেছিলেন, সে তিনিই

জানেন। কিন্তু আজও তিনি তার সঙ্গে চোখে চোখ রেখে সেভাবে কথা বলতে পারেন না, যেভাবে রাজা-বাদশারা কথা বলে থাকেন। হেরাক্‌ল-এর মতো প্রতাপশালী ও অত্যাচারী রাজা লিজার মুখোমুখি হতে সমীহ করতেন। এতকাল ব্যাপার শুধু এতটুকু ছিল যে, লিজা এস্থনিসকে তার যৌনলালসা চরিতার্থের উপায় বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এখন এই সম্পর্ক এমন এক প্রেমের রূপ ধারণ করল, যা কিনা দুজনের হৃদয়ের গভীরতম তলে ঢুকে পড়েছে।

পুত্রকে ঘুমন্ত রেখে লিজা এস্থনিসকে নিয়ে আলাদা একস্থানে বসল। বসল এমনভাবে যে, দুজনের দেহ দুখানি যেন এক হয়ে গেছে। লিজার বয়স এখন চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। কিন্তু দেখতে এখনও যেন ষোড়শী। রূপের বান বইছে সারা অঙ্গ জুড়ে। এস্থনিস তার চেয়ে পনেরো-ষোলো বছরের বড়। কিন্তু তারও যৌবন যেন ফুরোয় না। অটুট স্বাস্থ্য। অনাবিল সৌষ্ঠব, যেন বয়সটা এখনও ত্রিশ পেরোয়নি।

'তোমার কি স্ত্রী-সন্তানদের কথা মনে পড়ে না?' লিজা এস্থনিসকে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি কাছে থাকলে আমার খোদাকেও মনে পড়ে না'– এস্থনিস উত্তর দিল– ও তো একজন স্ত্রী ছিল, যাকে আমি স্ত্রীরই জায়গায় রেখে দিয়েছিলাম। হৃদয়ে আমার কারও ভালবাসা জন্ম নেয়নি। আমার মন সম্ভবত তোমারই অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ ছিল। এক সময়ে তুমি এসে পড়লে।'

'তুমি কি আমাকে রাজকীয় জীবন দান করতে পারবে?'– লিজা অতিশয় আবেগপ্রবণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল– 'তোমার ভালবাসার প্রয়োজন ছিল; আমি তোমার সেই প্রয়োজন পূরণ করেছি। এবার আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমি ইরানের রাজপরিবারের কন্যা। তারপর এ পর্যন্ত রোমসম্রাট হেরাক্‌ল-এর রাজপ্রাসাদে জীবন অতিবাহিত করেছি। আমি আশঙ্কা করছি, পাছে এমন না হয়, আমরা এভাবেই দিকহারা পথিকের মতো বনে-বাদাড়ে ঘুড়ে বেড়াব আর এখানেই কোথাও বেঘোরে আমাদের জীবনের অবসান ঘটে যাবে।'

'আমি যে-রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করতে যাচ্ছি, তার প্রথম মহারানি হবে তুমি।' এস্থনিস পরম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল।

এস্থনিস পাশবিকতার চূড়ান্তে পৌঁছে গেল। পরমুহূর্তে প্রেমনেশায় এমনই চুর হয়ে উঠল, যেন তার এই অনুভূতিটুকু অবশিষ্ট থাকল না যে, লোকটা কোনো রাজকীয় কক্ষে মখমল-কোমল পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট, নাকি লোকালয় থেকে দূরে– বহু দূরে জনমানবহীন গহীন বনে একটা সুকঠিন পাথরের উপর বসা। লিজা প্রস্তরের কাঠিন্যে পালঙ্কের কোমলতা অনুভব করছিল।

চাঁদটা আরও উপরে উঠে এসেছে। শিশিরভেজা বনে মধ্যরাতের চন্দ্রালোক বেশ ফকফকা দেখাচ্ছে। তারা দুজন উঠে দাঁড়াল। এস্থনিস বলল, এবার শুয়ে পড়া

দরকার। এমন সময় লিজা পেছনের দিকে তাকিয়েই সহসা চমকে উঠল। ইউকেলিস খাপমুক্ত তরবারিহাতে দ্রুতপায়ে শাঁ-শাঁ করে এদিকে ধেয়ে আসছে।

'আমার পেছনে চলে আসো এন্থনি!' লিজা হতচকিতের মতো ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলল এবং ইউকেলিসের পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেল।

এন্থনিস পেছনের দিকে তাকাল। সে ইউকেলিসকে দেখতে পেল। তার হাতে তলোয়ার এবং এদিকে ধেয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে, ছেলেটা কোনো একজনকে টার্গেট করেই আসছে। এন্থনিস লিজার কথামতো তার পেছনে গিয়ে লুকোল।

'এই শয়তানটাকে তুমি আমার থেকে রক্ষা করতে পারবে না মা!' ইউকেলিস কাছে এসে রোষকষায়িত কণ্ঠে বলল– 'তুমি সামনে থেকে সরে যাও। আমি সব দেখেছি। তোমাকে ধোঁকা দিয়ে এ এই মতলবেই সঙ্গে করে এনেছে। আমি একে জ্যান্ত ছাড়ব না। বেটা জোচ্চোর!– লম্পট!

'থামো ইউকেলিস!'– প্রভাবদীপ্ত কণ্ঠে বলল– 'তুমি কি সেই লোকটিকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যে তোমাকে খুন হওয়া থেকে রক্ষা করেছে? তোমার খাতিরে এই লোকটি আপন স্ত্রী-সন্তানদের ফেলে এসেছে!'

ইউকেলিস ফণাতোলা সাপের মতো ফোঁসফোঁস করছিল আর তার মা নিজের বাহুদুটো দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে প্রতিহত করছিল। এন্থনিস যদি নিরস্ত্র না হতো, তা হলে সে মোকাবেলা করে ইউকেলিসকে কাবু করে ফেলতে পারত।

'ওকে বলে দাও লিজা আমি কে?'– এন্থনিস বলল– 'ছেলেটাকে আসল কথাটা জানিয়ে দাও।'

ইউকেলিস এন্থনিসকে হুঙ্কার দিয়ে চলছিল, কাপুরুষের মতো একজন নারীকে ঢাল না বানিয়ে সুপুরুষের মতো সামনে এসে দাঁড়াও।

'তুমি কি তোমার পিতাকে– তোমার জন্মদাতাকে খুন করতে চাচ্ছ?' লিজা বলল।

'হ্যাঁ'– ইউকেলিস ক্ষোভকম্পিত কণ্ঠে বলল– 'তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও। একে খুন করেই আমি ফিরে যাব। তারপর আমার পিতা হেরাক্লকেও হত্যা করব।'

'হেরাক্ল তোমার পিতা নন'– লিজা বলল– 'ও আমার শুধুই স্বামী ছিল। তোমার পিতা এই লোক– এন্থনিস। তুমি এর ঔরসজাত।'

ইউকেলিস হঠাৎ দমে গেল। তার জোশ-রোষ দু-ই স্তিমিত হয়ে এল। তরবারিটা নিচে নেমে এল। প্রশ্নবোধক চোখে জোছনার আলোয় মায়ের মুখপানে তাকিয়ে রইল।

'এস ইউকেলিস!'– লিজা সামনে এগিয়ে ইউকেলিসের হাত থেকে তরবারিটা নিয়ে বলল– 'তুমি এন্থনিসের পুত্র। হেরাক্ল এই তথ্য জানেন না। ফলে তিনি তোমাকে

তার সন্তান মনে করেন। কোনো এক যৌক্তিক কারণেই আমরা তোমাকে সঙ্গে এনেছি।'

এস্থনিস ও লিজা ইউকেলিসকে পাশে বসিয়ে নিল। ইরানের কেসরা লিজাকে কীভাবে একটা প্রতারণার মাধ্যমে তাকে হেরাক্ল-এর কাছে প্রেরণ করেছেন, হেরাক্ল বিবাহ করে তার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছেন, এসব ইতিবৃত্ত লিজা ইউকেলিসকে অবহিত করল। লিজা ইউকেলিসকে এসব কথা এমন আবেগময় ধারায় শোনাল যে, ইউকেলিস পুরোপুরি প্রভাবিত হয়ে পড়ল। ওদের কাছে চরিত্র বলতে কোনো বস্তু ছিল না। কালচারই ওদের এমন ছিল, যাতে বৈধাবৈধ ও শ্লীলতা-অশ্লীলতার কোনো বালাই ছিল না।

'আমি তোমাকে রাজপুত্র বানিয়েই তবে নিঃশ্বাস ফেলব'– এস্থনিস ইউকেলিসকে উদ্দেশ করে বলল– 'আমরা হেরাক্লকে হত্যা করব না। আমরা তার রাজত্বের উপর কব্জা প্রতিষ্ঠিত করে তাকে পথের ভিখিরীতে পরিণত করব এবং তার হাটে-বাজারে মানুষের কাছে ভিক্ষা করা দেখব।

'সে না হয় হবে; কিন্তু এখন আমরা যাচ্ছি কোথায়? এখন আমাদের পথের শেষ কোথায়?' ইউকেলিস জিজ্ঞেস করল।

'আর মাত্র এক দিনের পথ অবশিষ্ট আছে'– এস্থনিস উত্তর দিল– 'কাল রাতে আর আমরা কোনো বনে বা মরুভূমিতে থাকব না। আর এক দিন পথ চলে কাল এতক্ষণে আমরা কোনো এক কাবায়েলি নেতার বাড়িতে আরাম শয্যায় সুখনিদ্রায় শয়িত থাকব।'

* * *

এস্থনিসের চিন্তা ও সংকল্প অমূলক হতে পারে। এও হয়ত সত্য ছিল যে, সে জাগরণে স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু সে গন্তব্য একটা ঠিক করে নিয়েছিল। সফলতা-ব্যর্থতা তো পরের ব্যাপার। তার চিন্তা-চেতনায় এমন কোনো দ্বিধা বা সংশয় ছিল না যে, হয়তবা সে ভুল পথে চলছে। মনে-মনে একটা পরিকল্পনা সে স্থির করে নিয়েছিল। এমনকি কোন কবিলার অধিপতির কাছে গিয়ে উঠবে, তাও সে ঠিক করে নিয়েছিল।

তার বিপরীতে রাওতাস উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে ফিরছিল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নিজ বাহিনীতে ফিরে যাবে না, যাতে হেরাক্ল-এর মুখোমুখি না হতে হয়। কিন্তু পথ চলতে-চলতে সে এই সিদ্ধান্ত থেকে এমনভাবে সরে আসছিল, যেন হঠাৎ পা তার পিছলে গেছে এবং সে পড়ে গেছে। তার মস্তিষ্ক পথ চলছিল আর পিছলে যাচ্ছিল। সে একবার পড়ে যাচ্ছিল আর উঠে চলতে শুরু করছিল। মাথায় তার পাপের বোঝা।

পথে এ-ই প্রথমবারের মতো রাত এল। সে একজায়গায় শুয়ে পড়ল। পরদিন ভোরে জাগ্রত হয়ে আবার চলতে শুরু করল।

রাওতাস বারবার উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ক্রুশ ও ঈসার সোনার প্রতিমাটার প্রতি তাকাতে থাকল, যেন এই মূর্তিটা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু ক্রুশের সাথে সাঁটানো প্রতিকৃতিটা তার কোনোই কাজে এল না। চিন্তা করে-করে তার একটিই আশ্রয় চোখে পড়ল। কোনো এক খ্রিস্টান গোত্রের কাছে গিয়ে ওঠা যেতে পারে। সে যখন হেম্‌সে মুসলমানদের নজরবন্দিতে ছিল, তখন শারিনা গিয়ে-গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করত এবং প্রতিদিনকার খবারাখবর শোনাত। শারিনা তাকে শুনিয়েছিল, আল-জাযিরার যে-খ্রিস্টান গোত্রগুলো হেরাক্‌ল-এর সাহায্যার্থে এসেছিল, তারা সবাই আস্থা হারিয়ে চলে গেছে।

রাওতাস একথা চিন্তা করে আবার দ্বিধায় পড়ে যেত, ওই গোত্রগুলো যদি তাকে গ্রহণ না করে, যদি ওরা তাকে আশ্রয় না দেয়, তা হলে তখন সে যাবেটা কোথায়!

একবার তো সে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিল, সে নিজবাহিনীতে ফিরে যাবে। ঘোড়াও থামিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু যেইমাত্র ঘোড়ার গতি পরিবর্তন করল, অমনি তার মনে হলো, হেরাক্‌ল তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করছেন, তুমি কোথায় গিয়ে লুকিয়ে ছিলে? পরাজয়ের পর সম্রাট হেরাক্‌ল কোন মুডে থাকতে পারেন রাওতাসের তা জানা ছিল। একটুখানি সন্দেহের উপর ভিত্তি করেই আদেশ জারি করতে পারেন, একে জল্লাদের হাতে তুলে দাও। রাওতাস এই বয়সে জল্লাদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিল না। সে ঘোড়ার গতি আবার সেদিকে ঘুরিয়ে দিল, যেদিকে সে যাচ্ছিল।

দিনের শেষ প্রহর। রাওতাস অতিশয় সুন্দর ও সবুজ একটা জায়গা দেখতে পেল। ওখানে ছোট্ট একটা কূপও আছে। গাছগুলো এত ঘন ও গায়ে-গায়ে লাগানো যে, তার মনজুড়ানো শীতল ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। তার তো কোনো গন্তব্য নেই। এমন একটা মনোরম জায়গা দেখে রাওতাস ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল এবং কোমল সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে তার দু-চোখের পাতা বুজে এল। রাওতাস সুগভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

রাওতাসের যখন চোখ খুলল, তখন রাত দ্বি-প্রহর। দ্বাদশীর চাঁদ দিগন্ত ছাড়িয়ে মাথার উপর উঠে আসছে। রাওতাস ভাবল, অনেক তো ঘুমিয়েছি। রাতটা বেশ হিমশীতল। আর সময় নষ্ট না করে রওনা হলেই ভালো হয়; ভোরনাগাদ অনেক পথ এগিয়ে যেতে পারব। রাওতাস ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং সেই গন্তব্যের পানে এগিয়ে চলল, যার সম্পর্কে সে জানেই না, ওই জায়গাটা আদৌ আছে কি নেই। যদি থাকে, তা হলে কোথায় আছে।

রাওতাস এগুতে থাকল আর চাঁদটা আরও উপরে উঠতে থাকল।

এন্থনিস ও লিজা ইউকেলিসকে সেই জায়গাটাতে নিয়ে গেল, যেখানে তারা শোওয়ার জন্য কম্বল পেতেছিল। ইউকেলিসের মনে এখন আর কোনো ক্ষোভ নেই। তার অন্তরে স্বস্তি ও প্রশান্তি ফিরে এসেছে। মা তার প্রতি এতটা মমতা দেখাল যে, এখন সে নিজেকে ছোট্ট খোকাটি মনে করতে লাগল।

তিনজনই শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা ঘোড়ার মৃদু পদশব্দ তাদের কানে আসতে লাগল। তিনজনই সচেতন হয়ে উঠল। শব্দটা ধীরে-ধীরে উচ্চ হতে লাগল। এবার শোনা গেল, কে যেন গান গাইছে। গানের ভাষাটা রোমান। লিজা ফিসফিস কণ্ঠে বলল, কে যেন আমাদের ধরতে আসছে! এন্থনিস বলল, ঘোড়া একটাই বলে মনে হচ্ছে। ও রকম কিছু হলে ঘোড়া একাধিক হতো। এ কোনো পথচারী বলে মনে হচ্ছে। কিংবা হতে পারে, কেউ লড়াই থেকে পালিয়ে এসেছে।

'তুমি এখানেই বসে থাকো লিজা!'– এন্থনিস বলল– 'আমি ও ইউকেলিস লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখব, লোকটা কে। সমস্যা মনে হলে আমরা পেছন থেকে আক্রমণ করব।'

এন্থনিস ও ইউকেলিস অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ওখান থেকে চলে গেল এবং একটা ঝোপালো গাছের তলে লুকিয়ে গেল। তাদের ঘোড়াগুলো টিলার অপর প্রান্তে বাঁধা আছে। আগন্তুক আরোহী অন্য আরেক দিক থেকে আসছে। সে ওই জায়গা দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় লিজার উপর তার চোখ পড়ল। লিজা চিত হয়ে শুয়ে আছে। আচমকা সে ঘোড়ার বাগ টেনে ধরে থেমে গেল। লোকটা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল এবং ঘোড়াটা ওখানেই রেখে ধীরপায়ে লিজার দিকে এগিয়ে গেল।

এখনও সে বুঝতে পারেনি, এ একজন নারী। এ-ই প্রথম মানুষ, যাকে সে এই সফরে দেখতে পেল। কাছে গেলে এবার বুঝতে পারল, এ তো নারী। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সামান্য নত হয়ে তাকাল। এবার লিজা প্রথমে উঠে বসল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল। আগন্তুকের চিত্তটা সহসা অজানা এক আতঙ্কে ভরে উঠল। মহিলাকে সে চিনে ফেলেছে। সম্রাট হেরাক্‌ল-এর স্ত্রী-রক্ষিতারা সর্বত্র ঘুরে বেড়াত এবং যেখানে-সেখানে যেত, যার-তার সঙ্গে মিলিত হতো। সেজন্য সবাই তাদের চিনত। সম্রাটের স্ত্রী হোক বা গণিকা সবাই তাদের রানি বলে ডাকত।

'আপনি?– রানি লিজা?'– আগন্তুক বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল– 'আপনি এখানে? সম্রাটও বোধহয় এখানেই কাছে-পিঠে কোথাও আছেন?'

'তুমি কে?'– লিজা এমন এক প্রভাবদীপ্ত শান্ত স্বরে বলল, যেন সে সত্যিসত্যিই রানি– 'তুমি কোথা থেকে আসছ? কোথায়ই বা যাচ্ছ?'

সম্রাট হেরাক্‌ল-এর একজন স্ত্রী এই বনে একাকি পড়ে আছে! আগন্তুকের জন্য এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। তার মনে প্রতীতি জন্মাতে লাগল, এটা প্রেতাত্মা বা পরী, যে কিনা রানি লিজার রূপ ধারণ করে রেখেছে। তার ভীতি আরও বেড়ে গেল। ভয়ে গা-টা তার ছমছম করে উঠল। দেহের রোমগুলো সব কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে গেল।

'না-না'– লোকটা ভয়কম্পিত ঠোঁটে বলল– 'আপনি জীবন্ত মানুষ হতে পারেন না। আপনাকে তো সম্রাট হেরাক্‌ল-এর সঙ্গে রোমের মাটিতে থাকবার কথা। আপনি কার আত্মা? আমাকে ক্ষমা করে দেবেন; আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিয়েছি কিনা।

বলেই আগন্তুক উলটোপায়ে ওখান থেকে চলে যেতে শুরু করল। ভয়ে লিজার প্রতি পিঠ দিচ্ছে না।

'থামো'– লিজা স্বর পরিবর্তন করে কণ্ঠে প্রবল প্রভাব ও গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল– 'আমার কাছে আস। নাম বলো। তুমি রোমান ফৌজের লোক।'

'আ...– আমার নাম রাওতাস'– লোকটা লিজার কাছে আসতে-আসতে কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠে বলল– 'আমি রোমান ফৌজের একজন অফিসার। মুসলমানরা আমাকে আটক করেছিল। আমি ফেরার হয়ে এসেছি। এ...– এবার কি আমি যেতে পারি?'

রাওতাসের সর্বাঙ্গ ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

এস্তুনিস ও ইউকেলিস গাছের আড়াল থেকে সরে পা টিপে-টিপে রাওতাসের দিকে এগিয়ে গেল। রাওতাস তার সেনাপতি এস্তুনিস ও সম্রাটপুত্র ইউকেলিসকে চিনে ফেলল।

'এসব আমি কী দেখছি!– রাওতাস বিমূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল– 'আপনারা সবাই এখানে কী করছেন?'

'রাওতাস!'– এস্তুনিস তরবারির আগা রাওতাসের বুকে হৃদপিণ্ডের জায়গাটায় স্থাপন করে বলল– 'তুমি কি মনে করছ, আমরা জানি না, তুমি সম্রাট হেরাক্‌ল-এর গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার? আমাদের তুমি ধাওয়া করতে এসেছ একথাটা কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে?'

'আপনি কেমন সেনাপতি'– রাওতাস বলল– 'আপনি জানেন না, আমি আজ তিন-চার মাস যাবত ফৌজ থেকে অনুপস্থিত? আমি হেরাক্‌ল-এর কাছ থেকে নয়– মুসলমানদের বন্দিদশা থেকে ফেরার হয়ে এসেছি।'

রাওতাস মিথ্যা বলল, আমি গোয়েন্দাগিরি করতে হেম্‌স গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে আমার বিভাগের দুজন অভিজ্ঞ লোক ছিল। কিন্তু তারা ধরা পড়েছে আর আমি পালিয়ে এসেছি।

'তা হলে এদিকে কেন এসেছ?'– ইউকেলিস প্রশ্ন করল এবং বলল– হেরাক্‌ল ও তার বাহিনী এদিকে তো আসেনি! এখানে তোমার কাজ কী?'

'এর মুখের চেহারা আর গায়ের পোশাক দেখো'– ইউকেলিসের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই লিজা বলল– 'তিন-চার মাস শত্রুর হাতে আটক থাকা মানুষের চেহারা এত সতেজ থাকে নাকি! স্বাস্থ্য এত তেলতেলে থাকে নাকি! পোশাক-আশাক এত ধোপদুরস্ত থাকে নাকি! কোনো সন্দেহ নেই, এ আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে।'

'আপনি বিশ্বাস করুন'– রাওতাস বলল– 'মুসলমানরা বন্দিদের সঙ্গে অনেক ভালো আচরণ করে। আমার তো মনে হচ্ছে, তারা আমাকে অতিথি বানিয়ে রেখেছিল।'

এস্থনিস তরবারিটা রাওতাসের বুক থেকে সরিয়ে নিল এবং বাঁ হাতে শার্টের কলার ধরে হেঁচকা টান দিল। তারপর তার কটিবন্ধ চেক করে দেখল, যার সঙ্গে একটা তরবারি ঝুলছিল। মুসলমানরা তাকে যথাযথ মর্যাদায় মুক্তি দিয়ে তার তরবারিটাও তাকে দিয়ে দিয়েছিল। এস্থনিস তার কোমরের চারদিকে হাত বুলিয়ে দেখল, সঙ্গে খড়্গ আছে কি-না। খড়্গ পাওয়া গেল না বটে; কিন্তু অন্য একটা বস্তুর উপর তার হাত পড়ল। এস্থনিস বস্তুটা টেনে বের করে আনল। চাঁদের আলোয় চমকানো জিনিসটা দেখে সেটা লিজার প্রতি এগিয়ে ধরল।

'এই ক্রুশ এর মিথ্যাবাদিতাকে সপ্রমাণিত করছে'– 'এস্থনিস বলল– 'এটি কার, সেও আমি জানি।'

এই বস্তুটা সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে গনিমত হিসেবে গিয়েছিল। ছিল কোনো এক রোমান সেনা-অফিসারের কাছে, যে কিনা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। এস্থনিস সেই অফিসারের নাম উল্লেখ করে লিজা ও ইউকেলিসকে জানাল, এটি সব সময় তার সঙ্গে থাকত।

'এবার ভেবো একবার'– এস্থনিস বলল– 'এ যদি মুসলমানদের কারাগারে আটকই থাকত, তা হলে কি তারা এমন ভারী ও মূল্যবান জিনিসটা এর সঙ্গে থাকতে দিত?' এস্থনিস রাওতাসের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সত্য বলছ না কেন?'

রাওতাসের উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই এস্থনিস তার কটিবন্ধ থেকে তরবারিটা টেনে বের করে নিয়ে নিল এবং পুনরায় বলল, সত্য বলো; অন্যথায় তোমার লাশটা এখানেই পড়ে থাকবে আর বনের হিংস্র পশুরা তাকে খুলে-খাবলে খেয়ে ফেলবে।'

'আমি আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে ফিরছি'– রাওতাস এবার সত্য বলা শুরু করল– 'আমি জানি সম্রাট হেরাক্ল পিছপা হয়ে কোন দিক গেছেন। আমি ওদিকে যাব না। কিন্তু কোথায় যাব, তাও আমার জানা নেই। আমি গুপ্তচরবৃত্তির জন্য গিয়েছিলাম। সঙ্গে যে-পরিচয়পত্রটা ছিল, সেটা মুসলমানরা রেখে দিয়েছে।'

রাওতাস কোনো প্রকার মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে একদম সত্য ও সঠিকভাবে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিল যে, সে কীভাবে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছিল এবং কীভাবে তাদের কয়েদখানায় ঠাঁই নিয়েছিল।

'আমি সম্রাট হেরাক্‌ল-এর এক কন্যার প্রতারণাজালে আটকে গিয়েছিলাম'– রাওতাস বলল– 'শারিনার কথা আপনাদের মনে আছে নিশ্চয় । সে ওখানে উপস্থিত ছিল । মেয়েটা আমাকে কারাগার থেকে রক্ষা করে একটা আরামদায়ক কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করেছিল । সে আমার সঙ্গে এমন হৃদ্যতা ও প্রেমপূর্ণ আচরণ করল যে, আমি তার ফাঁদে আটকে গেলাম এবং আমার ফৌজের গোপন তথ্য ও দুর্বলতাগুলো মুসলমানদের বলে দিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলমানরা আমার দেওয়া তথ্যগুলোকে পাই-পাই কাজে লাগিয়েছে । এই ক্রুশ তারই উপঢৌকন, যেটি তাদের সিপাহসালর আমাকে প্রদান করেছেন ।'

এন্থনিস ও লিজা রাওতাসের এই বক্তব্য ও বিবরণকে সত্য বলে মেনে নিল । এন্থনিস বলল, যদি কখনও কোনো উলটা-পালটা দেখি বা আমাদের সঙ্গে যদি কোনো ধোঁকা-প্রতারণার আশ্রয় নাও, তা হলে আর কোনো কথা হবে না । এই তরবারি দ্বারা জায়গাতেই তোমাকে হত্যা করা হবে । রাওতাস তাদের নিশ্চয়তা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? এন্থনিস তার পরিকল্পনার কথা সত্য-সত্য বলে দিল ।

'আমাকে আপনারা একজন নিবেদিতপ্রাণ সঙ্গী হিসেবে পাবেন'– রাওতাস বলল– 'আমি দিকহারা পথিক ছিলাম। আপনি আমাকে গন্তব্য দেখিয়েছেন। ওই কাবায়েলি নেতাদের আমি আপনার চেয়েও ভালো জানি ।'

রাত পোহাতে আর অল্প বাকি । তারা কিছু সময়ের জন্য শুয়ে থাকল এবং ভোরের আলো ফোটার আগে-আগেই উঠে ওখান থেকে রওনা হলো ।

* * *

ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী সুবিস্তৃত অঞ্চল আল-জাযিরার খ্রিস্টান গোত্রগুলোর উত্থিত মস্তকগুলো বিচূর্ণ করা হচ্ছে । সেখানে চমৎকার একটা পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে বনু তাগলিব ।

বনু তাগলিবের অঞ্চলটার অবস্থান শাম-ইরাকের সীমান্ত ও ফোরাত নদীর মাঝামাঝি একস্থানে । এর কিছু অঞ্চল শামেও ছিল । অঞ্চলটা মরুময় । আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) বনু তাগলিবের মূলোৎপাটনের দায়িত্ব সালার অলীদ ইবনে উক্‌বার হাতে অর্পণ করেছিলেন। বনু তাগলিব বেশ কটা লোকালয়ের আদলে বসবাস করত। তার দু-তিনটা বসতি ছিল দুর্গঘেরা। এই বসতিগুলো দেখলে আনতে সালার অলীদ ইবনে উক্‌বাকে অনেকগুলো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল । সবচেয়ে বড় সমস্যাটা ছিল, বনু তাগলিবের লোকগুলো সত্যিকার অর্থেই যুদ্ধবাজ ছিল । ছিল তারা আরব বংশোদ্ভূত । মুজাহিদদের যে-বাহিনী প্রথমে মুছান্না ইবনে হারিছা ও পরে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে ইরানসম্রাটের শক্তিশালী বাহিনীকে প্রতিটি ময়দানে পরাজিত করেছিল, বনু তাগলিবের কিছু

খ্রিস্টান সেনাও সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের কেউ-কেউ বীরত্বের অতিশয় বিস্ময়কর কীর্তি প্রদর্শন করেছিল।

এখন বনু তাগলিব হেরাক্ল-এর প্ররোচনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল। একদিকে ইরাকের উপর মুসলমানদের দখল পরিপূর্ণ হয়ে গেল, অপরদিকে শামে বিদ্রোহের মাধ্যমে বনু তাগলিব মুসলমানদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বসল।

সালার অলীদ ইবনে উক্‌বার নেতৃত্বে মুজাহিদরা যখন বনু তাগলিবের এলাকায় গিয়ে হানা দিল, তখন তাদের সেনারা বীরত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করল বটে; কিন্তু কোথাও পা জমাতে পারল না। মুজাহিদগণ একটি সুবিধা পেয়ে গিয়েছিলেন যে, রোমান ও ইরানিদের বিপুলসংখ্যক ঘোড়া তাদের হাতে এসেছিল। এই সুবাদে মুজাহিদদের অধিকাংশই অশ্বারোহী ছিলেন। বিশেষ আরও একটি সুবিধা ছিল, তাঁরা এখানে এসেছিলেন সম্রাট হেরাক্লকে পরাজিত করে, যেটি সে-সময়কার জন্য বিস্ময়কর একটি ঘটনা ছিল। কারণ, হেরাক্ল-এর সামরিক শক্তি ছিল একটা আতঙ্কের নাম। মুজাহিদরা এই শক্তিটিকে শাম মুল্লুকের বন-বিয়াবানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে মুজাহিদদের সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সবার অন্তরে তাদের প্রভাব বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

আল-জাযিরার খ্রিস্টান গোত্রগুলো যুদ্ধ করতে ময়দানে অবতীর্ণ হচ্ছিল বটে; কিন্তু তারা বেশি সময় টিকতে পারছিল না। বনু তাগলিবেরও একই পরিণতি ঘটল। তিন-চারটা যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করার পর এবার তাদের নেতারা সন্ধি করতে এল এবং মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিল। সালার অলীদ ইবনে উক্‌বা বনু তাগলিবের নেতাদের বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাও। বনু তাগলিবকে উক্ত গোত্রগুলোর মাঝে সর্বাধিক যুদ্ধবাজ ও সম্ভ্রান্ত গোত্র মনে করা হতো। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানাল। অলীদ ইবনে উক্‌বা বললেন, ইসলাম আপনাদের গ্রহণ করতেই হবে। অন্যথায় আপনাদের উপর এমন কঠোরতা আরোপ করা হবে, যা সহ্য করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। নেতারা সবাই একমত হয়ে বলল, ঠিক আছে; আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) যে-সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, আমরা তা-ই মেনে নেব।

সালার অলীদ ইবনে উক্‌বা (রা.) তখনই আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)কে বার্তা পাঠালেন। তাতে তিনি লিখলেন, আমি বনু তাগলিবকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, আপনি যা সিদ্ধান্ত দেবেন, তারা তা-ই মেনে নেবে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও করেছেন। তিনি উত্তর পাঠালেন, বনু তাগলিবকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ভার তাদেরই উপর ছেড়ে দিতে

হবে। তবে নেতাদের বলে দিতে হবে, যদি গোত্রের কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে, তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

ইতিহাসে আছে, সালার অলীদ ইবনে উক্‌বা যখন হযরত ওমর (রা.)-এর এই সিদ্ধান্ত বনু তাগলিবকে পাঠ করে শোনালেন, তখন তাতেই প্রভাবিত হয়ে একাধিক খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) বার্তায় একথাও লিখেছেন, বনু তাগলিব থেকে জিযিয়া উসুল করে তাদেরকে 'যিম্মি' সাব্যস্ত করতে হবে। কিন্তু নেতারা জিযিয়া দিতেও অস্বীকার করল এবং বলল, আমাদেরকে যিম্মি বলতে পারবেন না।

'শোনো বনু তাগলিব!'– অলীদ ইবনে উক্‌বা বললেন– 'আমরা তোমাদের জন্য আমাদের আইন ও সংবিধান বদলাতে পারব না। এমনটা হবে না যে, তোমরা এক-একটা বিষয়ে হঠকারিতা দেখাতে থাকবে আর সিদ্ধান্তের জন্য আমি বিষয়টা মদীনায় আমীরুল মুমিনীনের কাছে পাঠাতে থাকব। জিযিয়া তো আমি কখনও রহিত করতে পারব না।'

'আমরা অর্থ দিতে অস্বীকার করছি না'– এক নেতা বলল– 'আপনি আমাদের থেকে জিযিয়ার চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ নিন; আমরা দেব। আমাদের দাবি হলো, এই অর্থকে 'জিযিয়া' বলতে পারবেন না।'

অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, বনু তাগলিবের একটি প্রতিনিধিদল আমীরুল মুমিনীনের কাছে মদীনায় যাবে এবং আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সেখানেই নিষ্পত্তি করে আসবে।

সেদিনই বনু তাগলিবের একটি প্রতিনিধিদল মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। দলে বনু তাগলিবের একজন নওমুসলিমও ছিলেন। সালার অলীদ ইবনে উক্‌বা তাঁর একজন প্রতিনিধিও সঙ্গে প্রেরণ করলেন।

মদীনা পৌঁছে এই প্রতিনিধিদল আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে দেখা করল এবং দাবি উপস্থাপন করল, আপনি অর্থ যা ধার্য করবেন, পরিমাণ যা-ই হোক আমরা পরিশোধ করব। এমনকি যদি তা জিযিয়ার চেয়েও বেশি হয়, তবু আদায় করব। কিন্তু তাকে জিযিয়া বলতে পারবেন না।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমরা জিযিয়া যা ধার্য করেছি, তা-ই নেব– তার চেয়ে বেশি নেব না এবং তাকে 'জিযিয়া'ই বলব।

'কিন্তু আমরা তাকে 'অনুদান' বলতে চাই।' বনু তাগলিবের এক বর্ষীয়ান নেতা বলল।

'তোমরা তাকে যা-খুশি নাম দিতে পার'– হযরত ওমর (রা.) বললেন– 'আমাদের সংবিধান অনুযায়ী তার নাম 'জিযিয়া'ই থাকবে। কিন্তু আমার অবাক লাগছে, তোমরা একটা নিরর্থক বিষয় নিয়ে জিদ ধরেছ!

'আমীরুল মুমিনীন!'– বর্ষীয়ান নেতা বলল– 'আপনাকে আমরা আমীরুল মুমিনীন মানছি। কিন্তু সঙ্গে এই আবেদনও পেশ করছি, আপনি আমাদের সামাজিক মর্যাদা ও জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ন থাকতে দিন। আপনি জানেন বনু তাগলিব কত বড় একটি উঁচু নাম। জিযিয়াকে অপমান ও লাঞ্ছনা মনে করা হয়। আপনি ভুলবেন না যেন, এই গোত্রের লোকেরা আপনার বাহিনীতে যুক্ত হয়ে আপনাদের পক্ষে ইরানসম্রাটের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এখনও আমরা আপনার হয়ে লড়াই করব। আমরা আপনার আনুগত্য মেনে নিয়েছি। আপনি আমাদের থেকে অর্থ নিন; তবে আমাদের মর্যাদা ও ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন থাকতে দিন।'

কিন্তু হযরত ওমর (রা.) আপন সিদ্ধান্তে অটলই থাকলেন। কিছুটা তিক্ততা তৈরি হতে শুরু করল। এবার হযরত আলী (রা.) হযরত ওমর (রা.)কে এক সালারে সা'দ ইবনে মালেক (রা.)-এর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলেন। ইনি একটা অঞ্চল জয় করে ওখানকার লোকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণের পরিবর্তে 'অনুদান' নামে দ্বিগুণ অর্থ গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) অকারণে আপন মতের উপর জিদ ধরতেন না। হঠকারিতা তাঁর চরিত্রে ছিল না। যৌক্তিক কারণ পাওয়া গেলে তিনি নিজের মত প্রত্যাহার করে নিতে দ্বিধা করতেন না। এবার তাঁর এই ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। সেইসঙ্গে তাঁর অন্তরে এই ভাবনাও জাগ্রত হলো যে, এই গোত্রটি একটি সামরিক শক্তি, যারা প্রয়োজনের সময় আমাদের কাজে আসতে পারে। এসব ভেবে তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, ঠিক আছে; তোমরা অনুদানই দাও। তবে অর্থ জিযিয়ার দ্বিগুণ দিতে হবে।

বনু তাগলিবের নেতারা খুশি মনে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিল এবং তখনই অনুদানের অর্থ আদায় করে দিল।

এভাবে এই শক্তিশালী গোত্রটিও মুসলমানদের শাসনাধীনে এসে পড়ল এবং গোত্রের লোকেরা ধীরে-ধীরে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে শুরু করল।

এস্থনিস, রাওতাস, লিজা ও ইউকেলিস হালবের কাছাকাছি একটা লোকালয়ে পৌঁছে গেল। এটা বনের মাঝে গোটাকতক পরিবারের একটা বসতি। তারা বনু রবিয়ার লোক। তারা এস্থনিস ও তার সঙ্গীদের দেখে সবাই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। বোধহয় তারা বুঝে ফেলেছে, এরা রোমান। রোমানদের ব্যাপারে এদের মনোভাব ভালো নয়।

এস্থনিস ও রাওতাস দীর্ঘ সময় আল-জাযিরায় অবস্থান করেছে। সেই সুবাদে তারা তাদের ভাষাও জানে। তারা বসতির অধিবাসীদের বলল, আমরা তোমাদের নেতৃস্থানীয় কারও সঙ্গে দেখা করতে চাই। লোকেরা তাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল। এখানে একজন বয়োঃবৃদ্ধ লোক তাদের অভ্যর্থনা জানাল এবং তাদের

সম্মানের সাথে বসাল। বৃদ্ধকে সাধারণ ও গরিব লোক বলে মনে হলো না। কথার ধরনে প্রতীয়মান হলো, সমাজে সে বেশ মর্যাদাসম্পন্ন ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়।

'তোমরা রোমান'– বৃদ্ধ বলল– 'আমাদের অন্তরে এখন রোমানদের সেই মর্যাদা নেই, যেমনটি তাদের পরাজয়ের আগে ছিল। কিন্তু তারপরও বাস্তবতা হলো, তোমরা আমাদের অতিথি; আমরা তোমাদের ইজ্জত করব। তোমরা কোথাও যাচ্ছ নাকি? আমাদের কোনো ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন আছে নাকি তোমাদের? যদি পথ হারিয়ে থাক, তা হলে বলো, আমরা তোমাদের পথে তুলে দেব।'

'না জনাব!– এন্থনিস বলল– 'আমরা পথ ভুলিনি। আমরা নতুন একটি পথ রচনা করতে এসেছি। আমাদের আপনার ও আপনার গোত্রের সাহায্য দরকার।'

'বলো'– বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল– 'কেমন সাহায্য দরকার তোমাদের? আমি তোমাদের নিরাশ করব না।'

'আমরা নিজেদের জন্য কিছুই চাই না'– এন্থনিস বলল– 'আমরা আপনাদের জাতির জন্য কিছু করতে চাই। হেরাক্‌ল পালিয়ে গেছেন। তার বাহিনী মুসলমানদের হাতে কচুকাটা হয়েছে। যে-কজন রক্ষা পেয়েছে, তারাও যার-যার মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে যে, এখন আর বাহিনীর কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি রোমান ফৌজের একজন সেনাপতি। আমার এই সঙ্গীকেও একজন সেনাপতিই মনে করুন। এই মহিলা আর এই ছেলেটা কে এ প্রশ্নের উত্তর না হয় পরেই দিই। আপাতত এটুকু বলে রাখি, আপনি আমাদের রোমান মনে করবেন না– আমাদেরকে আপনার সমধর্মীয় লোক মনে করুন। হেরাক্‌ল আগে রাজা, তারপর খ্রিস্টান। আর তাও নামমাত্র। কিন্তু আমরা আগে খ্রিস্টান, পরে রোমান।

এন্থনিস বৃদ্ধকে সেই ক্রুশটা বের করে দেখাল, যেটা সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) রাওতাসকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেছিলেন।

'এই যে দেখুন ক্রুশটা'– এন্থনিস বলল– 'এর গায়ে যাঁর প্রতিকৃতি সাঁটানো আছে, আমরা তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এটি রোম-ইরানের রাজত্বের মতো হবে না। এটি যিশুখ্রিস্টের রাজত্ব হবে। যদি আল-জাযিরার সবগুলো খ্রিস্টান গোত্র ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তা হলে আমি আর আমার এই সঙ্গী দুজনে মিলে তাদের একটি শক্তিশালী বাহিনীতে সুসংগঠিত করব। তারপর অতি অল্প সময়ে আমরা মুসলমানদের শাম থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।'

বৃদ্ধর পাংশু মুখে খুশির আভা আর ওষ্ঠাধরে মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠল। মনে হলো, বৃদ্ধ নিজেও এন্থনিসের এই চিন্তার সঙ্গে একমত। সেও এমনই একটি বিপ্লবের স্বপ্ন হৃদয়ের গহীনে লালন করে আসছে। তারপর আলোচনা সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

'আমরা একবার ইরানিদের গোলাম হয়ে যাই'– বৃদ্ধ বলল– 'আবার রোমানরা এসে আমাদেরকে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে। আর এখন মুসলমানরা এসে আমাদের পদানত করে নিল। এখানকার সমস্ত অঞ্চলের খবরাখবরই আমার কাছে আসে। আমাদের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করেছে বটে; কিন্তু করেছে আলাদা-আলাদাভাবে– যার-যার মতো করে। ফলে কোনো-কোনো গোত্র অস্ত্রসমর্পণ করে পুনরায় তাদের আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। বনু তাগলিবের মতো শক্তিধর গোত্রটিও মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এখন বাকি আছে শুধু হালব, যেখানে এখনও কিছু ঘটেনি। আর আছে বনু রবিয়া ও বনু তানুখ। আমরা যদি হাল্‌বে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারি আর মুসলমানদের ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হই, তা হলে সবগুলো গোত্র হালে পানি পেয়ে যাবে। তারা সাহস ফিরে পাবে এবং আমাদের পতাকার তলে এসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।'

'আপনি কি সবগুলো গোত্রের নেতাদের এখানে সমবেত করতে পারেন?'– এস্থনিস বলল– 'আমরা এখনও জনসমক্ষে বের হতে চাই না। হেরাক্‌ল-এর গোয়েন্দারা আমাদের হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরে থাকবে।'

'এখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই'– বৃদ্ধ বলল– 'যতক্ষণ তোমরা আমাদের কাছে আছ, এখানে তোমাদের প্রতি চোখ তুলে তাকাবারও কেউ সাহস পাবে না। কোনো গোত্রপতিকে এখানে ডেকে আনবার প্রয়োজন নেই। আমরা তোমাদেরকে হাল্‌ব পৌঁছিয়ে দেব আর নেতারা তোমাদের কাছে চলে আসবে। আমরা তোমাদেরকে আমাদের পোশাক পরিয়ে দেব। তোমরা গরিব কৃষক ও দিনমজুরের বেশে হাল্‌ব ঢুকে যাবে।

সাত

হালবের মতো এমন বৃহৎ ও দুর্গঘেরা নগরীটা মুসলমানরা কেন এত উপেক্ষিত করে রেখেছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসে পাওয়া যায় না। নগরীর বসতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আল-জাযিরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পলায়িত খ্রিস্টান কাবায়েলিরা হালবে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল। কয়েকটি গোত্রের কয়েকজন অধিপতিও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তবে বিদ্রোহের কোনো লক্ষণ ওখানে তখনও পরিলক্ষিত হচ্ছিল না।

এস্থনিস, রাওতাস, লিজা ও ইউকেলিস যখন হালবে প্রবেশ করল, তখন কেউ তাদের ভালোভাবে দেখলও না। দেখবার প্রয়োজনই কারও মনে অনুভূত হলো না। শত্রুর হাতে বাস্তুভিটা ধ্বংস হওয়া শরণার্থীরা তো হালবে বানের স্রোতের মতো আসছেই। এস্থনিস ও তার সঙ্গীদেরও তেমনই উদ্বাস্তু শরণার্থী মনে করা হলো।

তাদের সঙ্গে বৃদ্ধের প্রেরিত বিশেষ দুজন লোকও ছিল, যারা তাদের এক নেতার ঘরে নিয়ে গেল।

হালবে গিয়ে তারা জানতে পারল, তারা যে-বৃদ্ধের ঘরে গিয়ে উঠেছিল, তিনি কোনো সাধারণ মানুষ নন। তিনি এই গোত্রগুলোর সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, যাকে প্রতিটি গোত্রের অধিপতিরাও গুরু বলে মান্য করে। সেই সুবাদেই এস্থনিস ও তার সঙ্গীরা যে-নেতাদের কাছে গেল, তারা তাদের যথাযথ সম্মানের সাথে বরণ করে নিল যে, এরা আমাদের গুরুর পাঠানো লোক।

এস্থনিস নেতাদের সঙ্গে কথা বলল। প্রাথমিক আলাপের পর যখন তারা ব্যাপারটি বুঝতে পারল, তখন আরও তিন-চারজন নেতাকে ডেকে আনল, যারা হালবেই অবস্থান করছিল।

এস্থনিস তার চিন্তা ও প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেই বুঝতে পারল, কাবায়েলি নেতারা আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুত। ফলে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বেশি কথা বলতে হলো না, বেশি সময় নিতে হলো না। এবার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই সামরিক অভিযানের শুরুটা কীভাবে করা যায়। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় হলো। অবশেষে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়ে গেল।

সে অনুসারে নেতারা তাদের বিশেষ লোকদের ডেকে পাঠাল এবং তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে একজনকে এক দিকে পাঠিয়ে দিল। হালব দুর্গে আগত শরণার্থীদের সংখ্যা দিন-দিন বেড়েই চলছে। উদ্বাস্তু মানুষরা কেবলই আসছে। যেকজন মুজাহিদ নগরীতে বিদ্যমান ছিলেন, তারা দেখবারই প্রয়োজনই বোধ করলেন না, এই শরণার্থীদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও আসছে নাকি। কিন্তু মানুষও আসছে, সঙ্গে অস্ত্রও আসছে। অস্ত্রগুলোর বেশিরভাগই বর্শা। ধনুক আর তিরভর্তি তূনীরও কম আসছে না। কেউ আনছে প্রকাশ্যে, কেউ লুকিয়ে।

রোমানরা এই নগরী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের ঘর-বাড়ি ও সামরিক ব্যারাকগুলো শূন্য পড়ে ছিল। শরণার্থীরা এসে-এসে সেগুলোতেই আশ্রয় গ্রহণ করছিল। এখন তাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, তাতে আর সংকুলান হচ্ছে না। ফলে এখন তাঁবু বসাতে হচ্ছে। এস্থনিস নেতাদের সামরিক ধরনের নির্দেশনা প্রদান করছে। নেতারা সেসব নির্দেশনা তাদের খাস লোকদের বুঝিয়ে দিচ্ছে। এভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাগুলো চেইন কমান্ডের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আর সবাই সে মোতাবেক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

এস্থনিস বা তার কোনো সঙ্গীকে মুসলমানরা চেনে না। লিজা আর ইউকেলিস তো রাজপরিবারের সদস্য ছিল। মুসলমানরা তাদের চেনবার তো কথা-ই নয়। অবশ্য ইউকেলিসকে প্রায় সকল খ্রিস্টানই চেনে। এটিও একটি কারণ যে, কাবায়েলি

নেতারা এন্থনিসের প্রস্তাবে এত তাড়াতাড়ি সম্মত হয়ে গেল। ইউকেলিস এক কাবায়েলি মেয়েকে কুস্তুন্তিনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এমনকি এর জন্য সে তরবারি পর্যন্ত উত্তোলিত করেছিল। রক্ষীবাহিনীর এক অফিসার মধ্যখানে এসে না পড়লে দুই ভাইয়ের একজনকে নির্ঘাত প্রাণ হারাতে হতো। এদের একটি মেয়ের সম্ভ্রম রক্ষায় ইউকেলিস নিজের ও আপন ভাইয়ের জীবনের ঝুঁকি বরণ করে নিয়েছিল। আর এখন কিনা সে পিতার সঙ্গ ত্যাগ করে এবং রাজমহলের আয়েশ বিসর্জন দিয়ে এদের কাছে চলে এসেছে। সকল খ্রিস্টান ইউকেলিসকে মর্যাদার চোখে দেখতে শুরু করল।

* * *

লিজা প্রায়ই রাতের বেলা বের হয়ে দুর্গের পাঁচিলে উঠে ঘোরাফেরা করছে। ইউকেলিস একটি টগবগে তরুণ ছেলে। একটি ঘরে আটকে থাকা তো তার পক্ষে সম্ভবই নয়। আর এভাবে আত্মবন্দি হয়ে থাকবার দরকারই বা কী। এই নগরীতে যেকজন মুসলমান আছে, তাদের কেউই তাকে চেনে না। কাজেই ভয়ের কোনো কারণ নেই।

একদিন ইউকেলিস নগরী ছেড়ে বেরিয়ে এল এবং বিনোদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হাঁটতে-হাঁটতে একদিকে চলে গেল। ওদিকে সবুজের সমারোহ ছিল। চোখজুড়ানো বড়-বড় বৃক্ষরাজি ছিল। একজায়গায় টলটলে স্বচ্ছ পানির একটি কূপ ছিল। সবুজে ভরা শস্যক্ষেতও ছিল। ইউকেলিস এই প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য উপভোগ করছে আর পুলকিত মনে পা-পা করে হাঁটছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, খানিক দূর থেকে চার-পাঁচটি মেয়ে হেসে-খেলে এদিকে আসছিল। কিন্তু ইউকেলিসকে দেখে তারা দাঁড়িয়ে গেল। ইউকেলিস তাদের পানে তাকাল। হঠাৎ একটি মেয়ে দৌড়ে তার কাছে চলে এল। ইউকেলিস মেয়েটিকে ঠিক চিনতে পারল না।

'তুমি নিশ্চয় সেই লোক'– ছুটে এসে মেয়েটি লাজুক মুখে ইউকেলিসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল– 'তোমাকে আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। তুমি আমার ইজ্জত রক্ষা করেছ। তুমি না হলে সেদিন...।'

'সে আমার কর্তব্য ছিল'– ইউকেলিস মেয়েটিকে চিনে ফেলল এবং মিটিমিটি হেসে বলল– 'আমার তো তোমার চেহারাটা মনেই ছিল না।'

অতিশয় সরল-সহজ ও সুন্দরী একটি মেয়ে। সবে তারুণ্যের কোটায় পা পড়েছে। আবেগের আতিশয্যে মেয়েটি ইউকেলিসের হাতদুটো ধরে ফেলল। কিন্তু ধরেই অনুভব করল, লোকটার বাঁ হাতটা ডান হাত থেকে অনেকটা ব্যতিক্রম। সে ইউকেলিসের হাতদুটো টেনে উপরে তুলে নিজের চোখের সঙ্গে লাগিয়ে চুমো খেল। তারপর বাঁ হাতটা ভালোভাবে নিরীক্ষা করে দেখল। ইউকেলিস তাকে জানাল,

আমার এই হাতটা জন্মগতভাবেই এমন নিষ্কর্মা ও শুষ্ক। সহসা মেয়েটির উজ্জ্বল মুখ বিষণ্নতায় ভরে উঠল এবং চোখদুটো অশ্রুতে ছলছল করে উঠল।

'আমি তোমাকে বরাবরই স্বপ্নে দেখি'– মেয়েটি বলল– 'যখনই মনে ভাবনা আসে, আমি জীবনেও আর তোমাকে দেখতে পাব না, তখন অন্তরটা বেদনায় খাঁ-খাঁ করে ওঠে। তোমার মতো সচ্চরিত্রবান ও সদাশয় লোকদের আমি আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি।'

'আমি যাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম, ও আমার বড় ভাই ছিল'– ইউকেলিস বলল– 'আমার একটা বাহু নেই। তারপরও তরবারি দ্বারা, বর্শা দ্বারা, কুড়াল দ্বারা দু-তিনজন মানুষের মোকাবেলা করতে পারি।'

'শুনেছি, তুমি নাকি রাজার ছেলে'– মেয়েটি বলল– 'তিনি তো পালিয়ে গেছেন। তা তোমরা এখানে কী কাজে এসেছ?'

'আমি রাজত্বকে ছুড়ে ফেলে এসেছি'– ইউকেলিস বলল– 'সেদিন আমি একা তোমার ইজ্জত রক্ষা করেছি। এখন তোমার কবিলার ইজ্জত বাঁচাতে এসেছি। এখন আমি এখানেই থাকব।'

এই মুহূর্তে মেয়েটির মুখে যে-প্রতিক্রিয়া ফুটে আছে, তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে, তার স্বপ্নের শাহজাদা যে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, সে তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। অন্য মেয়েগুলো খানিক দূরে সামান্য আড়ালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এদের কার্যকলাপ অবলোকন করছিল। মেয়েটি পেছনপানে তাকিয়ে ওদের ইঙ্গিত করতেই ওরা চলে গেল আর কিছুক্ষণ পর ইউকেলিস ও মেয়েটি কূপের কিনারায় একটি ফুলশোভিত ঝাড়ের কাছে গিয়ে পাশাপাশি বসে পড়ল। তারা একজন অপরজনকে আপন-আপন বাহুতে জড়িয়ে ধরল।

সেদিনের পর মেয়েটি ইউকেলিসের সঙ্গে একাধিকবার মিলিত হলো। মেয়েটি এক গোত্রপতির কন্যা। তার চলাফেরা অবাধ। ইউকেলিসের সঙ্গে দেখা করতে দিনেও আসছে, রাতেও আসছে। রাতে এসে দুজন দুর্গের পাঁচিলের উপর উঠে পায়চারি করছে। এখন যেন তারা দুজনে দুজনার হয়ে গেছে। ইউকেলিস তাকে অবহিত করেছে, তারা এখানে কী করতে এসেছে এবং কী করছে। মেয়েটি তাকে আকাশ থেকে নেমে আসা দেবদূত ভাবতে শুরু করেছে।

'আমার মনের একটি সংশয় তুমি কীভাবে দূর করবে বলো'– একরাতে পাঁচিলের উপর দুজন পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে মেয়েটি বলল– 'যে-রাজত্ব তোমরা প্রতিষ্ঠা করতে এসেছ, সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তুমি তো শাহজাদা হয়ে যাবে আর আমাকে ভুলে যাবে। তখন তোমার কাছে আমার কাছে কোনোই মর্যাদা থাকবে না! বলো এর সমাধান কী?'

ইউকেলিস মুখে কোনো উত্তর দিল না। মেয়েটিকে টেনে নিজের সঙ্গে লাগিয়ে কাজে-কর্মে নিশ্চয়তা দিল, আমি কোনোদিনই তোমাকে ভুলব না। আমি যত উপরেই উঠি-না কেন, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। ইউকেলিস মেয়েটিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে এমনভাবে চাপ দিল, যেন তার পাঁজরের হাড়গুলো সব ভেঙে ফেলে তাকে নিঃসংশয় করতে চাইছে, কোনো অবস্থাতেই আমি তোমার হাতছাড়া হব না।'

* * *

এস্থনিস যুদ্ধ শুরু করার জন্য যে-রাত নির্ধারণ করেছিল, সে-রাতেই কাবায়েলিরা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সেই মুজাহিদদের কাবু করে ফেলল, যাঁরা দুর্গে অবস্থানরত ছিলেন। তাঁরা যিনি যেখানে ছিলেন, সবাই নিশ্চিন্তমনে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। যে-কজন কাবায়েলিকে এ-কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তারা এস্থনিস ও রাওতাসের নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ অনুসারে যার-যার জায়গায় পৌঁছে গেল এবং কোনো রকম মোকাবেলা করার সুযোগ না দিয়েই মুজাহিদদের আটকে ফেলল এবং তাঁদেরকে একটি মজবুত ফটকওয়ালা ঘরে বন্দি করে রাখল।

নগরীর প্রধান ফটকে দুজন মুজাহিদ পাহারায় নিয়োজিত থাকতেন। তাঁরা কোনোভাবে টের পেয়ে গেলেন, নগরীতে বিদ্রোহ হয়ে গেছে এবং তাঁদের সঙ্গীরা আটক হয়েছেন। তাঁরা ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু অপর কয়েকজন কাবায়েলি তাঁদের উপর আক্রমণ করে বসল। দুজনে জমে মোকাবেলা করলেন এবং আহত হয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন। দুর্গ থেকে তিন মাইল দূরে একটি বসতি ছিল। তাঁরা ওখানে পৌঁছে গেলেন এবং ওখান থেকে দুটি ঘোড়া নিয়ে তাতে আরোহণ করে একদিকে ছুটতে শুরু করলেন। ওখান মাইলবিশেক দূরে কানসারিন নগরী। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) তখন কানসারিনে ছিলেন। এটি একটি শক্ত দুর্গ এবং বেশ বড়সড় একটি শহর। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) রোমানদের তাড়িয়ে দিয়ে এই শহরটি দখল করেছিলেন। উভয় মুজাহিদ আহত শরীর নিয়ে পরদিন কানসারিন পৌঁছে গেলেন এবং হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)কে সংবাদ জানালেন, হালবে বিদ্রোহ হয়ে গেছে।

খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)কে সংবাদ জানাতে একজন দূত পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বাহিনী প্রস্তুত করে হালবের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর যুদ্ধাভিযান হতো প্রবল ঝড়ের গতিতে। তিনি বাহিনী নিয়ে আগে রওনা হয়ে গেলেন আর উট ও ষাড়ের গাড়িতে করে রসদ পেছনে আসছিল, যেদিকে তাঁর কোনোই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। প্রয়োজন হলে তিনি পানাহার ছেড়ে দিয়ে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অবস্থায়ও গন্তব্যে পৌঁছে যেতে চেষ্টা করতেন।

এই বাহিনীটি যখন হালব গিয়ে পৌঁছুল, তখন হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর মতো ইতিহাসনির্মাতা রণপতিও অনুমান করলেন, এই দুর্গ সহজে জয় করা যাবে না। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়াকিদি লিখেছেন, দূর-দূরান্তের গোত্রগুলোর লড়াকু সদস্যরাও হালব এসে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা যথাসময়ে ব্যাপারটি বুঝতে পারেননি। নগরীতে কারা প্রবেশ করছে, বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা-ই তারা অনুভব করেননি। মুসলমানরা তাদের শরণার্থী মনে করছিলেন এবং লক্ষ রাখা আবশ্যক মনে করছিলেন, যেন তাদের এখানে থাকতে কোনো প্রকার কষ্ট না হয়। কিন্তু এখন সেই লোকগুলোই দুর্গের চারদিকের পাঁচিলের উপর তির-ধনুক ও বর্শা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সংখ্যা এত বেশি যে, তাদের ফাঁক গলে বাতাসও অতিক্রম করতে পারছে না। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর সৈন্য চার হাজার। তিনি পাঁচিলের উপর দণ্ডায়মান বিদ্রোহীদের উপর তির ছুড়লেন। কিন্তু উপর থেকে যে-তিরগুলো এল, তার সম্মুখে তাঁর তিরন্দাজরা দাঁড়াতেই পারলেন না।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর কাছে আরও একজন দূত পাঠিয়ে দিলেন যে, এখানে আরও সৈন্য প্রয়োজন। কারণ, দুর্গ খুব মজবুত এবং প্রতিরক্ষাও বেশ শক্ত। পরিস্থিতি নাজুক ও ভয়াবহ বলেই অনুমিত হচ্ছে।

আবু উবায়দা (রা.) সালার ইয়াজ ইবনে গানাম (রা.)কে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে হালব পৌঁছে যেতে আদেশ করলেন।

এই বাহিনী ঝটপট প্রস্তুত হয়ে অতিশয় দ্রুতগতিতে রওনা হয়ে গেল।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) দুর্গভাঙা ও দুর্গজয়ে বেশ পারদর্শী ছিলেন। এ-কাজের জন্য তিনি একটি জানবাজ দল তৈরি করে রেখেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের এই মহান সেনাপতি অবরোধকে দীর্ঘতা দানের পক্ষপাতী ছিলেন না। ওয়াকিদি লিখেছেন, কিন্তু এই অবরোধ খুব দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল। দুজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, খালিদ ইবনে অলীদ এতটাই ক্ষিপ্ত ছিলেন যে, তিনি অবরোধ দীর্ঘ হতে দিলেন না। বরং এমন-এমন কৌশল অবলম্বন করলেন যে, খ্রিস্টান গোত্রগুলো তাঁর ফাঁদে এসে পড়েছিল।

এস্থনিস একটা কৌশল আঁটল। অবরোধের তৃতীয় কি চতুর্থ দিন আটক সব কজন মুজাহিদকে দুর্গের পাঁচিলের উপর পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিল। সকলের হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা। পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে সে ঘোষণা দিল, অনতিবিলম্বে অবরোধ তুলে নাও। আমরা বেশি সময় অপেক্ষা করব না। তোমাদের এই লোকগুলো থেকে প্রথমে দশজনের মাথা কেটে তোমাদের দিকে ছুড়ে মারব।

তারপরও যদি অবরোধ না তোল, তা হলে আরও দশজনের মুন্ডুগুলো ধড় থেকে আলাদা করে ফেলব।

'না– না; অবরোধ তুলো না কিন্তু!'– এক কয়েদি মুজাহিদ অত্যন্ত উঁচু গলায় চিৎকার করে অতিশয় জোরালো কণ্ঠে বললেন– 'আমাদের মস্তক কর্তিত হতে দাও, আমাদের শহীদ হতে দাও। আমরা ঘর থেকে আল্লাহর পথে মাথা কাটাতেই বের হয়েছি। তোমরা অবরোধ প্রত্যাহার করো না। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমরা দুর্গ জয় করতে সক্ষম হবে।'

সমস্ত কয়েদি মুজাহিদ– যাঁদের সংখ্যা কম-বেশি একশো ছিল– আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলল। সকলের মুখে একটি-ই দাবি, অবরোধ প্রত্যাহার করো না। দীনের স্বার্থে আমরা নিজেদের যে-কোনো পরিণতি বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি।

বন্দি মুজাহিদদের প্রবল ঈমানি চেতনা ও আত্মত্যাগের এহেন প্রত্যয় বাইরের মুজাহিদদের অগ্নিশর্মা করে তুলল। সবাই একসঙ্গে, একযোগে তখনই দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। কিন্তু সালারগণ পরম দক্ষতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ ও ইয়াজ ইবনে গানাম দুজনই সচেতন সেনানায়ক ছিলেন। তাঁরা আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে নয়– কুশলতা ও দূরদর্শিতা দ্বারা লড়াই করতেন।

এক-দুদিনের প্রচেষ্টার পরই হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) নগরীতে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে সক্ষম হলেন। তিনি নগরীর ভেতরে সলিতাওয়ালা তির নিক্ষেপ করতে শুরু করে দিলেন। এগুলো হলো অগ্নিতির। এই তিরের কাজ হলো, কোথাও গিয়ে পতিত হয়ে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেবে। কিন্তু পাঁচিলের উপর দিয়ে এই তির ভেতরে পৌঁছানো সহজ ছিল না। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ নগরীর একদিকে খানিকটা উঁচু জায়গা পেয়ে গেলেন। তিরন্দাজ মুজাহিদগণ সেখানে দাঁড়িয়ে ভেতরে অগ্নিতির ছুড়তে শুরু করলেন। কিন্তু এই আক্রমণ তেমন ফলপ্রসূ হলো না। কারণ, নগরীর জনবসতি পাঁচিল থেকে এত দূরে ছিল যে, ও পর্যন্ত তির পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। একটা মাঠে বিপুলসংখ্যক তাঁবু খাটানো ছিল। এটা উদ্বাস্তু শিবির। মুজাহিদগণ এই তাঁবুগুলোকে টার্গেট বানিয়েছিলেন।

* * *

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ ও ইয়াজ ইবনে গানাম– দুই সেনাপতির একজনেরও জানা ছিল না, দুর্গের ভেতরের অবস্থা কী। ভেতরে কোনো মুসলমান গোয়েন্দা ছিলও যদি তারা বাইরে আসতে পারছিল না এবং বাইরে থেকেও কাউকে ভেতরে পাঠানো যাচ্ছিল না। প্রাচীরের উপর যেসব কাবায়েলি তির-ধনুক-বর্শা নিয়ে দণ্ডায়মাণ ছিল, আজও তাদের প্রথম দিনকার মতোই সতেজ ও উদ্যমী মনে হচ্ছে।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) নায়েব সালারগণ ও এক-দুবার গোটা বাহিনীকে বলেছিলেন, হালবকে নিজেদেরই নগরী মনে করুন। তাদের সাহস বৃদ্ধির জন্য তিনি অতিশয় আস্থার সঙ্গে বলেছিলেন, নগরীতে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ বাহিনী নেই। এরা বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করতে জানে কিংবা এলোমেলোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু অবরোধের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা এবং অবরোধ ব্যর্থ করার সাধ্য ও যোগ্যতা এদের নেই। আপনারা ধরে নিন, ওরা আমাদের করতলগত এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা আমাদের আনুগত্য মেনে নেবে কিংবা এমন কোনো বোকামি করে বসবে, যার ফলে তাদের পরাজয় অবধারিত হয়ে যাবে।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ ঘুণাক্ষরেও জানতেন না, অবরুদ্ধ কাবায়েলিদের নেতৃত্ব রোমান ফৌজের একজন পলাতক সেনাপতির হাতে এবং তাকে পাশে থেকে সহযোগিতা দিচ্ছে রোমান বাহিনীরই আরেক অফিসার, যে কিনা সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.)-এর বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে। মুসলমান সালারদের এই তথ্যও জানা ছিল না, তাদের সঙ্গে সম্রাট হেরাকল-এর এমন একজন স্ত্রীও আছে, যে ইরানের রাজপরিবারের নারী ছিল এবং পরে এসে প্রতারণার মাধ্যমে হেরাকল-এর পরিবারে প্রবেশ করেছে। মুসলমানদের কাছে জিহাদের জযবা ও দীন-ঈমান ছিল। তাঁদের নিজস্ব একটা আদর্শ ছিল, যার থেকে তাঁরা একবিন্দুও নড়তেন না। তার বিপরীতে দুর্গের ভেতরে যে-রোমান নেতারা ছিল, তাদেরও আদর্শ-সভ্যতা একটা ছিল বটে; কিন্তু প্রয়োজনের সময় এবং স্বার্থের প্রশ্ন দেখা দিলে সেই আদর্শ পরিত্যাগ করতে তাদের সময় লাগত না।

দুর্গের ভেতরের অবস্থা খানিক এ-রকম ছিল– এন্থনিস আর রাওতাস রাতে বিছানায় পিঠ লাগাচ্ছে না। তাদের জন্য এটি একটি দুর্গরক্ষা কিংবা বড় নগরীর পতন রোধ করার যুদ্ধ নয়। এটি তাদের জীবন-মৃত্যুর লড়াই। এন্থনিস প্রত্যয় নিয়ে রেখেছিল, সে একটি খ্রিস্টান রাজ্যের ভিত রচনা করবে এবং আল-জাযিরার কাবায়েলি খ্রিস্টানদের একটি সামরিক শক্তির আদলে সংগঠিত করবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তার জন্য জরুরি ছিল, তাকে হালবের দখল ধরে রাখতে হবে। রাওতাস তার ডান হাত হয়ে তাকে সাধ্যপরিমাণ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

হেরাকলপুত্র ইউকেলিসও তাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু ছেলেটা তরুণ ও প্রতিবন্ধী। একটা বাহু তার নেই। কিন্তু সে এক হাতেই লড়তে জানে। নেতৃত্বের যোগ্যতা তার এখনও গড়ে ওঠেনি। কিন্তু তারপরও সে নিজেকে একজন সেনাপতি মনে করত এবং এই পদমর্যাদাকে নিজের অধিকার জ্ঞান করত। কারণ, সে সম্রাট হেরাকল-এর পুত্র। সেও দিন-রাত সমানভাবে ছুটোছুটি করে ফিরছিল। হালব নগরী মুসলমানদের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার পর থেকেই এই রোমান তরুণ নিয়ম বানিয়ে

নিয়েছিল, যখনই সে পাঁচিলের উপর উঠত কিংবা নিচে ঘোরাফেরা করত, তখনই যাকেই কাছে পেত এবং কথা বলার সুযোগ পেত, বোঝাতে চেষ্টা করত, আমরা যিশুখ্রিস্টের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াই করছি। কাজেই শেষ পর্যন্ত জয় আমাদেরই হবে। এরূপ আবেগময় ও উত্তেজনাকর কথা বলে-বলে সে মানুষের মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টা করত। কয়েক রাত কেটে যেত, মায়ের কাছে যাওয়ার সময়ই সে পেত না।

* * *

এস্থনিস, ইউকেলিস ও লিজা একঘরে থাকত। রাওতাসের বাসগৃহ আলাদা। অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি একতলা ঘর। রাওতাস দু-চার দিন পর-পর লিজার ঘরে আসছে। তার এই আগমন নিতান্তই প্রথাগত। আসা দরকার তাই আগমন। হালব অবরুদ্ধ হওয়ার পর থেকেই রাওতাস লিজার কাছে আসা একদম কমিয়ে দিয়েছে। কারণ, এখন তাকে দিন-রাত অবিশ্রাম কাজ করে যেতে হচ্ছে।

এটি এস্থনিসের বাসগৃহ। কিন্তু সেও এই ঘরে এমনভাবে আসছে, যেমন আসে রাওতাস। দুজনই সামরিক তৎপরতায় একটানা ব্যস্ত। ছুটোছুটি করে ঘাম ঝরিয়ে ফেলছে দুজনই। এই পাঁচিলের উপর তো এই নিচে, যেন উপর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে। দর্শকদের কাছে ভ্রম হচ্ছে, লোকগুলো সব সময় একই সঙ্গে সব জায়গায়ই থাকছে নাকি। এস্থনিস মাঝে-মধ্যে গভীর রাত করে ঘরে ফিরছে এবং ধপাস করে পালঙ্কের উপর এলিয়ে পড়ছে আর অমনি দু-চোখের পাতা বুজে আসছে। আবার অল্পক্ষণ পরই বিড়বিড়িয়ে জেগে উঠে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছু সময় ঘরে থাকলেও মনে হচ্ছে, সে ঘরে অনুপস্থিত।

এস্থনিস ও রাওতাস দুজনই কমান্ডার। তাদের অনুভূতি আছে, তারা যে-লোকগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে, ওরা যুদ্ধ করতে জানে বটে; কিন্তু একজন সেনাপতির অধীনে সুশৃঙ্খলভাবে লড়াই করার অভিজ্ঞতা ওদের নেই। তারা কাবায়েলি সৈনিকদের নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে এবং নিজেরা পাঁচিলের উপর উঠে ঘুরে-ফিরে দেখছে, মুসলমানরা ফটকের কাছে চলে এল কি-না। সেসঙ্গে তারা তরুণ-যুবকদের দুর্গ থেকে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করারও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

একরাতে এস্থনিস ঘরে এল এবং এসেই শুয়ে পড়ল। লোকটা অনেক পরিশ্রান্ত। লিজা অপেক্ষায় প্রহর গুনতে লাগল, লোকটা তার সঙ্গে কথা বলে কি-না। এস্থনিস খানিক সতেজ হয়ে মুখ খুলল এবং লিজার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যুদ্ধ ও অবরোধের আলাপ শুরু করল। লিজার চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, এস্থনিসের এই আলাপ লিজাকে একটুও আনন্দ দিচ্ছে না।

'আমার সঙ্গে আলাপের জন্য আর কোনো বিষয় কি তোমার কাছে নেই? এস্থনিসের চিরচেনা একটি ভঙ্গিতে লিজা বলল। লিজার কণ্ঠে আবেগ, অন্তরে পিপাসা।

'লিজা!'– এন্থনিস শয্যা থেকে উঠে বসতে-বসতে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলল– 'এ তুমি কী বললে লিজা! আমার তো ঐকান্তিক কামনা, আমি ঘরে এলে তুমি প্রথম কথাটি জিজ্ঞেস করবে, অবরোধ কবে উঠছে কিংবা বিজয়ের কোনো লক্ষণ চোখে পড়ছে কি-না? তোমার কথায় তো মনে হচ্ছে, পরিস্থিতি একদম স্বাভাবিক এবং এখানে কোনোই সমস্যা নেই। আরে, আমার তো এই একটি বিষয় ছাড়া আর কোনো ভাবনা-ই মাথায় আসছে না!'

লিজার বিরক্তির মাত্রা আরও বেড়ে গেল। কপালের চামড়ায় তার ভাঁজ পড়ে গেল। ব্যাপারটা এন্থনিসের অগোচর রইল না। এন্থনিস গভীর নয়নে লিজার পানে তাকাল। দেখল, লিজার চোখে অন্য এক মাদকতা বিরাজ করছে। সেই মাদকতা আর লিজার মুখাবয়বে পরিস্ফুটিত আবেগের সঙ্গে এন্থনিস ভালোভাবেই পরিচিত। দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মতো। একজন আরেকজনের জন্য পাগলপারা।

'লিজা!'– এন্থনিস বলল– 'চৈতন্যে আসো এবং বাস্তবতা দেখো। এটি রোমঞ্চ করার সময় নয়। কল্পনা করো; আমরা যদি যুদ্ধে হেরে যাই, তা হলে আমাদের আর কোনো আশ্রয় থাকবে না। এখান থেকে পালিয়ে আমরা যাবটা কোথায়? বনু তাগলিবের মতো শক্তিশালী কবিলা আরও কয়েকটি কবিলাসহ মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় ঘর ছেড়ে বের হয়ে আমার মতো তোমারও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা দরকার। আচ্ছা লিজা, তুমি কি এই গোত্রগুলোর মেয়েদেরকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করতে পার না?'

এন্থনিস লিজাকে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। মহিলা তার সঙ্গে যে-বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিল, তা ছিল শুধুই শারীরিক। লিজা তাকে কেবলই দৈহিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সুহৃদ বানিয়েছিল। সম্রাট হেরাকল-এর হেরেমের এক নারী ছিল লিজা। সে জানত রাজ-রাজড়াদের প্রাসাদগুলোতে নারীরা কোন কাজে ব্যবহৃত হয়। এই দৃশ্য লিজা ইরানের রাজপ্রাসাদেও দেখেছে, হেরাকলকের ওখানেও প্রত্যক্ষ করেছে।

লিজা অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে। জন্মদাতা পিতা তাকে একটি সম্মোহক প্রতারণায় পরিণত করে হেরাকল-এর প্রাসাদে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে, যাও; রূপের জাদুজালে ফাঁসিয়ে তাকে বিষ পান করিয়ে পালিয়ে এসো। কিন্তু রোমের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে লিজা নিজেই হেরাকল-এর জালে আটকে গেল এবং তার স্ত্রী হয়ে গেল। হেরাকল-এর প্রাসাদে এসেছিল সে একটি বিষধর নাগিনী হয়ে। কিন্তু হেরাকলকে দেখে, তার আবেগ ও চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাপিনী থেকে সে মানুষে পরিণত হয়ে গেল। তার মাঝে চেতনারা সজাগ হয়ে উঠল এবং নিজেকে আপন পছন্দের একজন পুরুষের কাছে সঁপে দিল। কিন্তু অল্প কদিন পরই হেরাকল তার এই চেতনাটিকে পিষে ফেলল এবং তাকে তার নারীগুদাম হেরেমের মাঝে ছুড়ে ফেলল।

তার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, লিজার মাঝে পাশবিক চেতনা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

লিজা নিজেও যুবতী ছিল এবং তার একজন যুবক সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল।

এই আবেগময় অবস্থার মাঝে লিজা এমন একটি অগ্নিপর্বতে পরিণত হয়ে গেল, যার মুখটা বন্ধ ছিল এবং লাভা বাইরে বের হতে ছটফট করছিল। এস্থনিস ছাড়া যদি সে আর কাউকে কাছে পেত, তা হলে তাকেই হাত বাড়িয়ে বরণ করে নিত। ঘটনাচক্রে এস্থনিস তার হাতের কাছে এসে পড়ল আর অমনি লিজা ছোঁ মেরে তাকে নিয়ে নিল। পরে যখন দেখল, সহজেই তার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়, তখন ধরে নিল, এ-ই আমার বর। এখন তো তার পুত্র ইউকেলিসও মেনে নিয়েছে, তার জনক হেরাকল নন– এস্থনিস।

রাজা-বাদশাদের স্ত্রীগণ ও তাদের হেরেমের নারীদের মাঝে জাতীয় চেতনা বলতে কিছু থাকত না। দেশপ্রেম শব্দটির সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় থাকত না। অন্য কোনো দেশ তাদের দেশের উপর আক্রমণ করবে করুক। দেশজয়ের পাশাপাশি তাদেরও দখল করে নেবে নিক। ভিন দেশের কোনো সেনাপতি বা রাজপুত্র তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে যাক। এসব ছিল তাদের গাসহা ব্যাপার। জয়-পরাজয়ের সঙ্গে তাদের কোনোই সম্পর্ক থাকত না।

লিজাও এ-জাতীয় নারীদের একজন ছিল। সে-সময় প্রয়োজন তার হালবের ছিল না– ছিল এস্থনিসের এবং এই প্রয়োজনটা ছিল তার অত্যধিক তীব্র। হেরাকল-এর মতো এস্থনিসও তাকে ছুড়ে ফেলতে পারে এমন ভাবনা তার মনের মণিকোঠায়ও উদয় হয়নি। সে এস্থনিসের মাঝে আপন আবেগের উত্তাপ তৈরি করার চেষ্টা করল। কিন্তু এস্থনিস তখন তার সেই আবেগময় স্তর থেকে অনেক উপরে বিরাজ করছিল। সে লিজাকে বিতাড়িত করেনি বটে; তবে লিজা তার পাশে এসে বসুক, তাও মেনে নিতে সম্মত ছিল না।

'তুমি তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ভাবনায় বিভোর হয়ে পড়েছ'– লিজা হতাশ কণ্ঠে বলল– 'এই রাজত্ব না-জানি কবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি এখনই সম্রাট হেরাকল হয়ে গেছ। আমার সঙ্গে বসে তুমি আগের মতো কথাটি পর্যন্ত বল না।'

এস্থনিস খুবই ক্লান্ত ছিল। অবরোধের ফলাফল শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে এই ভাবনায়ও সে বেজায় অস্থির ও উৎকণ্ঠিত। অবরোধ ব্যর্থ করে মুসলমানদের এখান থেকে কীভাবে তাড়ানো যাবে এই চিন্তা সব সময় তার মস্তিষ্ককে ঘিরে রাখছে। একটি দন্ডও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা তার সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এস্থনিস লিজার প্রতি সেই মন নিয়ে অভিনিবেশ করতে পারল না, যেটির সে প্রত্যাশী ছিল। লিজার আবেগ ও আবেদনময় বক্তব্যের কোনো এক ফাঁকে এস্থনিস গভীর নিদ্রায় তলিয়ে

গেল। লিজা ঘুমন্ত এস্থনিসকে দেখল। মনে হলো, লোকটা মরে গেছে। তার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। প্রতীয়মান হলো, স্বচ্ছ নির্মল পানির একটি কূপ ছিল, যেটি হঠাৎ শুকিয়ে গেছে।

আপন গর্ভজাত সন্তান ইউকেলিস, যার পানে তাকিয়ে-তাকিয়ে এতটা কাল বেঁচে আছে লিজা, যার জন্য নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করে রেখেছিল, সেও এখন আগের মতো মায়ের খোঁজ নেয় না। একটানা দুদিন, তিন দিন ঘরের বাইরে সময় কাটায়। আচমকা একদিন আসে আর মাকে এটা-ওটা সান্ত্বনা দিয়ে হনহন করে চলে যায়। এস্থনিস বলত, সে যিশুখ্রিস্টের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু ইউকেলিসের স্বপ্ন ভিন্ন। সে মেতে আছে তার পিতা হেরাকল ও ভাই কুস্তন্তিনকে হত্যার রাজনীতিতে। প্রতিশোধের অনল দাউ-দাউ করে জ্বলছে তার হৃদয়ে। সুযোগ পেলেই কাজটা করে ফেলবে সে। লিজারও তার জন্য এখন তেমন কোনো ভাবনা নেই। ছেলেটা যাতে অপঘাতে মারা না যায়, সেজন্য তাকে যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে এমন কোনো চিন্তা-ই লিজার মাথায় আসেনি। তার যত ভাবনা কেবলই এস্থনিসকে ঘিরে। এস্থনিসকে তার খুবই প্রায়োজন।

* * *

পর দিন সকালে সে-সময় লিজার ঘুম ভাঙল, যখন সদ্য-উদিত প্রভাতসূর্যের কিরণমালা দুর্গের পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। লিজা শয্যা ত্যাগ করে উঠল এবং সবগুলো কক্ষ ঘুরে-ঘুরে দেখল। ঘরে এস্থনিসও নেই, ইউকেলিসও নেই। এই না-থাকাটাই নিত্যদিনকার নিয়ম। কিন্তু আজ সে নিজেকে বড় বেশি একা অনুভব করল। চাকরানী নাশতা এনে রাখল। লিজা নাশতা খেতে বসল। চাকরানী তার সম্মুখে মেঝেতে বসে পড়ল।

'খোদা আপনাকে আরও বেশি সম্মান দান করুন রানী!'– চাকরানী বলল– 'আমি অধম জানতে পারি কি, এই অবরোধ কবে উঠবে? আপনার তো জানা আছে নিশ্চয়। নগরীতে খাদ্যপণ্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পানির সংকট এখনও দেখা দেয়নি বটে; কিন্তু শুধু পানিতে তো আর জীবন চলে না।'

'ভয়ের কোনো কারণ নেই'– লিজা ভগ্নমনে বলল– 'অবরোধ শিগগিরই উঠে যাবে। আর যদি তারা প্রত্যাহার না করে, তা হলে আমাদের সৈন্যরা বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাবে।'

'আপনাকে গির্জায় কখনও দেখিনি!'– চাকরানী বলল– 'গির্জায় প্রতিদিনই আমাদের বিজয় আর মুসলমানদের পরাজয়ের প্রার্থনা হয়। পাদরি বলছেন, তোমরা পাপ থেকে ফিরে আসো; এটি বিরাট এক আপদ, যা কিনা আমাদের পাপেরই কারণে আমাদের উপর আপতিত হয়েছে। আচ্ছা রানী! আমরা গরিবরা কী পাপ করেছি...?'

লিজা চাকরানীর কথা পূর্ণ হতে দিল না এবং হো-হো হেসে উঠল। চাকরানী বলা বন্ধ করে লিজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর আবার বলতে শুরু করল। জানাল, নগরীর কেউ-কেউ বলছে, আমাদের যোদ্ধারা বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের উপর হামলা চালাবে। তবে অনেকে একথাও বলছে যে, আপস করে মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতার অবসান করা হবে এবং তাদের জন্য দুর্গের ফটক খুলে দেওয়া হবে। তারা বলছে, মুসলমানরা বড়ই সজ্জন মানুষ। যখনই যে-নগরী জয় করে, ওখানকার নাগরিকদের সঙ্গে খুবই ভালো আচরণ করে।

লিজার মুখের অট্টহাসি পলকের মধ্যে মুচকি হাসিতে গুটিয়ে এল। চাকরানীর কথাগুলোকে সে একবিন্দুও গুরুত্ব দিল না এবং এমনভাবে শুনতে থাকল, যেন চাকরানী কোনো মজার কথা শোনাচ্ছে। লিজা ঝটপট খাওয়া শেষ করে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল।

অবরোধের হট্টগোল নগরীর ভেতর থেকেও শোনা যাচ্ছিল। আরও একটি রাত কেটে গেল। নগরীর যেসব লোক নগরীর প্রতিরক্ষার জন্য পাঁচিলের উপর দণ্ডায়মান ছিল, তারা ক্ষণে-ক্ষণে ধ্বনি তুলছিল আর মুসলমানদের হুঙ্কার দিচ্ছিল। তাদের উদ্যমতা ও মনোবল বাহ্যত তরতাজা বলেই প্রতীয়মান হচ্ছিল।

লিজা আনমনাভাবে ধীরপায়ে হাঁটতে লাগল। বিশেষ কোথাও যাওয়ার মানসে বের হয়নি লিজা। নগরীর মহিলারা তাকে চেনে, এ তাদের সেনাপতির বউ। একস্থানে মহিলারা তাকে ঘিরে ধরল। তাদের চেহারায় খানিক আতঙ্কের ছাপ। হাসি নেই, উচ্ছ্বাস নেই। কয়েকজন জানতে চাইল, অবরোধ আর কতদিন থাকবে? এই নগরীটি কি এভাবে অবরুদ্ধ হয়েই থাকবে? আমরা কি মুক্তি পাব না?

সহসা লিজার সম্বিৎ ফিরে এল, যেন এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল আর এইমাত্র কারও ঠেলা খেয়ে সজাগ হয়ে গেছে। সে মহিলাদের সম্ভবপরিমাণ সান্ত্বনা দিল এবং তাদের মনোবল এতখানি চাঙ্গা করে তুলল যে, এমনও বলল, তোমরাও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। লিজা বলল, আমরা অবরোধ দীর্ঘ হতে দেব না এবং শিগগিরই বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের উপর জোরদার আক্রমণ চালানো হবে।

একজন সেনাপতির স্ত্রী হিসেবে লিজা এমন তেজস্বী কথাবার্তা বলল যে, মহিলাদের মনের ভীতি দূর হয়ে গেল। কয়েকজন বলল, আমরা পুরুষদের মতো লড়াই করব এবং মুসলমানদের অবরোধ ব্যর্থ করে দেব। লিজার নিজের চিন্তা-চেতনায়ও কিছু পরিবর্তন এসে পড়ল। সে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর লিজা পাঁচিলের উপর পৌঁছে গেল। দেওয়াল এতটা চওড়া যে, তার উপর চার-পাঁচজন মানুষ পাশাপাশি অনায়াসে হাঁটতে পারত। কিন্তু এক্ষণে মানুষের এতটাই ঠাসাঠাসি ভিড় যে, হাঁটার জন্য কোনোই পথ নেই। নগরীর প্রায় সব মানুষ এখন পাঁচিলের উপর দাঁড়ানো। এই ভিড়ের মধ্যেই লিজা পথ রচনা করতে-করতে

এগুতে লাগল। যেসব লোক তাকে চেনে, তারা কপালে হাত ঠেকিয়ে তাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। তার ঘাড়টা এই ভেবে মোটা হয়ে গেল, মাথাটা উঁচু হয়ে গেল যে, আমি এই নগরীর সেনাপতির স্ত্রী। ওখানে এন্থনিসই একমাত্র সেনাপতি, যে কিনা একটি অসংগঠিত বাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছে।

লিজার আপন কাঁধের উপর কারও হাতের পরশ অনুভব করল। দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে তাকাল। লোকটা রাওতাস। লিজার মুখটা আচমকা জ্বলজ্বল করে উঠল। মুখে অপূর্ব এক হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, পরিস্থিতি কেমন? অবরোধ ব্যর্থ করা যাবে বলে মনে হচ্ছে? নগরীর শঙ্কা কতখানি দূর হলো?

'অবরোধ তো আমরাই ধরে রেখেছি'– 'রাওতাস উত্তর দিল– 'কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে, আমরা আসলে আত্মপ্রবঞ্চনার জালে আটকা পড়েছি। মুসলমানদের সেনাপতি হলেন খালিদ ইবনে অলীদ। আপনার জানা নাও থাকতে পারে, আমি সম্রাট হেরাকল-এর গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তা। আমি বেশ বদল করে মুসলমানদের ছাউনিটা একচক্কর ঘুরে এসেছি এবং খালিদ ইবনে অলীদকে কাছে থেকে দেখেছি। শাম থেকে আমাদের বাহিনীর পা এই সালারই উপড়ে দিয়েছিল। তাও আবার এমনভাবে যে, আমরা কোথাও একদণ্ডের জন্য দাঁড়াতেই পারলাম না।'

'এই নামটা আমিও শুনেছি'– লিজা বলল– 'আমি হেরাকলকে বলতে শুনেছি, খালিদ ইবনে অলীদ লোকটাকে যদি হত্যা করতে পারি, তা হলে আমি মুসলমানদের শুধু শাম থেকেই নয়– আরব থেকেও তাড়িয়ে সমুদ্রে নিয়ে ডুবিয়ে মারব।'

'আপনি সব জানেন না'– রাওতাস বলল– 'খালিদ ইবনে অলীদকে হত্যা করাবার জন্য দুবার চার-চারজন করে লোক প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা মুসলমানদের বেশ ধরেই গিয়েছিল এবং আরবিও আরবদেরই মতো বলতে পারত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মুসলমানরা ধরতেই পারবে না, এরা তাদের লোক নয়। কিন্তু তাদের একজনও ওখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারেনি। সব কজনই ধরা পড়েছে এবং খুন হয়েছে। দুটি দলেরই আলাদা-আলাদা চমকপ্রদ কাহিনী আছে। সেই খালিদ ইবনে অলীদ এই অবরোধে সেনাপতিত্ব করছে। লোকটার দুর্গ ভাঙার ও দুর্গ জয় করার বিশেষ দক্ষতা আছে।'

বলতে-বলতে রাওতাস থেমে গেল এবং বাইরের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলে বলল, 'ওই দেখো...আসো আমি তোমাকে খালিদ ইবনে অলীদকে দেখাচ্ছি।'

রাওতাস লিজাকে প্রাচীরের বুরুজের কাছে নিয়ে গেল। দূরে একস্থানে দুজন অশ্বারোহী সামনে-সামনে আর আট-দশজন অশ্বারোহী তাদের পেছনে-পেছনে যাচ্ছিল।

'সামনের দুই আরোহীর যেজন ডান দিকে আছে, সে-ই খালিদ ইবনে অলীদ'– রাওতাস বলল– 'বামদিকের জন ইয়াজ। আমি তার নামটা পুরো জানি না। এও সেনাপতি। এত দূর থেকে আপনি খালিদ ইবনে অলীদ-এর মুখ দেখতে পাবেন না। কাছে থেকে দেখলে শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আপনি তার ভক্ত হয়ে যাবেন এবং বলতে বাধ্য হবেন, খোদা এই লোকটার মুখে অপূর্ব এক প্রভাব ভরে দিয়েছেন। দেখবেন, এই লোকটার মুখে যেন তার আত্মার দীপ্তি চমকাচ্ছে। আপনি তার জন্য পাগল হয়ে যাবেন। এ সেই সমরনায়কদের একজন, যারা শুধু জয়ী হতে জানেন– পরাজয় নামটির সঙ্গেও পরিচিত থাকেন না।'

'তার মানে কি এই যে, খালিদ ইবনে অলীদ হালব জয় করে নেবেন?' লিজা জানতে চাইল।

'আমি আপনার মনোবল ভাঙতে চাই না'– রাওতাস বলল– 'আমরা জীবনের বাজি লাগাব। কিন্তু একথাটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, হালব রক্ষা করতে হলে আমাদের এই নগরীর অর্ধেক মানুষের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। সুযোগ পেলেই আমরা বাইরে বের হয়ে আক্রমণ চালাব।'

রাওতাস বলতে থাকল। লিজার অবগতির জন্য বলল, অনেক কিছুই হতে পারে। আসলে কী যে ঘটবে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাচ্ছে না। লিজাকে সে অবস্থার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল। লিজা বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে এনে রাওতাসের মুখের উপর নিবদ্ধ করল। লোকটাকে সে নয়নভরে দেখে নিল। তারপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিরীক্ষা করল। লিজার দু-ঠোটের ফাঁকে এমন একটি মুচকি হাসি ফুটে উঠল, যার মাঝে পিপাসার মতো কিছু একটা ছিল। লিজা কোনো চিন্তা বা কোনো বাসনা ব্যতিরেকেই রাওতাসের একটা বাহু ধরে ফেলল এবং তাকে এই ক্ষুদ্র বুরুজ থেকে সরিয়ে আনল। রাওতাস তার সঙ্গে পালিত পশুর মতো হাঁটতে লাগল।

* * *

রাওতাসের বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। একজন সুদর্শন পুরুষ। লিজার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোট। রাজপরিবারের সদস্য এবং একজন উর্ধ্বতন সামরিক অফিসার। এস্থনিস-ইউকেলিসের মতোই পিপাসাকাতর। রাজপরিবারের সদস্য বলে লিজার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ আছে। লিজা রোমসম্রাট হেরাকল-এর স্ত্রী ছিল।

'ওই দেখুন'– রাওতাস হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বাইরে অবরোধের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল– 'একটি অশ্বারোহী ইউনিট চলে যাচ্ছে। হতে পারে, তার স্থলে নতুন তাজাদম বাহিনী আসবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, মুসলমানরা অবরোধ আস্তে-আস্তে তুলে নিচ্ছে।'

অন্তত এক হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদ সেনাপতি খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর নির্দেশে অবরোধ থেকে বেরিয়ে একদিকে চালে যাচ্ছিল। রাওতাস ও লিজা ওদিকে

তাকিয়ে থাকল। বাহিনীটি অনেক দূরে চলে গেল এবং পার্বত্যাঞ্চলের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। লিজা ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে রাওতাসের পানে তাকাল। রাওতাসের মুখাবয়বে খুশির আভা দেখতে পেল এবং তাকে আগের চেয়ে আরও সুন্দর লাগল।

রাওতাসের সঙ্গে লিজার অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিল না। অবরোধ চলাকালে সে এখনও খুব কমই লিজার ঘরে আসছে। তাও তখন, যখন এস্থনিস ঘরে থাকে– লিজার সঙ্গে নয়– এস্থনিসের সঙ্গে দেখা করতে।

'এই একাকি জীবনে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি রাওতাস!'– লিজা বন্ধুত্বসুলভ অকৃত্রিমতার সঙ্গে বলল– 'এভাবে একা-একা থাকতে আমার একদম ভালো লাগে না। এখানকার মেয়েদের সঙ্গে আমি মিশতে পারি না। ওদের সঙ্গে আমার একটুও খাপ খায় না। তুমি তো জান, আমি কোন পরিবেশ থেকে এসেছি। এস্থনিস দিন-রাত বাইরে থাকে। কালে-ভদ্রে যখন আসে, আসে ক্লান্ত শরীর নিয়ে আর এসেই নিজেকে পালঙ্কের উপর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে যায়। আজ আমি টিকতে না পেরে প্রাচীরের উপর এসেছি। বেশ ভালোই হলো, তোমাকে পেয়ে গেছি। আসো; তোমার সঙ্গে আমি তোমার ঘরে যাব।'

লিজার এই আব্দার রাওতাস প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। বলল, আমি ঘরেই যাচ্ছি। গত রাতটা বাইরেই ছিলাম। এখন আমারও বিশ্রামের প্রয়োজন।

রাওতাস লিজাকে তার ঘরে নিয়ে গেল।

রাওতাস লিজাকে এক জায়গায় সসম্মানে বসিয়ে নিজে আলাদা অন্যখানে বসতে উদ্যত হলো। কিন্তু লিজা তার বাহু ধরে টেনে নিজের কাছে বসিয়ে নিল এবং এক হাত দ্বারা তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল। রাওতাস ম্লান হাসি হেসে তার থেকে সরে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু লিজা তার বাহুর বন্ধন আরও সংকীর্ণ ও শক্ত করে দিল। তারপর অকৃত্রিমতার এমন একটা প্রকাশ ঘটাল, যেমনটি সে কেবল এস্থনিসেরই সঙ্গে করতে পারত। রাওতাসের সঙ্গে লিজা এমন অকৃত্রিম হতে পারে এমন কল্পনাও রাওতাসের মনের ধারে-কাছে ছিল না। লিজা আবেগময় কণ্ঠে দু-একটি কথাও বলল। রাওতাস শিশু তো আর নয়। লিজার ইঙ্গিত ও আবেদন তার কাছে প্রচ্ছন্ন রইল না। লিজার মনোবাসনা বুঝে যখন সে লিজার মুখপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল, তখন ওখানে অন্য এক প্রতিক্রিয়া বিরাজমান ছিল।

'আমার অন্তরে আপনার শ্রদ্ধাবোধ আছে'– রাওতাস বলল– 'একথা সত্য যে, আপনি রাজপরিবার থেকে পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু আমিও তো ওই পরিবারেরই সদস্য। সেজন্য আমি আপনাকে সম্মানের চোখে দেখি। আপনি রাজপরিবারের সম্ভ্রম যদি একথাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিইও, কিন্তু একথাটি তো আমি ভুলতে পারব না, আপনি আমার সেনাপতি এস্থনিসের সুহৃদ।'

'আমি এস্থনিসের মালিকানা নই রাওতাস!'– 'লিজা তৃষাতুর কণ্ঠে বলল– 'এই মুহূর্তে তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার সঙ্গী। আমার থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করো না। এক্ষণে আমি হেরাকল-এর স্ত্রীও নই, এস্থনিসের বন্ধুও নই। এখন আমি শুধুই লিজা। সম্মানসূচক অভিধায় সম্বোধন না করে আমাকে তুমি আদরের সুরে লিজা বলে ডাকো।'

'তারপরও আরও একটি বিষয় মাথায় আনো লিজা!'– রাওতাস বিগলিত স্বরে বলল– 'পাদরি প্রতিদিন বিজয়ের প্রার্থনা করেন আর একটি কথা বারবার উচ্চারণ করছেন যে, আমাদের উপর বিরাট এক বিপদ এসে পড়েছে, যার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, আমাদেরকে গুনাহ থেকে তাওবা করতে হবে। এমতাবস্থায়... ।'

'আমি আপাদমস্তকই একটা পাপ'– লিজা রাওতাসকে থামিয়ে দিয়ে বলল– 'ইরানের রাজপরিবার থেকে আমি বড়সড় একটি সদুর্শন পাপের প্রতিমা হয়ে হেরাকল-এর রাজপরিবারে এসেছিলাম। কিন্তু সেই পাপে আমি সফল হইনি। তারপর সম্রাট হেরাকল যখন আমাকে বিবাহ করে অল্প কদিনের মধ্যেই হেরেমে নিক্ষেপ করলেন, তখন আমি আরেকটি পাপমূর্তি ধারণ করলাম।'

লিজা আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে রাওতাসকে নিজের বিস্তারিত কাহিনী শুনিয়ে দিল। কীভাবে এস্থনিসকে তার মনের জ্বালা নিবারণের উপায় বানিয়ে নিয়েছিল, কী করে পর্দার অন্তরালে তাদের এই বন্ধুত্বকে ষোলকলায় পূর্ণ করল, সব রাওতাসকে শোনাল। লিজা এই গোপন তথ্যটির উপর থেকেও পরদা সরিয়ে দিল যে, ইউকেলিসের জনক হেরাকল নয়– এস্থনিস।

'তুমি ভুল বুঝছ'– লিজা বলল– 'তুমি মনে করছ, আমিও এস্থনিসের এই প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত আছি যে, আমরা শামে যিশুখ্রিস্টের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করব। এস্থনিসই এমনটিই বোঝে যে, আমি তার স্বপ্নের সঙ্গে একমত। কিন্তু রাওতাস! আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি আমার একমাত্র পুত্র ইউকেলিসকে হেরাকল ও তার পুত্র কুস্তুন্তিন থেকে রক্ষা করতে এস্থনিসের সঙ্গে এসেছি। এ ছাড়া আমার আর কোনো প্রত্যয় নেই।'

লিজা রাওতাসকে ইউকেলিসের হত্যাচেষ্টা ও এস্থনিসের তাকে রক্ষা কারার ঘটনাও শোনাল। এই তথ্যও জানাল যে, এখন আর হেরাকল-এর কাছে এস্থনিসের জায়গা নেই। নাগালে পেলে সম্রাট তাকে নির্ঘাত হত্যা করে ফেলবেন। আর সেজন্যই সে পালিয়ে এসেছে।

'আমি তোমার এসব বৃত্তান্ত শুনে মোটেও বিস্মিত হইনি'– রাওতাস বলল– 'এসব রাজপরিবারগুলোর নিত্যদিনকার ঘটনা। একজনের স্ত্রী আরেকজনের রক্ষিতা হয়। রাজার ছেলে রাজার অন্য স্ত্রী বা রক্ষিতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে। আমি তো বরং একটু এগিয়ে একথাটিও বলতে চাই যে, রাজা-বাদশাদের পরাজয়ের নেপথ্য

কারণও এটিই। তুমি কি স্বপ্নেও কল্পনা করেছিলে, ইরান ও রোমের মতো পরাশক্তিগুলো আরবের এই অতিসাধারণ মানুষগুলোর কাছে পর্যুদস্ত হয়ে যাবে? পরাজয়ও এমন যে, রাজারা পালিয়ে যেতে এবং দ্বারে-দ্বারে আশ্রয় খুঁজে ফিরতে বাধ্য হবেন? মুসলমানরা আমাদের শত্রু একথাটা ঠিক; কিন্তু আমি একজন গোয়েন্দা অফিসার। কর্তব্যপালনে আমি নানা বেশে মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু দিন অবস্থান করেছি। তাদের সেনাছাউনিগুলো ঘোরাফেরা করেছি। তাদের কাছে বিলাসিতার নামটিও নেই। তাদের চরিত্র পাহাড়ি ঝরনার স্বচ্ছ নির্মল পানির মতো। টলটলে পানির কূপের উপরে তাকালে তলা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। মুসলমানও বিলকুল সে-রকম। এটিই তাদের আসল শক্তি, যার সামনে কোনো শক্তিই দাঁড়াতে পারে না। তুমি আমার পরামর্শ মেনে নাও লিজা! এখনও তোমার পাপ থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ আছে। এন্থনিসকে নিয়ে তুমি গির্জায় যাও এবং দুজনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিবাহ করে নাও।'

'আমার কথাটা বুঝছ না কেন রাওতাস!– লিজা বিরক্তির সুরে বলল– 'এন্থনিসের সঙ্গে আমার সেই ভালবাসা নেই-ই, তুমি যেটি মনে করছ। হেরাকল-এর সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমার সঙ্গে যে-আচরণ করলেন, তাতে আমি বুঝে গেলাম, এই লোকটি ভালবাসার যোগ্যই ছিলেন না। তখন আমি তার এই সেনাপতিটার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিয়ে তাকে ধোঁকা দিলাম। আমি মানুষ এবং একটি যুবতী নারী। তোমাকে আমি বলেছি, নিজের একমাত্র পুত্রটির জীবন রক্ষার খাতিরে তাকে নিয়ে এন্তনিসের সঙ্গে পালিয়ে এসেছি। আর কোনো লক্ষ্য নেই আমার।

'কিন্তু তথাপি লিজা!'– রাওতাস বলল– 'এন্থনিস যিশুখ্রিস্টের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এবং কাজও শুরু করে দিয়েছে। তার এই প্রত্যয়কে আমাদের পুরোপুরি সম্মান দেখানো উচিত এবং একাজে আমাদের তাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা দরকার।'

'তুমি আসলে একটা স্বল্পবুদ্ধির মানুষ রাওতাস!'– লিজা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল– 'একটি সাম্রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তার মস্তিষ্ক এত দুর্বল আর এত ধীর হওয়া উচিত নয়। তুমি ভেবে দেখো, বাস্তবতার গভীরে প্রবেশ করো। পরাজয়ের যে-অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি, তাতে চিন্তা করো। এন্থনিস এমন একটি স্বপ্ন দেখছে, যার কোনো ব্যাখ্যা হয় না। এই গুটিকতক মুসলমান ইরান ও রোমের রাজাদের পিষ্ট করে ফেলল! নাকানি-চুবানি খাইয়ে দিল! এখন এই অনভিজ্ঞ কাবায়েলিদের উপর নির্ভর করে মুসলমানদের পরাজিত করতে পারবে না। চিন্তা করলে এ-বিষয়টি তুমিও বুঝতে পারবে। এ তো অবরোধ আর আমরা দুর্গে নিরাপদ আছি। সেজন্যই এতটা দিন টিকতে পেরেছি। এই লড়াই যদি খোলা

মাঠে হতো; প্রথম দিনকার সূর্য ডুববার আগে-আগেই মুসলমানরা যুদ্ধের ফয়সালা নিজেদের পক্ষে নিয়ে নিত।'

'এতই হতাশ তুমি লিজা!'– রাওতাস স্মিত হেসে বলল– 'এস্থনিস-ইউকেলিসেরও সঙ্গে তুমি এমন ধারায় কথা বল না-কি?'

'না'– লিজা বলল– 'তাদের সঙ্গে তো আমি এ-বিষয়ে কখনও কথা বলিইনি। ওদের দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস, অবরোধ ভেঙে তারা মুসলমানদের এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে।'

লিজা রাওতাসকে টেনে আরও ঘনিষ্ঠ করে নিল এবং তার কানের কাছে মুখ নিয়ে আবেগময় সুরে বলল, 'এক্ষণে এই আলোচনার এখানেই ইতি টানলে ভালো হয় না? এতক্ষণেও কি তুমি আমাকে বুঝতে পারনি?'

মুখে যা-কিছুই বলুক, রাওতাস একজন যুবা পুরুষ তো বটে। ছেলেও আবার রাজপরিবারের। দুনিয়াত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী নয়। তার উপরও সেই মদিরতা চাপতে শুরু করল, যার দ্বারা লিজা আচ্ছন্ন ছিল। বেশি আর সময় নিল না– রাওতাস লিজার আবেগের জালে ফেঁসে গেল, যেভাবে মাছিরা মাকড়সার জালে আটকা পড়ে যায়।

লিজা পরিতৃপ্ত মনে হাসতে-হাসতে রাওতাসের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বিদায়ের আগে রাওতাস লিজাকে জিজ্ঞেস করল, এস্থনিস যদি আমাদের এই বন্ধুত্বের কথা জেনে ফেলে, তখন পরিণতি কী হবে?

লিজা ক্ষীণ কণ্ঠে উজ্জ্বল মুখে উত্তর দিল, অনেক মন্দ হবে। এস্থনিস হয়তবা তোমাকে হত্যাই করে ফেলবে। কিন্তু আমরা তাকে জানতে দেবইবা কেন।

দুজনের ডানহাতের করতল দুজনের হাতে মধ্যে চলে গেল। লিজা ওখান থেকে বেরিয়ে এল।

* * *

মুজাহিদরা দুর্গের অভ্যন্তরে আগুনের সলতেবাঁধা তির ছুড়তে শুরু করেছিলেন। কিন্তু পাঁচিলের উপর দিয়ে তির লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। পরক্ষণে তাঁরা একটি উঁচু জায়গা পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা তার উপরে উঠে তির ছুড়তে শুরু করলেন। একদল তিরন্দাজ কতগুলো গাছের উপর উঠে গেলেন এবং ওখান থেকে ভেতরে সলতেবাঁধা তির নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দুর্গের বাড়িঘরগুলো পাঁচিল থেকে অনেক দূরে ছিল। ফলে এই আক্রমণ-অভিযান ব্যর্থ প্রমাণিত হলো।

গাছে উঠে তির নিক্ষেপকারী এক মুজাগিহদ গভীর নিরীক্ষা করে দুর্গের ভেতরে অপর প্রান্তে তাঁবুর সারি দেখতে পেলেন। ওদিকে প্রাচীরের কাছোকাছি কোনো গাছও নেই, কোনো উঁচু জায়গাও নেই। মুজাহিদ দেখলেন, তাঁবর সারি ওদিককার

প্রাচীর পর্যন্ত চলে গেছে। এগুলো উদ্বাস্তু কাবায়েলিদের আশ্রয় শিবির। ব্যবস্থাপনাটা করেছিলেন এখানকার মুসলমান প্রশাসন, যারা এখন কাবায়েলিদের হাতে বন্দি।

গাছের উপর থেকে নেমে এসে মুজাহিদ এই তথ্যটি সালারদের কানে দিলেন এবং বললেন, ওদিক থেকে যদি তির ছোড়া যায়, তা হলে প্রাচীরের উপর দিয়ে তির তাঁবুর উপর গিয়ে পতিত হবে।

সালার হযরত খালিদ ইবনে অলীদ ও হযরত ইয়াজ ইবনে গানাম নিজেরা ওই গাছটির কাছে গেলেন। তার গাছে চড়ে আরও উপরে উঠে তাকালেন। ওখান থেকে তাঁবুর শুধু উপরিভাগটাই দেখা যাচ্ছিল। কারণ, নগরীর বাড়ি-ঘর মধ্যখানে আড়াল তৈরি করে রেখেছিল।

'আল্লাহর কসম ইবনে গানাম!'– হযরত খালিদ ইবনে অলীদ ইয়াজ ইবনে গানামের প্রতি তাকিয়ে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'আমরা নগরীতে চরম একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে পারি। এই কৌশলে যদি আমরা সফল হয়ে যাই, তা হলে ধরে নাও, অর্ধেক বিজয় আমরা অর্জন করে ফেলেছি।'

'সিপাহসালার!'– ইয়াজ ইবনে গানাম বললেন –'আল্লাহর ফজলে বিজয় আমাদেরই পদচুম্বন করবে। নগরীতে কোনো ফৌজ নেই। যারা আছে, সবাই সাধারণ নাগরিক। এই মুহূর্তে আমার মাথায় যে-বুদ্ধিটা এসেছে, তা হলো, এদেরকে আমরা ধোঁকা দেব যে, আমরা অবরোধ প্রত্যাহার করছি। কিন্তু একসঙ্গে নয়। প্রথমে এক-দুটি অশ্বারোহী ইউনিটকে এখান থেকে সরিয়ে নেব। তারপর আমরা আমাদের তৎপরতা বন্ধ করে দেব, যাতে নগরীর লোকেরা মনে করে নেয়, আমরা হতাশ হয়ে অবরোধ তুলে নিচ্ছি।'

সালার ইয়াজ ইবনে গানাম গাছের উপর থেকে নিচে নেমে এসে এ-কথাটি বললেন। শুনে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ ঘোড়ার পিঠে চড়তে গিয়ে থেমে গেলেন এবং রেকাব থেকে পা সরিয়ে এনে ইয়াজ (রা.)-এর মুখপানে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চেহারায় এমন একটি ভাব ফুটে উঠল, যেন পরামর্শটি তার ভালো লেগেছে।

'আল্লাহর কসম ইবনে গানাম!'– খালিদ ইবনে অলীদ ইয়াজ ইবনে গানামের কাঁধে চাপড় মেরে বললেন– 'তুমি আমাকে আলো দেখিয়েছ। আসো; কোথাও বসে চিন্তা করি, কৌশলটা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) একটা কৌশল এই অবলম্বন করলেন যে, তিনি গাছ ও উঁচু জায়গাগুলো থেকে তিরন্দাজদের সরিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। দুর্গের যে-দিকটায় তাঁবু ছিল, সেদিকে গিয়ে তিনি তিরন্দাজদের ভেতরে সলতেওয়ালা তির নিক্ষেপ করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন।

আগুনের সলতেওয়ালা তিরের অভাব ছিল না। তিরন্দাজদের প্রাচীরের এতখানি দূরে রাখা হলো, যেখানে ভেতর থেকে ছোড়া তির পৌঁছানো সম্ভব নয়। তিরন্দাজ মুজাহিদরা ধনুকে ভরে তির ছুড়তে শুরু করলেন। দুজন অশ্বারোহী তিরন্দাজ কমান্ডারের নির্দেশ ব্যতিরেকেই ঘোড়া হাঁকিয়ে পাঁচিলের কাছাকাছি চলে গেলেন এবং ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকেই তির ছুড়লেন। পাঁচিলের উপর থেকে নগরবাসী তাদের উপর ঝাঁকে-ঝাঁকে তির ছুড়ল। কিন্তু আল্লাহপাক তাঁদের নিরাপদ রাখলেন। তাঁরা কোথাও ঘোড়া না থামিয়ে অপারেশন চালিয়ে যেতে লাগলেন।

তাঁদের দেখাদেখি ক্ষণে-ক্ষণে আরও এক-দুজন আরোহী তিরন্দাজ ছুটে যাচ্ছেন এবং ধাবমান ঘোড়ার উপর থেকে তির ছুড়ছেন। এবার প্রাচীরের উপর থেকে আসা তিরের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। নগরবাসীর তির-আক্রমণ আরও তীব্রতা লাভ করল। তিন-চারজন অশ্বারোহী মুজাহিদ তিরবিদ্ধ হয়ে আহত হয়ে পড়লেন। এবার ইয়াজ ইবনে গানাম অবশিষ্ট অশ্বারোহীদের আটকে দিলেন যে, না; জীবনের এতখানি ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

কিন্তু ততক্ষণে আর কোনো অশ্বারোহী তিরন্দাজের পাঁচিলের কাছে ঘেষবার প্রয়োজন রইল না। কারণ, পাঁচিলের উপর থেকে যেসব খ্রিস্টান তির ছুড়ছিল, তাদের একজন উচ্চকণ্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠল, তাঁবুতে আগুন ধরে গেছে। তার এই ভয়ার্ত আর্তচিৎকারের সত্যতার প্রমাণ দিল সেই ধোঁয়া, যেগুলো কুন্ডলি পাকিয়ে পাঁচিলের আড়াল থেকে উপরে উঠে এল এবং আরও উপরে উঠতে থাকল। এই ধোঁয়া অত্যন্ত তীব্রবেগে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল। তাঁবুতে অবস্থানরত জনতার হই-হুল্লোড়, চেঁচামেচি ও আর্তচিৎকার দুর্গের বাইরে থেকেও শোনা যেতে আরম্ভ করল।

তাঁবুর সংখ্যা ছিল অনেক এবং একটির সঙ্গে আরেকটি লাগোয়া। এক-একটি প্রজ্বলমান তাঁবু আশপাশের অনেকগুলো তাঁবুকে পুড়িয়ে ফেলছিল এবং আগুন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বিস্তার লাভ করছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, প্রজ্বলমান তাঁবুগুলো থেকে বেরিয়ে আসা মানুষগুলোর অধিকাংশের পরিধানের পোশাকে আগুন ধরে গিয়েছিল। বেশ কজন লোক আগুন ভেদ করে বের হতে না পেরে পুড়ে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনায় পাঁচিলের উপরে দাঁড়িয়ে যেসব খ্রিস্টান তির ও বর্শা নিক্ষেপ করছিল, এতটাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল যে, ওখান থেকে দৌড়ে সরে গেল এবং আগুন নেভানোর জন্য নিচে নেমে এল। পাঁচিল অনেকটা খালি হয়ে গেল।

মুজাহিদগণ দুটি রশি নিয়ে পাঁচিলের কাছে চলে গেলেন এবং রশির আংটাবাঁধা একটি মাথা উপরে ছুড়ে মারলেন। আংটাগুলো ঠিক-ঠিক জায়গায় গিয়ে আটকে গেল। এবার মুজাহিদগণ একজন-একজন করে রশি বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ

করলেন। কিন্তু ডান-বাম থেকে তাঁদের উপর তিরের বৃষ্টি আসতে শুরু করল। পেছন থেকে বহুসংখ্যক মুজাহিদ ছুটে এসে পাঁচিলের উপরকার তিরন্দাজদের উপর তির ছুড়তে লাগলেন। অনেক খ্রিস্টান তিরন্দাজ মুসলমানদের তিরের নিশানায় পরিণত হলো। তিরের আঘাত খেয়ে দু-তিনজন খ্রিস্টান পাঁচিলের বাইরেও এসে পতিত হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে তারা তাদের কাজও করে ফেলেছে। রশি বেয়ে আরোহণকারী মুজাহিদগণের এক-একজনের গায়ে কয়েকটি করে তির বিদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁরা ব্যর্থ হয়ে নিচে নেমে এসেছেন। বীরত্ব ও শাহাদাতের স্পৃহার এ-প্রদর্শনীটি সফল হতে পারল না। কিন্তু বীরত্বপূর্ণ অভিযান মুজাহিদগণের মাঝে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করে দিল। আরও কয়েকজন মুজাহিদ রশি বেয়ে উপরে ওঠার জন্য পাঁচিলের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু এক তো সালারগণ তাদের বারণ করে দিলেন, অপরদিকে উপর থেকে খ্রিস্টানরা উপর থেকে রশির আংটা খুলে দিয়েছে।

নগরীর ভেতরকার শোরগোলই বলে দিচ্ছিল প্রজ্বলমান তাঁবুগুলো ভেতরে কী পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে। এই অপারেশনে নগরীতে সেই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে গেছে, যেটি হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) কামনা করেছিলেন। তিনি তাঁর তিরন্দাজদের পেছনে সরিয়ে নিলেন এবং যে-কজন অশ্বারোহী সৈনিক পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাদেরও ফিরিয়ে আনলেন।

রাতের বেলা মুজাহিদগণের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কতগুলো দল এক-দুটি ফটকের কাছে চলে যেতেন এবং কুড়ালের মাধ্যমে ফটক ভাঙার চেষ্টা করতেন। কিন্তু উপর থেকে তিরও আসত, বর্শাও আসত। শত্রুরা উপর থেকে তাদের উপর জ্বলন্ত মশালও ছুড়ে মারত, যার কারণে দু-তিনজন মুজাহিদ কাপড়ে আগুন লেগে ঝলসে গিয়েছিলেন।

* * *

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) একদিন হাজারখানেক অশ্বারোহী মুজাহিদের একটি দল অবরোধ থেকে বের করে পেছনে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের প্রত্যাবর্তনের ধরনটা এমন ছিল, যেন তারা ফিরে যাচ্ছেন। এরাই সেই মুজাহিদদল, যাঁদেরকে রাওতাস পাঁচিলের উপর দন্ডায়মান অবস্থায় দেখেছিল এবং পরম উৎফুল্ল কণ্ঠে লিজাকে বলেছিল, মুসলমানারা বোধহয় অবরোধ থেকে নিরাশ হয়ে আস্তে-আস্তে সরে যেতে শুরু করেছে।

হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.) এই কৌশলটিও প্রয়োগ করলেন যে, তিনি সমস্ত তৎপরতা এবং দুর্গজয়ের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেন। তিনি অবরোধের অন্য আরেক দিক থেকে আরও এক হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদকে পেছনে সরিয়ে দিলেন। প্রথমবার যে-দলটি সরে গিয়েছিল, এরাও তাঁদের পথে উঠে গেলেন এবং টিলার আড়ালে-আড়ালে পাহাড়ের পেছনে চলে গেলেন। দেখে এ ছাড়া আর কী বলা যায় যে, এই দলটিকেও ফেরত পাঠানো হয়েছে। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ

ও ইয়াজ ইবনে গানামকে ঘোড়ায় চড়ে নগরীর চারদিকে টহল দিয়ে ফিরতে দেখা যাচ্ছিল বটে; কিন্তু অবশিষ্ট বাহিনীর ধরন ছিল, অধিকাংশ মুজাহিদ বেশিরভাগ সময় ছাউনিতেই অবস্থান করছেন। মাঝে-মধ্যে বাইরে বেরুলেও পরক্ষণেই ছাউনিতে ঢুকে পড়ছেন কিংবা পেছনে গিয়ে গাছের তলায় বসে থাকছেন।

দুর্গের ভেতরে এস্থনিসের আনন্দের সীমা ছিল না। তার চেহারায় বিজয়ের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু তারপরও সে একদন্ড স্থির হয়ে কোথাও বসছিল না। গোত্রের অধিপতিদের একত্রিত করে তাদের নির্দেশনা দিচ্ছিল কিংবা পাঁচিলের উপরে উঠে জনতাকে উৎসাহিত করছিল আবার নিচে নেমে এসে নগরবাসীকে জয়ের সুসংবাদ শোনাচ্ছিল। এস্থনিস জনতাকে বলছিল, লাড়াই এখনও শেষ হয়নি। মুলমানদের তাড়ানো আমার লক্ষ্য নয়। আমি ওদের এক-একজন সৈনিককে লাশে পরিণত করতে হবে। কেউ জীবনে রক্ষা পেলে তাকে কয়েদি বানিয়ে দুর্গে পশুর মতো আটকে রাখতে হবে।

এস্থনিস যেন পাগলের মতো হয়ে গেছে। লিজা তো ভালো কথা, দুনিয়ার কোনো কিছুর প্রতিই এখন তার মন নেই। জয়ের নেশায় উন্মাতাল এস্থনিস। লিজা এখন আর তাকে এ-কথাটি বলছে না যে, তুমি ঘরে আসছ না, এলেও আবার হুট করে চলে যাচ্ছ, যেন মনটা বাইরেই রেখে আসছ। এস্থনিসের পরিবর্তে লিজা এখন রাওতাসের কাছে চলে যাচ্ছে আবার রাওতাসও তার ঘরে এসে সময় কাটাচ্ছে। এস্থনিসের আসনটা লিজা রাওতাসকে প্রদান করে সময় অতিবাহিত করছে।

আর উইকেলিসের অবস্থা হলো, ছেলেটা এতই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে, যেন মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে গেছে। খাওয়ার সময়টুকুও তার হয়ে উঠছে না।

ভেতরের শরণার্থী শিবিরে আগুন লাগার ফলে কী প্রলয়টা ঘটল, সেই দৃশ্য মুজাহিদদের নজরে এল না। তাঁবুর এই বিস্তৃত বসতি অঞ্চলটা আগুনের শিখায় পরিণত হয়ে গেছে। নারী ও শিশুরা অনেকে এবং যেসব পুরুষ সময়মতো বের হতে পারেনি, তারা পুড়ে কয়লা হচ্ছে।

নগরীর লোকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কূপ থেকে পানি তুলে-তুলে আগুনের উপর ছিটাতে শুরু করেছে। কিন্তু আগুন কোনোমতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না। এখনও যে-কটি তাঁবু অক্ষত আছে, সেগুলোকে রক্ষা করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। দাউ-দাউ করে প্রজ্বলমান আগুন কুন্ডলি পাকিয়ে-পাকিয়ে গোটা অঞ্চলটিকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নগরীর অধিবাসীদের মাঝে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আতঙ্কিত জনতার মধ্য থেকে রব উঠতে শুরু করল, হয় অবরোধ ভেঙে দাও; অন্যথায় নগরী মুসলমানদের হাতে তুলে দাও। এমনও বলাবলি চলছে যে, আজ শরণার্থীদের ছাউনি পুড়েছে, কাল আমাদের বাড়ি-ঘরে আগুন জ্বলবে।

এস্থ্নিস, রাওতাস ও ইউকেলিসও ঘটনাস্থলে উপস্থিত। তারাও আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একসময় জনতার দাবি তাদেরও কানে এসে ঢুকল। তাতে তারা অনুভব করল, জনতা অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এস্থ্নিস উচ্চকণ্ঠে জনতাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, নিজেদের জাতীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য এ-ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। বড় ধরনের ত্যাগ ছাড়া কোনো জাতি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ওই মুসলমানদের দেখো. ওরা কত দূর থেকে এসেছে এবং অনবরত লড়াই করে যাচ্ছে। আর এখন এত বড় ক্ষতির শিকার হয়েও অবরোধ প্রত্যাহার করতে চাচ্ছে না!

'আমি তোমাদের তথ্য জানাচ্ছি'– এস্থ্নিস বলল– 'মুসলমানরা অবরোধের সফলতা থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছে। কয়েক ইউনিট সেনা তারা প্রত্যাহার করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছি, তারা নিজেরাই অবরোধ তুলে ফিরে যাবে। কাজেই এমতাস্থায় নগরী তাদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা আর মুখেই এনো না।'

এস্থ্নিস নগরীর অধিবাসীদের উসকে দিল, উত্তেজিত করল। তারপর তার ইঙ্গিতে ইউকেলিস একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল, যাতে সবাই তাকে দেখতে পায়।

'ক্রুশের অনুসারীরা!– ইউকেলিস উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দিতে শুরু করল– 'আপনারা আমার বয়স দেখুন। এটি হেসে-খেলে কাটানোর বয়স নয় কি? আমার একটা বাহু নেই। তারপরও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বিশ্রাম, ঘুম ও খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গেছি। আপনারা নিশ্চয় দেখবেন, এক বাহু দ্বারা আমি কীভাবে লড়াই করি। আমি আপনাদের সন্তান, সম্পদ ও ইজ্জতের খাতিরে রাজকীয় জীবন পরিত্যাগ করে আপনাদের কাছে এসেছি।'

* * *

এস্থ্নিস ও ইউকেলিস জনতার উদ্দেশে এই ভাষণটা তখন দিল, যখন তাঁবুর আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। কিন্তু এখনও লাশগুলো খুঁজে বের করে বাইরে আনা হয়নি। তাদের বক্তব্যে জনতার মনোবল ঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিবাদ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এস্থ্নিস ও ইউকেলিসের বলার ধরনই এমন জাদুময় ছিল যে, জনতা তার ক্রিয়া গ্রহণ করে নিয়েছিল। এখন আর নগরীতে আতঙ্ক-উৎকণ্ঠার নামটিও অবশিষ্ট রইল না। মানুষ আগের চেয়ে অধিক জোশ ও জযবার সঙ্গে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে আত্মনিয়োগ করল।

সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে এল। ছাউনির যারা আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে, তারা ছাই-ভস্মের মাঝে যার-যার স্ত্রী-সন্তান ও আপনজনদের অনুসন্ধানে নেমে পড়ল। এই কাজ সারা রাত অব্যাহত থাকল। মানুষ লাশ তুলে-তুলে একটি জায়গায় মাটিতে এনে রাখছিল।

পরদিন সকালে সূর্য উদিত হলে নগরবাসী পুনরায় পুড়ে-যাওয়া-ছাউনির চারপাশে এসে ভিড় জমাল। তখন তাদের সম্মুখে এমন একটি দৃশ্য ছিল, যেটি তাদেরকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল। গায়ের লোমগুলো কাটার মতো দাঁড় করিয়ে দিল। ছাউনি অঞ্চলের ধ্বংসস্তূপের খানিক দূরে অগণিত লাশ পাশাপাশি করে রাখা। তাদের মাঝে যুবক পুরুষের লাশও আছে, বৃদ্ধদের লাশও আছে, নারী-শিশুদের লাশও আছে। এরা সবাই গতকালের আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে কয়লা হয়ে গেছে। একটি লাশও শনাক্ত করা যাচ্ছে না। কোনো-কোনো লাশের অবস্থা এমন যে, দেখে মনে হচ্ছে, কতগুলো মোটা-মোটা কাঠ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

এই গত কালই এস্থনিস ও ইউকেলিস জনতার হৃদয় থেকে ভীতি-উৎকণ্ঠা দূর করে দিয়েছিল এবং তাদের আত্মায় নতুন জীবন সঞ্চারিত করে দিয়েছিল। কিন্তু আজ তারা আগুনে পোড়া লাশের এই দীর্ঘ সারি আর লাশের অবস্থা দেখে যেন তারা গত কালের সেই আগুনেরই মতো জ্বলে উঠল। কাল এস্থনিস ও ইউকেলিস তাদের কী বলেছিল, কী বুঝিয়েছিল, যেন সব পলকের মধ্যে তারা ভুলেই গেল।

মহিলারা হাউমাউ করে কেঁদে-কেদে ও বিলাপ দিয়ে-দিয়ে আপন সন্তান-স্বজনদের লাশ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওখানকার সব শিশু, সকল মানুষ একই রকম হয়ে গেছে। সবাই যেন কাঠপোড়া কয়লা। তাঁবুর বেঁচে-যাওয়া অধিবাসীরা স্বজনদের খুঁজে ফিরছে। সবারই চোখে অশ্রুর বান।

'কোথায় আমাদের রোমান সেনাপতি?'- একব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে বলল- 'শিশুরা দগ্ধ হয়েছে তো আমাদের হয়েছে। সম্পদ পুড়েছে তো আমাদের পুড়েছে। দুর্গ থেকে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে না কেন?

তার সমর্থনে কিছু আওয়াজ উচ্চকিত হলো এবং পরক্ষণেই মনে হলো, জনতার সবাই কথা বলছে এবং প্রত্যেকের একই দাবি, বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হোক। সেইসঙ্গে এ-শব্দটিও উঁচু হতে লাগল যে, রোমান সেনাপতিকে ডেকে আনো।

সংবাদ পেয়ে এস্থনিস রাওতাসকে সঙ্গে করে হন্তদন্ত হয়ে ছুঠে এল। তাকে দেখেই জনতা স্লোগান তুলে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল। কেউ-কেউ মন্তব্য ছুড়ল, এই রোমান লোকটা আমাদের আগুনে পুড়িয়ে এখানে রাজা হতে এসেছে।

জনতার ক্রোধ প্রশমিত করতে এস্থনিসের অনেক বেগ পেতে হলো। বলল, দুর্গের বাইরে গিয়ে আক্রমণ করতে হবে না- অবরোধ আপনিই উঠে যাবে। 'আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না'- একব্যক্তি বলল- 'আমরা সবাই বের হয়ে যুদ্ধ করব।'

এস্থনিস একজন সেনাপতি। রাওতাসও একজন সামরিক অফিসার। অবরুদ্ধ হওয়ার পর কোন অবস্থায় বাইরে বের হয়ে আক্রমণ চালাতে হয়, সে তাদের ভালো করেই জানা আছে। কিন্তু জনতা তাদের দাবি থেকে একচুলও নড়ছে না। এস্থনিস

ও রাওতাস পালা করে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে কোনোই কাজ হলো না।

'শোনো রোমান সেনাপতি!'– এক প্রবীণ লোক বলল– 'আমরা মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা রাখতে চাই না। তোমরা যদি বাইরে গিয়ে আক্রমণ না কর, তা হলে আমরা নিজেরা দুর্গের ফটক খুলে দেব।'

'তোমরা অজ্ঞ, নির্বোধ। তোমরা কিছুই বোঝ না'– এন্থনিস বলল– 'দুর্গের ফটক তোমরা মুসলমানদের জন্য খুলবে না– খুলবে ইসলামের জন্য। তোমাদের খুলে-দেওয়া-ফটক দিয়ে মুসলমানরা ঢুকবে না– ঢুকবে ইসলাম। মুসলমানরা এসে সবার আগে তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। ওরা এলে তোমাদেরকে শুধু তোমাদের ধর্ম থেকেই নয়– সুন্দরী বোন-কন্যা ও যুবতী স্ত্রীদের থেকেও হাত গুটিয়ে নিতে হবে। একটি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার তোমাদের হারিয়ে যাবে।'

'শোনো ওহে ক্রুশের অনুসারীরা!– রাওতাস উচ্চকণ্ঠে বলল– 'যে-মুসলমানদের জন্য তোমরা ফটক খুলে দিতে চাচ্ছ এবং তারপর তোমরা যাদের আনুগত্য মেনে বাধ্য হবে, তাদের হিংস্রতা আর অমানবিকতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ এই মুহূর্তেই তোমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান রয়েছে। তারা তোমাদের দুধখাওয়া শিশু সন্তানটিকে পর্যন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। তোমরা যদি তাদের জন্য দুর্গের ফটক খুলে দাও, তা হলে যেসব খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, তাদের প্রত্যেককে হত্যা করে ফেলবে।'

'আমাদের ভুল বুঝিয়ো না রোমান!'– একবৃদ্ধ সামনে এগিয়ে এসে বলল– 'যেখানে যুদ্ধ হয়, সেখানে শিশুরাও প্রাণ হারায়। তোমরা কি ভুলে গেছ, রোমান ও ইরানি ফৌজ যেখানেই গেছে, গণহত্যা চালাতে-চালাতেই গেছে। তারা নিষ্পাপ শিশুদের নিজহাতে হত্যা করেছে। যুবতী ও তরুণী মেয়েদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে হয় মেরে ফেলেছে নতুবা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। মুসলমানদের আমরা নিজেরা শত্রু বানিয়েছি। আমাদের লোকেরা রোমানদের সাহায্য করতে গেল আর রোমানরা ময়দান ছেড়ে পালাল। এমতাবস্থায় মুসলমানরা আমাদেরকে তাদের শত্রু মনে করবে না কেন? তোমাদের যদি আমাদের নারী-শিশুদের জন্য এতই ভাবনা থাকে, তা হলে দুর্গের বাইরে গিয়ে আক্রমণ চালাও। তখন দেখবে, নগরীর প্রতিটি শিশুও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।'

নগরীর সব মানুষ ওখানে জড়ো হয়েছিল। বৃদ্ধের বক্তব্যের জবাবে সবাই একযোগে চেঁচামেচি করে উঠল। জনতার প্রতিবাদ এক দফা এক দাবিতে পরিণত হলো যে, মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে অবরোধ ভেঙে দাও। এই হট্টগোলের মধ্যে অপর এক ব্যক্তি এগিয়ে এল এবং আরেকটি সমস্যার কথা তুলে ধরল।

'আরও একটি বিপদ ধেয়ে আসছে'– লোকটি বলল– নগরীতে খাদ্যপণ্য দিন-দিন কমে আসছে। এভাবে চললে আর অল্প কদিনের মধ্যেই দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে। গবাদিপশু ও ঘোড়ার খাদ্য এখনই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। আমাদের ক্ষেত-খামার সব দুর্গের বাইরে, যেখান থেকে পশুখাদ্য কিছুই আনা যাচ্ছে না। গবাদিপশুগুলো মানুষের আগে মরে ছাফ হয়ে যাবে। এভাবে না খেয়ে ধুকে-ধুকে মরার চেয়ে কি ভালো নয় আমরা আমাদের ধর্ম ও স্বাধীনতার খাতিরে এখনই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং জীবনগুলো সব উৎসর্গ করে দেব? মরব তো শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে মরব।

এস্থনিস ও রাওতাসের মস্তিষ্কে কেবল যুদ্ধ আর অবরোধই আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। এ দুই রোমান আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত ছিল যে, জয় আমাদেরই ভাগ্যে জুটবে। কিন্তু যুদ্ধের আরও কিছু দিকও যে আছে, আরও কিছু দাবিও যে আছে, সে তারা ভাববার সময়ই পায়নি। যে-নগরীতে সেনাবাহিনী থাকে, সেখানে খাদ্য-রসদের এত পরিমাণ মজুদ থাকে, যা সাধারণত এক বছরেরও বেশি সময়ের জন্য যথেষ্ট হয়। হালবে কোনো বাহিনী ছিল না। জনসাধারণ খাদ্যপণ্য মজুদ করার প্রয়োজনীয়তা-ই অনুভব করেনি। মুসলমানরাও ওখানে কোনো ফৌজ রাখেনি। সেজন্য খাদ্রপণ্যের কোনো মজুদও রাখা হয়নি। এবার জনতা টের পেল, নগরীতে খাদ্যপণ্য খুব দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং পশুখাদ্যও শেষ হয়ে গেছে।

এ এমন একটি সমস্যা, যেটি এস্থনিস ও রাওতাসকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলল। এই বক্তব্য তাদের একেবারে নিস্তব্ধ করে দিল। জনতাকে প্রবোধ দেওয়ার মতো, মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে তাদের মনোবল চাঙ্গা রাখার মতো কোনো কথা তারা খুঁজে পেল না। এস্থনিস তখনই গোত্রপতিদের ডেকে একস্থানে আলোচনায় বসে গেল। খাদ্রপণ্যের পরিস্থিতি তুলে ধরে বলল, এখন বাইরে বের হয়ে অবরোধ ভাঙার আর কোনো বিকল্প নেই। আমরা যদি অবরোধ আপনা থেকে উঠে যাওয়ার অপেক্ষা করি, তা হলে নগরবাসী অনাহারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই ফটক খুলে দেবে। তখন তার ফলাফল কী দাঁড়াবে, সে বলাই বাহুল্য।

গোত্রপতিরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত দিল, অবরোধের উপর আক্রমণ করা হোক এবং এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। এস্থনিস নেতাদের বললেন, আপনারা যুদ্ধের উপযোগী লোকগুলোকে সমবেত করুন; তাদের জরুরি নির্দেশনা দিতে হবে।

* * *

হালবের এই অবরোধ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ যে-বিবরণ লিখেছেন, তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে, হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) শত্রুর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে খেলবার প্রচেষ্টায় ছিলেন। তিনি মনস্তাত্ত্বিক মার-প্যাঁচের যুদ্ধ লড়ার চিন্তায় ছিলেন। যে-দুটি ইউনিটকে তিনি অবরোধ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, নগরীতে তাদের এই আচরণের

কী প্রতিক্রিয়া চলছে, তার কিছুই তিনি জানতেন না। এই তথ্যটিও তার অজানা ছিল যে, নগরীতে খাদ্যপণ্যের সংকটও তৈরি হয়ে গেছে।

সহকর্মী সালার ইয়াজ ইবনে গানাম-এর সঙ্গে পরামর্শ করে খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) নগরীর এক পার্শ্ব থেকে অবরোধ তুলে দিয়েছেন এবং ওই দিককার ইউনিটগুলোকে ফেরতও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সেদিন এস্থনিস, রাওতাস ও গোত্রপতিরা পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে খালেদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর এই কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছিল। তারা যখন দেখল, ওদিককার অবরোধ উঠে গেছে, তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

'আমরা আর অপেক্ষা করব না'– এস্থনিস তার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিল– কাল সকালেই আমরা ওদিককার উভয় ফটক খুলে আমরা বাইরে বেরিয়ে যাব এবং মুসলমানদের কচুকাটা করেই তবে ফিরে আসব।'

পরদিন রাত পোহানোমাত্র নগরীর দুটি ফটক খুলে গেল এবং নগরীর অধিবাসীরা বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে এমনভাবে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল, যেন বানের তোড়ে হঠাৎ নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে। তাদের মাঝে অশ্বারোহীও ছিল। মুসলমানরা এমন অবস্থায় ছিল, যেন এই তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করতে তাঁরা মোটেও প্রস্তুত নন। কিন্তু মুসলিম সালারগণ মুজাহিদদের প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিয়ে রেখেছেন। অপ্রস্তুতির এই দৃশ্য তাঁদের একটি কৌশলমাত্র, যাতে শত্রুরা মনে করে, মুসলমানরা ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছে।

এস্থনিস বড় বিচক্ষণতার সঙ্গে আক্রমণের স্কিম প্রস্তুত করেছিল। তার পরিকল্পনায় কোনো খুঁত ছিল না। নগরবাসীদের বলে দিয়েছিল, ফটক থেকে বের হয়েই তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং ডান ও বাঁ দিক থেকে আক্রমণ চালাবে, যাতে পেছন দিক নিরাপদ থাকে। এক অংশের কমান্ডার ছিল এস্থনিস নিজে আর অপর অংশের রাওতাস। ইউকেলিস রাওতাসের সঙ্গে ছিল।

উপরে-উপরে পরিশ্রান্ত ও হীনবল মুজাহিদরা যখন উঠে দাঁড়ালেন এবং মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন, তখন আক্রমণকারীরা টের পেল, আমরা তা হলে কঠিন এ ্ ণ পাহাড়ের সঙ্গে টক্কর লাগিয়েছি। মুজাহিদগণ পরম বীরত্বের সঙ্গে এই আকস্মিক আক্রমণের মোকাবেলা করলেন।

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর আরেকটি পরিকল্পনা ছিল, যদি কখনও ভেতর থেকে আক্রমণ আসে, তা হলে তখন আক্রমণকারীদের পেছন দিয়ে খোলা ফটকে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কারণ, এস্থনিস তার বাহিনীকে দুইভাগে বিভক্ত করে দিয়ে সেই পথ আগেই বন্ধ করে রেখেছিল।

এস্থুসিন ও রাওতাস তাদের সৈনিকদের একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনীর মতো লড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা তো কোনো বাহিনী ছিল না। তারা ছিল লড়াইকারীদের একটি ভিড়, যারা শুধু এটুকুই জানত যে, মুসলমানদের হত্যা করতে হবে। তার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, কাবায়েলিরা নিজেরাই কচুকাটা হতে লাগল। মুজাহিদদের অধিকাংশই ছিলেন অশ্বারোহী।

এস্থুনিস বুঝে ফেলেছে, মুসলমানরা ফটকের দিকে আসতে চাচ্ছেন। তার সৈন্যরা মুসলমানদের ঠেকাতে পারবে না এতক্ষণকার যুদ্ধে সেই বুঝও তার হয়ে গেছে। কিন্তু সে মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিল, মুসলমানদের এই পরিকল্পনা সফল হতে দেওয়া যাবে না। এস্থুনিস তার বাহিনীকে দুর্গে ফিরে আসবার আদেশ জারি করল। কিন্তু তার আদেশে কোনোই কাজ হলো না। কাবয়েলিরা তার আদেশে কোনোই কর্ণপাত করল না। অগত্যা সে কাবায়েলি নেতাদের বলল, আপনারা নিজ-নিজ লোকদের নগরীতে ফিরিয়ে নিন। নেতাদের আদেশে সৈনিকরা পিছপা হয়ে দুর্গে ঢুকে গেল। মুজাহিদরা তাদের ধাওয়া করল এবং আক্রমণকারীদের পেছনে-পেছনে দুর্গে ঢুকে যেতে চাইলেন। কিন্তু ফটক বন্ধ হয়ে গেল। ভেতর থেকে যারা ফটক বন্ধ করল, তারা এও দেখল না যে, বাইরে তাদের কয়েকশো লোক রয়ে গেছে। তারা মোকাবেলা অব্যাহত রাখল। এখনরকার লড়াইটা চলছে ফটকের কাছাকাছি। ফলে পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে কাবায়েলিরা মুজাহিদদের উপর তির ও বর্শা ছুড়তে লাগল। এতে মুজাহিদগণ অনেক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হলেন এবং শত্রুপক্ষের যে-লোকগুলো বাইরে রয়ে গিয়েছিল, তাদের অনেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। তাদের জন্য ফটক খুলে দেওয়া হলো। তারা ভেতরে ঢুকে গেল।

পাঁচিলের উপর দন্ডায়মান কাবায়েলিরা বাইরের দৃশ্যটা দেখল। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে রয়েছে। গুরুতর আহতরা উঠে হাঁটবার চেষ্টা করছে। এই দৃশ্য অবলোকনে কাবায়েলি খ্রিস্টানদের মনোবল আরও বেড়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে বলতে শুরু করল, এ ধরনের আরও একটি আক্রমণ চালাতে হবে। এস্থুনিস সবাইকে সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিল, আমরা পুনরায় এর চেয়েও জোরদার আক্রমণ চালাব; তোমরা প্রস্তুত থাকো।

নগরীর মহিলারা তাদের পুত্র, ভাই ও স্বামীদের খুঁজে ফিরতে লাগল। তারা সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল, যেটি যুদ্ধ করে ফিরে এসেছে।

তাদের মাঝে একজন আছে লিজা। মহিলা পাগলের মতো ইউকেলিস! ইউকেলিস! চিৎকার করছে। কিন্তু তার পুত্রের কোনো খোঁজ নেই। ইউকেলিসও এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিল। লিজা দৌড়ে পাঁচিলের উপর উঠে গেল। এবার দূর থেকে পুত্রকে দেখতে পেল। ইউকেলিস একস্থানে রাওতাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। লিজা ছুটে গিয়ে পুত্রকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল, যেভাবে চিল দূর থেকে এসে

মুরগিছানাকে পাঞ্জা করে ধরে নিয়ে যায়। মহিলা ছেলেটাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ খুটিয়ে-খুটিয়ে দেখল, বাছাধন শরীরের কোথাও আঘাত পেয়েছে কি-না। ইউকেলিস মাকে আশ্বস্ত করল, আমি একদম ঠিক আছি মা! কোথাও কোনো আঘাত পাইনি; আপনি শান্ত হোন।

ইউকেলিসকে উন্মাদিনীর মতো খুঁজে ফিরছে আরও এক রূপসী তরুণী রোজি। রোজি কাউকে জিজ্ঞেস করছে না, ইউকেলিস ফিরে এসেছে কি-না কিংবা সে কোথায় আছে। এ সেই খ্রিস্টান মেয়ে, যাকে ইউকেলিস কুস্তুন্তিনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। হালবে এসে এর সঙ্গে ইউকেলিসের দেখা হয়েছিল এবং দুজনে সাক্ষাত ও প্রেমবিনিময় চলছিল।

খুঁজতে-খুজতে রোজিও পাঁচিলের উপর উঠে এল এবং দূর থেকে ইউকেলিসকে লিজার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ দেখতে পেল। মেয়েটি ওদিকে ছুটে গেল এবং ইউকেলিসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রোজিকে দেখে ইউকেলিস আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। নিজেকে মায়ের বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রোজিকে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রাখল।

* * *

নগরীর বাইরে মুজাহিদগণ তাঁদের সঙ্গীদের লাশগুলো তুলে নিচ্ছেন। আহতদের তুলে নিয়ে চিকিৎসা-সেবা প্রদানের দায়িত্ব মহিলাদের। এঁরা মুজাহিদদের স্ত্রী, বোন ও কন্যা, যাঁরা বাহিনীর সঙ্গেই থাকছেন। তাদের অবরোধ থেকে বেশ দূরে পেছনে একস্থানে তাঁবুতে রাখা হয়েছে। শারিনাও তাদের মাঝে আছেন, যিনি একসময় সম্রাট হেরাকল-এর কন্যা ছিলেন আর এখন মুজাহিদ হাদীদ ইবনে মুমিন খাযরাজের স্ত্রী। তিনিও অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে আহতদের পানি পান করাচ্ছেন এবং তাদের তুলে চিকিৎসার জন্য পেছনে নিয়ে যাচ্ছেন।

এই যুদ্ধে বেশ কজন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেছেন। কিন্তু সংখ্যাটা এত বেশি নয় যে, এর জন্য অবরোধের উপর প্রভাব পড়তে পারে। আহতদের সংখ্যা খানিক বেশি। কিন্তু তাও অবরোধকে দুর্বল করতে পারবে না। হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করলেন না এবং আর কোনো তৎপরতাও দেখালেন না। তিনি মুজাহিদদের আগের মতো নির্বিকার থাকতে বলে দিলেন।

অবরোধ কতদিন অব্যাহত ছিল সেই তথ্য ঠিকঠিক বলা মুশকিল। এ-ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভিন্নতা পাওয়া যায়। একজন তো এর মেয়াদ সাত বছর লিখেছেন, যা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে এই অবরোধের স্থায়িত্ব ছিল কয়েক মাস। হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) এই কাবায়েলি খ্রিস্টানদের আর কী-কী ধোঁকা দিয়েছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ কোনো ইতিহাসেই পাওয়া যায় না।

উভয় পক্ষেরই কিছু দিনের অবকাশ দরকার ছিল, যাতে আহত সৈনিকরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। এস্থনিস ও রাওতাস পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির করতে বসে গেল। গোত্রের অধিপতিরা তাদের সঙ্গ ও সহযোগিতা দিচ্ছে। প্রতিটি আদেশ ও বার্তা এই নেতাদের মাধ্যমে নগরবাসীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এবার তরুণরাও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। মহিলারাও প্রত্যয় ঘোষণা করে রাখল, প্রয়োজন হলে আমরাও মাঠে নেমে লড়াই করতে প্রস্তুত আছি।

মুসলমানদের নিয়ম ছিল, যখন যিনি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হতেন, তিনিই প্রতি ওয়াক্ত নামাযের ইমামত করতেন। হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) ফজর নামাযের পর মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতেন। তাতে তিনি তাঁদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। একটি কথা তিনি প্রায়ই বলতেন যে, 'আল্লাহর সাম্রাজ্যের কোনো সীমা-সরহদ থাকে না। জিহাদ হয় আল্লাহর জন্য আর এর বিনিময়ও আল্লাহই দান করেন।' মাঝে-মধ্যে তিনি একথাটিও বলতেন, 'আমলবিহীন দু'আ আর দু'আবিহীন আমল সেই বৃক্ষচারার মতো, যেটি অঙ্কুরিত হয়েছে বটে; কিন্তু তার গোড়ায় পানি সিঞ্চন করার মতো কেউ নেই।'

মুজাহিদদের কোনো নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) সাধারণত ফজর নামাযের পর ভাষণ দিতেন। তিনি মুজাহিদদের প্রস্তুত করে রেখেছিলেন যে, ভেতর থেকে আবারও আক্রমণ আসবে। যেসব কাবায়েলি খ্রিস্টান আহত হয়ে মাঠে পড়ে ছিল, তাদের থেকে তিনি তথ্য পেয়েছেন, নগরীতে খাদ্যপণ্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে যে, অবরোধ আর কদিন বহাল থাকলে পরিস্থিতি দুর্ভিক্ষের রূপ ধারণ করবে। আহত কাবায়েলিদের থেকে হযতর খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) এই তথ্যও জ্ঞাত হয়েছেন, নগরবাসী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবরোধ ভাঙতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে এবং নগরীতে কিছুলোক এমনও আছে, যারা মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নেওয়ার পক্ষে। ভেতরের বাস্তব চিত্র অবগত হওয়ার পর হযরত খালেদ ইবনে অলীদ ও ইয়াজ ইবনে গানামের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এখন সহজ হয়ে গেছে।

দুর্গের ভেতরেও পরবর্তী অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত ও কৌশল নির্ধারণে শলা-পরামর্শ চলছে। এস্থনিস ও রাওতাস দুদিন পর সকাল-সকাল আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অনেক জখমি প্রাথমিক চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং আগের চেয়ে বেশি নাগরিক আক্রমণে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। এস্থনিস প্রত্যয় নিল, এই আক্রমণ যেন চূড়ান্ত আক্রমণ হয়। এবারকার আক্রমণ দুর্গের উভয় পার্শ্ব থেকে হবে। ফলে খ্রিস্টান বাহিনীকে এবার দুটির বদলে চারটি ফটক দিয়ে বের হতে হবে।

এস্থনিস ও রাওতাসের অগোচরে ইউকেলিস একটি জানবাজ দল তৈরি করে নিয়েছে। তার বয়সী টগবগে তরুণরা এই দলের সদস্য। তারা সবাই অশ্বারোহী। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, মুসলিম সেনাপতির উপর তারা আক্রমণ চালাবে এবং জীবিত কিংবা মৃত ধরে আনবে। এ ছাড়া আর কোনো অভিযানে তারা অংশগ্রহণ করবে না, অন্যকোনো পয়েন্টে তারা লড়াই করবে না। মুসলমানদের সিপাহসালার যেখানে থাকবেন, সেটি হবে তাদের লক্ষস্থল। তাদের জানা আছে, সিপাহসালার সব সময় নিরাপত্তা বাহিনীর বেষ্টনিতে থাকেন এবং এই অভিযানে সফল হতে হলে তাদের ঘোর রক্তক্ষয়ী লড়াই লড়তে হবে।

আক্রমণের আর মাত্র এক দিন এক রাত বাকি আছে। ইউকেলিস তার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। তার এই সেনদল আর পরিকল্পনার কথা শুধু তার মা-ই জানে। এস্থনিস-রাওতাস এর কিছুই জানে না। বিদায়কালে মাকে বলেছে, আমি অভিযানে যাচ্ছি। যুদ্ধ শেষ না হতে আর ঘরে ফেরা হবে না। মা তাকে আদর ও দু'আ দিয়ে বিদায় জানাল।

এস্থনিস সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে সময় পার করছে। একবার পাঁচিলের উপর উঠে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা অবলোকন করছে আবার নিচে নেমে এসে কাবায়েলি নেতাদের আগে বলা কথাগুলোই পুনরায় বলছে। একরকম উন্মাদনা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

* * *

বিকালবেলা কী এক কাজে রাওতাসকে এস্থনিসের প্রয়োজন দেখা দিল। অন্য কাউকে না পাঠিয়ে রাওতাসের সন্ধানে সে নিজেই ছুটে গেল। এস্থনিসের ধারণা ছিল, রাওতাসও তারই মতো বাইরে ছোটাছুটি করে ফিরছে। কিন্তু রাওতাসকে কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে এস্থনিস রাওতাসের ঘরে গেল। ঘরে রাওতাস একা থাকত। সেজন্য এস্থনিস সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ল। আঙিনায় গিয়ে এস্থনিস রাওতাসকে ডাক দিল। একটি কক্ষ থেকে রাওতাসের কণ্ঠ ভেসে এল, একটু দাঁড়ান; আমি পোশাক ছাড়িয়ে আসছি। কিন্তু এস্থনিস না দাঁড়িয়ে কক্ষের দিকে পা বাড়াল। কারণ, এস্থনিস জানে, এই ঘরে রাওতাস ছাড়া আর কেউ থাকে না। রাওতাস এখানে একা থাকে। কক্ষের দরজা ভেতর থেকে ভেজানো ছিল। এস্থনিস দরজায় হাত রেখে হালকা ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। কক্ষের ভেতরে চোখ পড়ামাত্র এস্থনিস দৃশ্যটি দেখল, তাতে তার শরীরের রক্ত টগবগ করে উঠে মাথায় চড়ে গেল।

কক্ষে রাওতাস একা নয়– লিজাও আছে আরেকজন। সেও তড়িঘড়ি করে পোশাক পরছে। এস্থনিসের মনে সংশয় রইল না, এর আগে লিজা নগ্না ছিল। রাওতাসও

ঝটপট পোশাক পরছে। এন্থনিস অবরোধ ও পরদিনের আক্রমণ-পরিকল্পনার কথা বেমালুম ভুলে গেল এবং খাপ থেকে তরবারিটা খুলে হাতে নিল।

'তলোয়ার হাতে নাও'– এন্থনিস রাওতাসকে হুঙ্কার দিল– 'বারান্দায় আসো। তুমি আর আমি দুজনের যে বেঁচে থাকব, এই মহিলা তার হবে।'

সে-যুগের নিয়ম ছিল, কোনো-কোনো বিবাদের মীমাংসা তরবারি করে দিত। রাওতাস সঙ্গে-সঙ্গে চ্যালেঞ্জ বরণ করে নিল এবং তলোয়ার হাতে নিয়ে রণমূর্তি ধারণ করে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

এন্থনিস ও রাওতাসের তরবারি টক্কর খেতে লাগল। এমন সময় লিজা পোশাক পরিধান করে বারান্দায় ছুটে এল। সে দেখতে পেল, দুই বন্ধু একজন আরেকজনের রক্তের নেশায় পাগল হয়ে গেছে। দুজনই খুনপিপাসায় কাতর হয়ে উঠেছে। তারা উভয়ে অপরজনের উপর আক্রমণ চালানোর লক্ষ্যে পেছনে সরে এল। দুজনেরই ভাব এমন যে, তারা দুজনই এই যুদ্ধে জয়ী হবে। তারা আপন-আপন তরবারি বর্শার মতো সোজা করে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে অগ্রসর হলো। লিজা এসে দুজনের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে গেল এবং দুজনকেই নিরস্ত হতে অনুরোধ করল। কিন্তু একজনও তার কথা শুনল না। তারা পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল। লিজার মধ্যখানে দাঁড়াবার পর এখন আর দুজনের মাঝে কোনো ফাঁক নেই। দুজনেরই তরবারি আগে থেকেই উদ্যত। তারা নিজেদের আর সামলাতে পারল না। একজনের তরবারি বর্শার মতো লিজার পেটে ঢুকে গেল আর অপরজনেরটা ঢুকল পিঠে।

দুজনই হঠাৎ বিচলিত হয়ে তরবারি টেনে বের করে আনল। কিন্তু আঘাত এতটাই জোরালো ছিল যে, লিজার বাঁচবার আর সম্ভাবনা রইল না। লিজা একদিকে কাত হয়ে ধপাস করে লুটিয়ে পড়ল। এন্থনিস ও রাওতাস বিমূঢ়ের মতো প্রথমে লিজার পানে এবং পরে নিজেরা পরস্পর চোখাচুখি করল। এন্থনিস এমনভাবে পেছনে সরে গেল, যেন সে রাওতাসের উপর আক্রমণ চালাবে।

'থেমে যাও এন্থনিস!'– রাওতাস নিজের তরবারিটা সজোরে আঙিনায় ছুড়ে ফেলে দিল। ঘরের কাঁচা মাটিতে ওখানেই গেঁথে রইল এবং দুলতে থাকল– 'একজন নারীর পেছনে পড়ে আমরা দুজন নিজেদের মর্যাদার কথা ভুলে গেছি। আমরা কি যিশুখ্রিস্টের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা নেইনি? আমাকে হত্যা করার বাসনা যদি তোমার থাকে, তা হলে করে ফেলো। তবু প্রতিজ্ঞার কথা ভুলো না। এই যে-লোকটি মরে গেছে, ও একজন কুলটা নারী ছিল। এমন একজন নারীর খাতিরে আমাদের একজন অপরজনের শত্রুতা ক্রয় করা ঠিক হবে না।'

এন্থনিসও তরবারিটা খাপে ঢুকিয়ে নিল। তারপর ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে আঙিনা থেকে রাওতাসের তরবারিটা তুলে তার হাতে দিল এবং ক্ষীণকণ্ঠে বলল, চলো।

বাইরে বের হয়ে এন্থুনিস রাওতাসকে বলল, যা ঘটেছে, সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। যুদ্ধে জয়ী হলে এখানে নারীর অভাব হবে না। আর জয়ী আমরা হবই।

ইউকেলিস তার জানবাজ দলটি নিয়ে চলে গিয়েছিল। সে মাকে বলে গিয়েছিল, যুদ্ধ শেষ না হতে তার আর ফেরা হবে না। এখন তাকে সংবাদ জানানোর মতো কেউ নেই যে, তোমরা মা রাওতাসের ঘরে মৃত পড়ে আছে। এন্থুনিস ও রাওতাস ঠিক আগের মতোই দুধ-চিনি হয়ে গেছে, যেন কিছুই ঘটেনি।

* * *

ভোরের আধফোটা আলোতে নগরীর দুটি ফটক এক দিক থেকে, অপর দুটি ফটক আরেক দিক থেকে খুলে গেল। চারটি ফটক দিয়ে কাবায়েলি খ্রিস্টান সৈন্যরা বেরুতে শুরু করল। ওদিকে পঞ্চম আরও একটি ফটক খুলে গেল এবং সেই পথে ইউকেলিস তার শখানেক জানবাজ সৈন্য নিয়ে বের হলো। এই ফটক সে-ই খুলিয়েছে। এন্থুনিস মাত্র চারটি ফটক খুলবার আদেশ প্রদান করেছে এবং নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, আক্রমণের সময় ফটকগুলো খোলা থাকবে।

কাবায়েলি খ্রিস্টান বাহিনীর এবারকার কৌশল ভিন্ন। তারা ডানে-বাঁয়ে আক্রমণ করার পরিবর্তে সোজাসুজি হামলা চালাল। মুসলমানরা আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। উভয় পক্ষে সংঘাত বেঁধে গেল।

মুজাহিদদের যুদ্ধের ধরন হলো, তাঁরা মোকাবেলা করছেন বটে; কিন্তু চাপ তৈরি করার স্থলে ধীরে-ধীরে পেছনে সরতে লাগলেন। এই কাবায়েলিদের জানা ছিল না খালেদ ইবনে অলীদ কেমন বিচক্ষণ সেনাপতি! মুজাহিদদের এই কৌশলে শত্রুরা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল যে, ওরা বোধহয় এখনই পালিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটি ছিল মুসলমানদের একটি রণকৌশল। এই কৌশল প্রয়োগ করে তাঁরা এ-যাবত বড়-বড় অনেক সামরিক শক্তিকে পরাস্ত করেছেন। এখন এনন্থুনিস-রাওতাসও এই প্রতারণাজালে আটকা পড়ল। তারা অনুভবই করতে পারল না, তাদের বাহিনী দুর্গ থেকে অনেকখানি দূরে এসে পড়েছে, যেখান থেকে তাদের ফিরে যাওয়া দুষ্কর হবে।

মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে যখন কাবায়েলি সৈন্যরা নগরী থেকে অনেক দূরে সরে এল, এবার নগরীর কোলঘেঁষা টিলা ও পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য থেকে অশ্বারোহী মুজাহিদের একটি দল বেরিয়ে এল। এরা বিস্ময়কর এক গতিতে নগরীর দিকে ধেয়ে এল এবং নগরীর ফটক ও কাবায়েলি সৈন্যদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে ফেলল। এরা সেই অশ্বারোহী মুজাহিদদল, যারা অবরোধ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং যাঁদের দেখে এন্থুনিস ও নগরবাসী মনে করেছিল, মুসলমানরা অবরোধ তুলে নিচ্ছে। কিন্তু তাঁরা কোথাও চলে যাননি। তাঁরা টিলা-টিপি ও পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে ছিলেন এবং সেনাপতির ইঙ্গিতের

অপেক্ষায় সময় পার করছিলেন। বেশ কদিন পর আজ তাঁরা সঙ্কেত পেয়ে গেলেন এবং নির্দেশনা অনুপাতে অভিযানে বেরিয়ে এলেন।

তাঁদের একটি অংশ নগরীর খোলা ফটকগুলো দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। অন্যরা কাবায়েলি সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যেসব মুজাহিদ লড়াই করতে-করতে পেছন দিকে সরে যাচ্ছিলেন, তারা হঠাৎ থেমে গেলেন এবং একযোগে কাবায়েলি সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালালেন। ওদিকে কিছু মুজাহিদ নগরীতে ঢুকে পড়লেন। তাঁরা সামান্য মোকাবেলার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু তা না হওয়ারই মতো। তাঁরা ঘোষণা করে দিলেন, পুরুষরা সবাই বাইরে বেরিয়ে আস। মহিলারা যার-যার ঘরে বসে থাকো। কোনো পুরুষকে কোনো ঘরে লুকোনো অবস্থায় পেলে তাকে হত্যা করা হবে। মহিলাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তোমাদের প্রতি কেউ খারাপ দৃষ্টিতে তাকাবে না। কোনো বৃদ্ধ, শিশু ও রুগ্নর গায়ে হাত তোলা হবে না। রুগ্ন ও বৃদ্ধরা ঘর থেকে বের হবে না।

কিন্তু শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস না করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। নগরবাসী মহিলাদের, বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের ঘরের মধ্যে এখানে-ওখানে লুকিয়ে রাখল এবং নিজেরা বাইরে বেরিয়ে এল। মহিলারা ভয়ে জড়সড় হয়ে ঘরের গুটিয়ে আছে। না তারা বাইরে বের হচ্ছে, না ঘরের ছাদে উঠে দেখার চেষ্টা করছে, বাইরে কী হচ্ছে। প্রতিটি ঘরে, প্রতিজন মানুষের মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এই বাহিনী যদি রোমানদের কিংবা ইরানিদের কিংবা অন্য কোনো অমুসলিম জাতির হতো, তা হলে তারা ঘরে-ঘরে হুমড়ি খেয়ে পড়ত– লুণ্ঠন করত, গণহত্যা করত এবং যুবতী-তরুণী মেয়েরা তাদের হাত থেকে রক্ষা পেত না। কিন্তু মুজাহিদরা কোনো একটি ঘরের প্রতি চোখ তুলে তাকালেনও না।

নগরীর সমস্ত পুরুষ বাইরে একটি মাঠে জড় হয়েছে। নগরীর বাইরে কাবায়েলি খ্রিস্টানদের গণহত্যা চলছে। তারা হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর ফাঁদে ফেঁসে গেছে।

ইউকেলিস তার একশো জানবাজ নিয়ে মসলমানদের সেনাপতিকে খুঁজছিল। তার জানা ছিল না, মুসলমানদের সেনাপতিরা রাজা হন না যে, রণাঙ্গন থেকে দূরে কোথাও একস্থানে দাঁড়িয়ে আদেশ জারি করবেন। হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতেন না। দূত ও রক্ষীসেনারা তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে থাকত। তাঁকে খুঁজতে-খুঁজতে ইউকেলিসও তার জানবাজদেরসহ মুজাহিদদের বেষ্টনিতে চলে এল। টগবগে যুবকদের এই দলটিও কেটে-কেটে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে লাগল আর ঘোড়ার পদাঘাতে নিষ্পিষ্ট হতে লাগল।

'রোমান সেনানায়ক দুজনই মারা গেছে!'– কেউ একজন উঁচু গলায় চিৎকার করে বলল– 'এন্থনিসও নিহত হয়েছে, রাওতাসও নিহত হয়েছে।'

সংবাদটা কানে-কানে পৌঁছে গেল এবং মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল। রণাঙ্গনের সবাই জেনে গেছে, কাবায়েলি খ্রিস্টানদের কমান্ডার এন্থনিস ও রাওতাস মারা গেছে। কাবায়েলি খ্রিস্টানদের জোশ-জযবা হঠাৎ এমনভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ল, যেন প্রজ্বলমান আগুন হঠাৎ নিভে গেছে। তারা তির-বর্শা ও ধনুক ছুড়ে ফেলল এবং চিৎকার করে-করে বলতে শুরু করল, আমরা লড়াই করব না। তাদের যারা অশ্বারোহী ছিল, তারা নিচে নেমে এল এবং অস্ত্রসমর্পণ করে নিজেদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল।

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। তিনি অস্ত্রসমর্পণকারীদের গ্রেফতারের আদেশ দিলেন না। বরং ঘোষণা দিলেন, যেসব কাবায়েলি অস্ত্রসমর্পণ করেছ, তোমরা নগরীতে ঢুকে যাও। কিন্তু কেউ ঘরে প্রবেশ করবে না।

কাবায়েলি খ্রিস্টানরা মাথনত করে নগরীতে ঢুকে গেল এবং একটি মাঠে গিয়ে সমবেত হলো। কিছুক্ষণ পর হযরত খালেদ ইবনে অলীদ ও ইয়াজ ইবনে গানাম (রা.) নগরীর প্রধান ফটক দিয়ে বিজয়ীর বেশে নগরীতে প্রবেশ করলেন।

এটি ছিল শামের সর্বশেষ দুর্গ। আজ এই দুর্গটিও জয় হয়ে গেল এবং শামজয়ের উপর মুসলমানদের সিলগালা পড়ে গেল। হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) সেই স্থানটিতে গেলেন, যেখানে নগরবাসীদের সমবেত করা হয়েছিল। অস্ত্রসমর্পণকারীদেরও সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) তাদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করলেন–

'আল-জাযিরার অধিবাসীরা!'– খালেদ ইবনে অলীদ বললেন– 'এই নগরীটি আমরা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করেছি। তোমরা আমাদের অনেক জীবন নষ্ট করেছ। ফলে তোমাদের সঙ্গে আমাদের আচরণ অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি সেই পথে হাঁটব, যেটি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর আমাদের দেখিয়েছে। আমাদের রীতি অনুযায়ী তোমাদের প্রত্যেককে মুসলমান হয়ে যাওয়া দরকার। তারপর চাইলে আমরা তোমাদের থেকে জরিমানাও আদায় করতে পারি। কিন্তু বনু তাগলিব অস্ত্রসমর্পণ করলে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর আদেশ প্রেরণ করেছিলেন, কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করো না। তা না করে তাদের থেকে জিযিয়া নাও। আমরা তোমাদের থেকেও জিযিয়া আদায় করব। এই জিযিয়া আমরা যার-যার সামর্থ্য অনুযায়ী আদায় করব। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তোমরা রোমানদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছিলে। তোমাদের তারও শাস্তি পাওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু আমরা তোমাদের কোনো শাস্তি দেব না। আচ্ছা,এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হওয়ার পর নগরীর কোনো ঘরে লুট হয়েছে? একজন মুসলমানও কি কোনো ঘরে ঢুকেছে?'

'না– না সেনাপতি!' একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠ ভেসে এল।

'আর হবেও না'– হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.) বললেন– 'আমরা তোমাদের সম্মান, সম্ভ্রম, জীবন ও সম্পদের পাহারাদার। কিন্তু কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে কিংবা কোনো রকম অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড। অপরাধী ও ইসলামবিরোধীদের ছাড় দিতে আমরা জানি না।'

ঐতিহসিকগণ লিখেছেন, হালবের অমুসলিমদের অন্তরে যে-ভীতি দানা বেঁধেছিল, হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর এই ভাষণে সব দূর হয়ে গিয়েছিল এবং বেশ কিছু কাবায়েলি সেদিনই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

* * *

সূর্য অস্ত যেতে এখনও অনেক সময় বাকি। মুজাহিদগণ তাঁদের আহত সঙ্গী ও শহীদগণের লাশ তুলে নিচ্ছেন। মহিলারা ঘুরে-ঘুরে আহতদের পানি পান করাচ্ছেন এবং আহতদের যারা কোনোমতে হাঁটতে সক্ষম, তাঁদের সহায়তা দিয়ে সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

মাঠে এখন দুটিমাত্র শব্দ কানে আসছে। আহতদের কোঁকানি আর পানি– পানি; এক ফোঁটা পানি! শারিনাও একাজে মহাব্যস্ত। হঠাৎ এক জখমিকে দেখে তার পা আটকে গেল এবং বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তার সম্মুখে বসে পড়ল। এক যুবক সৈনিক। মুখে বা মাথায় কোনো জখম নেই। কিন্তু গায়ের কাপড়-চোপড় সমস্ত লাল হয়ে গেছে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোয়ারার মতো রক্ত নির্গত হচ্ছে।

'ইউকেলিস না!'– শারিনা অপার বিস্ময়ে বলল– 'সম্রাট হেরাকল-এর পুত্রের এখানে কাজ কী! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো!'

'আমি ইউকেলিসই শারিনা!'– কাঁপা-কাঁপা ম্লানকণ্ঠে যুবক বলল –' তোমাকে দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। তুমি এখানে কীভাবে?'

ইউকেলিস ভালোভাবে কথা বলতে পারছে না। তার কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে।

'কথা বলো না ইউকেলিস!'– শারিনা বলল– 'এটা গল্প শোনানোর, গল্প শোনার সময় নয় যে, তুমি এখানে কেন এসেছ, আমি কীভাবে এখানে এসেছি। এই নাও; পানিটুকু পান করো। তারপর চলো; তোমাকে তুলে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।'

'না শারিনা!'– ইউকেলিস বলল– 'আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। জানি না, এ যাবত বেঁচে আমি কী করে! জীবনের শেষ শ্বাসটি আমাকে নিতে দাও।'

ইউকেলিস শারিনার একটা হাত ধরে ফেলল। ইউকেলিস এন্থনিসের ঔরসজাত বটে; কিন্তু সবাই জানে সে সম্রাট হেরাকল-এর পুত্র। শারিনাও হেরাকল-এরই কন্যা ছিল। এই সুবাদে ইউকেলিস-শারিনায় ভাই-বোনের সম্পর্ক।

শারিনা বলল, আমি গিয়ে কয়েকজন মুজাহিদ ডেকে আনি; তারা তোমাকে তুলে নগরীতে নিয়ে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু ইউকেলিস শারিনার হাতটা

আরও শক্ত করে ধরল এবং সজোরে মাথা দুলিয়ে বলল, না শারিনা! ওসবের আর আমার দরকার নেই। কোনো চেষ্টা-ই আর আমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমি বাঁচব না শারিনা!

ওদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা লাশের মাঝে কাবায়েলি তরুণী রোজি হন্যে হয়ে ইউকেলিসকে খুঁজে ফিরছে। নগরীর মহিলাদের ঘর থেকে বের হতে নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু রোজি লুকিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে এসেছে। এখন রণাঙ্গনে সে ইউকেলিসকে খুঁজে ফিরছে। কেউ হয়ত তাকে তথ্য দিয়েছে, ইউকেলিস মারা গেছে কিংবা গুরুতর আহত হয়ে কোথাও পড়ে আছে।

রোজি পাগলিনীর মতো হতাহতদের মাঝে ইউকেলিসের সন্ধান করছে। বারবার নিহতদের লাশের সঙ্গে, আহতদের নিঃসাড় দেহের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাচ্ছে আবার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এক-একজনের রক্তাক্ত মুখখানি নিরীক্ষা করে দেখছে।

অবশেষে মেয়েটি সেই স্থানটিতে এসে উপনীত হলো, যেখানে শারিনা ইউকেলিসকে নিয়ে বসে আছে। ইউকেলিসকে দেখেই সে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং উন্মাদিনীর মতো তার মুখে হাত বোলাতে লাগল।

'উঠতে চেষ্টা করো ইউকেলিস!'– শারিনা তার একটা বাহু ইউকেলিসের কাঁধের তলে নিতে-নিতে বলল– 'আমরা দুজন তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।'

'হ্যাঁ ইউকেলিস! তুমি উঠবার চেষ্টা করো। আমরা তোমাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাব।' অস্থির কণ্ঠে রোজি বলল।

'আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম রোজি!'– ইউকেলিস ম্রিয়মাণ গলায় রোজিকে উদ্দেশ করে বলল– 'আমার মাকে বলবে... ।'

ইউকেলিস আর বলতে পারল না। তার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখদুটো বুজে গেল। আধবোজা ওষ্ঠাধরের ফাঁক গলে আর আর কোনো কথা বের হলো না।

রোজির বুক চিরে একটা করুণ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। মেয়েটা ইউকেলিসের মরদেহটা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। শারিনা উঠে দাঁড়াল এবং বেদনার একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ওখান থেকে চলে গেল। রোজিকে জিজ্ঞেসও করার প্রয়োজন বোধ করল না, এর তুমি কী হও?

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত



design : shakir ahsanullah

বইঘর

ISBN : 978-984-91933-3-3

978 984 91933 3 3

অনিঃশেষ আলো-১

আলতামাশ

Onisshesh Alo-1

Altamash